কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর

কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর

প্রথম পর্ব

[১৯৩৪—১৯৫০]

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

পরিবেশক

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ❖ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

COLLEGE STREETEY SOTTOR BACHHAR
by
Sabitendranath Roy
A memoir on literary addas around College
Street area covering a period of seventy years.
Published by Deepshikha Prakashan, Dhalua (East), Garia,
Kolkata 700 152. To be had of Mitra & Ghosh Publishers
Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan De Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 80.00

প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ ১৪১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৩

প্রকাশক
শিখা শিকদার
দীপশিখা প্রকাশন
ঢালুয়া (পূর্ব), গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ১৫২

শব্দগ্রন্থন
জে. রায় এন্টারপ্রাইজ
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদপট ও অতিরিক্ত নামপত্র
মানস বাগ এবং ইন্দ্রনীল ঘোষ

আলোকচিত্র
মোনা চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বইয়ের দেশ, কথাসাহিত্য,
বিশ্বজিৎ কুণ্ডু এবং এম. সি. সরকার এন্ড সনস্-এর স্মরণিকা

আশি টাকা

ISBN-81-7293-911-6

অর্চনাকে

MAHASVETA DEVI
W2C, Phase - II Flat - 123
Golf Green Urban Complex
Kolkata - 700 095
Phone : 2414-3033

সবিতেন্দ্রনাথ রায় "কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর"
বইটি লিখে আমার মত পাঠকদের বেজায়
খুশি করেছেন। পাঠকরা যেন মনে রাখেন,
এ বইও একটি ইতিহাস। পাঠকদের সুখবর
দিই, এমন ইতিহাস লেখা আজ খুবই
প্রয়োজন। এই বই বেরিয়েছে বলে আমি
কত আনন্দিত, তা বলতে পারব না। আমার
মন বলে, এ বই বহু মুদ্রণ পাবে,
নন্দিত হবে, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যপ্রেমী
সকলে এ বই সংগ্রহ করবেন।
সে দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মহাশ্বেতা দেবী ॥
২/৪/০৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থটি রচনার জন্য আমি অগ্রজাপ্রতিম মহাশ্বেতা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি বহুদিন যাবৎ আমাকে প্রকাশন জগতের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে বলিতেন। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল আমি তাঁহার স্নেহচ্ছায়া লাভ করিয়াছি। আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা যাঁহাদের অনেকের সহিত আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে, তাঁহারাও এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলে এমন একটি গ্রন্থরচনার কথা বলিতেন।

এই বইটি আমার আত্মজীবনী বা আত্মস্মৃতি নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পর ফল ঘোষণার আগেই আমি নিতান্তই অর্থোপার্জনের জন্য প্রকাশন জগতে প্রবেশ করি। প্রথমে এখানে আসিয়াই মনে হইয়াছিল, এটি কর্মক্ষেত্র না সাহিত্যের বৈঠক অথবা নিছক আড্ডাখানা। ব্যবসার কাজকর্ম যে হইত না তাহা নয়, তবে এক এক সময় বৈঠক বা আড্ডার কলরব ব্যবসায়ের কর্মকাণ্ড ছাপাইয়া যাইত। আড্ডা বলিয়াই বিষয় সর্বদা নিতান্ত লঘু থাকিত না, জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও হইত। কবিশেখর কালিদাস রায় গজেন্দ্রকুমারকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, তুমি যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছ তা নিছক প্রকাশন ব্যবসায় নয়, এটি এখন একটি ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। এই পত্রটি পড়ার পর আমি এখানকার প্রধান ঘটনাবলি যাহা প্রত্যক্ষ করিতাম, স্বকর্ণে শুনিতাম, মাঝে মধ্যে লিখিয়া রাখিতাম। এই গ্রন্থ তাহার ফলশ্রুতি বলা যাইতে পারে।

ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথবা সাহিত্যিকদের দলের সহিত মাঝে মধ্যে বাহিরে যাইতে হইয়াছে। কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ার বাহিরে হইলেও এই পাড়ার সহিত যে সব ঘটনাবলির সম্পর্ক আছে, তাহারও উল্লেখ এখানে আসিয়াছে। আমার এই সব অভিজ্ঞতা তিনটি পর্বে প্রকাশ করিব মোটামুটি এইরূপ স্থির করিয়াছি। নবীন প্রকাশক স্নেহাস্পদা শিখা শিকদার আগাইয়া আসিয়া গ্রন্থটির প্রকাশভার লইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু ১৯৩৪-এ, পাকাপাকি আস্তানা ১৯৩৬-এ। সেই হিসাবে ইহার বয়স সত্তর বা একাত্তর। বইটির নাম সেজন্যই *কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর* রাখা হইয়াছে। ইহার সহিত আমার বয়সের কোনো সম্পর্ক নাই। একটা সময়ের এই অঞ্চলের মোটামুটি একটা ইতিহাস ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সফল হইয়াছি তাহা পাঠকদের বিচার্য।

গ্রন্থশেষে পাঁচটি পরিশিষ্ট আছে। কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে দৈনিক বাংলা স্টেটসম্যান-এ দুইটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রাসঙ্গিক বলিয়া ওই দুইটি নিবন্ধ প্রথম দুই পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। আড্ডা বিষয়ক দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ কথাসাহিত্য ১৩৯৫ সালের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকদ্বয়

যথাক্রমে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র। আড্ডার চরিত্র বুঝিবার জন্য এই দুটি প্রবন্ধ অত্যুত্তম। পরিশিষ্ট তিন ও চার-এ এগুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। এইজন্য ˚প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ˚গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাছে ঋণ আমার এইজন্মে স্বীকার করিয়াও অপরিশোধ্য থাকিয়া যাইবে। সর্বশেষ পঞ্চম পরিশিষ্টে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভার বিবরণ আছে, এটি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে কিছু দুর্লভ আলোকচিত্রসহ তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। পরিশিষ্টগুলি যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের প্রথম পর্ব সমৃদ্ধ হইয়াছে আমার ধারণা। পাঠকদের অনুমোদন পাইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

গ্রন্থটি রচনার জন্য নিরন্তর উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের কথা আগে বলিয়াছি। আমাদের প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সকল সহকর্মী ও সহযোগীবৃন্দের কথা না বলিলে প্রত্যবায় হয়। পরিবারের একান্ত আপনজন যাঁহারা, তাঁহারা গ্রন্থটি যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সেজন্য সর্বদা তৎপর ও যত্নপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলে তাঁহাদের সহযোগিতাকে ক্ষুণ্ণই করা হইবে। কারণ পরের দুটি পর্বে ঋণ বাড়িবে বই কমিবে না। আশা করি খাতককে তাঁহারা আগামী কালেও স্নেহঋণে আবদ্ধ রাখিবেন।

৩০ মার্চ, ২০০৬

বিনত
সবিতেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

গ্রন্থটি জনপ্রিয় হওয়ায় অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল, এজন্য পাঠক সমালোচক প্রকাশক সকলের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুবর অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রসিদ আলি দিবস-এর তারিখ-ভ্রান্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি সংশোধন করা হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রণ-প্রমাদ যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। দেশ পত্রিকায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর বইটির সমালোচনায় বইয়ের সঙ্গে আমারও প্রশংসা করিয়াছেন। বইয়ের নিন্দা-প্রশংসায় সমালোচকের অখণ্ড অধিকার কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমার প্রশংসায় আমি বিব্রত বোধ করি। আমি নিজে জানি আমি কত সামান্য ব্যক্তি। শংকর, তারাপদ রায়, সমরেশ মজুমদার ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যাঁহারা বইটির প্রশংসা করিয়াছেন, সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

৫ জুলাই, ২০০৬

বিনত
সবিতেন্দ্রনাথ রায়

কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর

১

এই গ্রন্থটি কোনো আত্মজীবনী নয়, আবার কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের নিছক ইতিবৃত্তও নয়। অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এই নিবন্ধ কাহিনী। তবে এখানে সেকালের বইপাড়া তথা কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে তুলে ধরার চেষ্টাই করা হয়েছে বেশি।

সেকালের স্থানিক চিত্র কি রকম ছিল এখনকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবেন না। যারা জানতাম তারাও ভুলতে বসেছি। কলেজ স্কোয়ার বা গোলদিঘির দক্ষিণ দিকের রাস্তার নাম ছিল মির্জাপুর স্ট্রীট, এই রাস্তার পশ্চিম অংশের নাম ছিল কলুটোলা, তারপর আরও পশ্চিমে গিয়ে এটাই ক্যানিং স্ট্রীট। কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব ও পশ্চিমের রাস্তা দুটোকেই কলেজ স্কোয়ার বলা হত। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট নামকরণ পরে হয়েছে। গোলদিঘির পশ্চিমে বিরাজ করছে কলেজ স্ট্রীট। সেকাল থেকে এখনও। কী ভাগ্যি এর নাম পালটায় নি।

কলেজ স্কোয়ারের পুবদিকে যে বাড়িগুলি পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ায় সেগুলি হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, মহাবোধি সোসাইটি হল, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, স্টুডেন্টস্ হল। কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে সংস্কৃত কলেজ।

হিন্দু স্কুলের যে নতুন বাড়ি এখন দাঁড়িয়ে আছে, সেটি ১৯৪৯-৫০ সালে তখনও তৈরি হয়নি।

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া অঞ্চল তখন এখনকার মতো দৃষ্টিকটু ভাবে ঘিঞ্জি বাণিজ্যিক অঞ্চল হয়ে ওঠে নি। পুরাতন বইয়ের দোকান ছিল কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে। এখনকার মতো পাকাপাকি স্টল হয় নি। রেলিঙে ও সামনের ফুটপাথের দেওয়াল ঘেঁষে পুরাতন বই বিছানো থাকত। জ্ঞানীগুণী অধ্যাপক গবেষক যাঁরই প্রয়োজন হত, উবু হয়ে বসে হেঁট হয়ে বই দেখতেন। কলেজ স্কোয়ার, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুলের মাঠ রাস্তা থেকেই দেখা যেত। কলেজ স্কোয়ারের টলটলে জল পথিকের চোখ মন শরীর জুড়িয়ে দিত। কলেজ স্কোয়ারের মাঠে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি, হেয়ার স্কুলের মাঠে ডেভিড হেয়ার-এর মূর্তি পথিকের মনে সম্ভ্রম জাগাত। আর সর্বোপরি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল তার বিশাল বিশাল থাম নিয়ে, দরজা খুললে দেখা যেত বিরাট সিনেট হলের অভ্যন্তর, যখন পরীক্ষা বা সভা হত।

কলেজ স্কোয়ার, কলেজ স্ট্রীট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের কোথাও অস্থায়ী কাঠ দিয়ে তৈরি স্টল ছিল না। পথিক ক্রেতা স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারতেন। গোলদিঘির (কলেজ স্কোয়ার) পুব দিকে কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ছিলেন। আশুতোষ লাইব্রেরি ছোটদের বই ও শিশুসাথী পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তার পাশে ছিল বুক কোম্পানি। বুক কোম্পানির কর্ণধার গিরীন্দ্র মিত্র স্কুলপাঠ্য বই বার করতেন, আবার দামী বিদেশী বই আমদানি করতেন। এই সব বই দেখার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী বিখ্যাত অধ্যাপকরা আসতেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যদুনাথ সরকার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতো মানুষরা প্রায়ই এসে বইপত্র ঘাঁটতেন। প্রয়োজনমতো কিনে নিতেন। গিরীনবাবুর এই দোকানে পণ্ডিত মানুষদের আসা-যাওয়া অবারিত ছিল। বই সম্বন্ধে গিরীনবাবুর ধ্যানধারণা ছিল খুব গভীর। কোন্ বই কার কী কাজে লাগবে তা তিনি খুব ভালো বুঝতেন। এখন যেখানে মনীষা, সেখানেই ছিল বুক কোম্পানি। সংস্কৃত কলেজের উল্টোদিকে ছিল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক বাণী মন্দির, সাহিত্যগ্রন্থের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। আর একটি দোকানে কিছু কিছু সাহিত্যিক আড্ডা জমাতেন, সেটি গুপ্ত ফ্রেন্ডস্। এর মালিক আশুবাবু আড্ডাদার মানুষ ছিলেন, একটু খামখেয়ালীও, একবার সব

ছেড়েছুড়ে সংসার ছেড়েও চলে গেলেন, আবার এলেন। কলেজ স্কোয়ারে সেকালের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক মডার্ন বুক এজেন্সি এখনও আছেন। এঁরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও কিছু মূল্যবান সাহিত্য আলোচনার বই প্রকাশ করতেন। তার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* বইটি উল্লেখযোগ্য।

রাজশেখর বসু

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে সাহিত্যের দোকান মিত্র ও ঘোষ ছাড়া তখন আর একটিই ছিল, এম. সি. সরকার। এখানকার কর্ণধার সুধীরচন্দ্র সরকার সাহিত্যনুরাগী মানুষ, শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর প্রকাশক ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত হিন্দুস্থান ইয়ার বুক-এর বেশ নাম ছিল। যদুনাথ সরকারের ইংরেজি ইতিহাসের বই, রাজশেখর বাবুর স্বনামে ও পরশুরাম ছদ্মনামে সব বইয়ের প্রকাশক তিনিই ছিলেন। তাঁর এখান থেকে বেরোত ছোটদের মৌচাক পত্রিকা। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যখের ধন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড় এই পত্রিকাতেই বেরোয়।

কলেজ স্ট্রীটে ট্রামরাস্তার ওপর ছিল বড় বড় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের দোকান। সেন রায় এন্ড কোম্পানি, ইউ এন ধর, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, সেন ব্রাদার্স, কমলা বুক ডিপো, এস. কে. লাহিড়ী, দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানি, কো-অপারেটিভ বুক ডিপো, মন্ডল ব্রাদার্স প্রভৃতি। এদের মধ্যে ইউ. এন. ধর ও দাশগুপ্ত এখনও বিরাজমান।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মোড়ের মাথায় কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচু তখন প্রত্যহ দেখা যেতো। এখনকার মতো ব্যাগে ঢাকা পড়ে নি। এখন ওঁর জন্মদিনে একদিন মালা পরানো হয়। সেদিনই মাত্র মূর্তিটি চোখে পড়ে।

উল্টোদিকে হ্যারিসন রোডের মোড়ে ছিল বড় ওষুধের দোকান—নবীন ফার্মাসি।
কাউন্টারের উপরে থাকত দুটো বড় অ্যাপোথিকারির লাল নীল জলের জার!

মহাত্মা গান্ধী রোড (তখন হ্যারিসন রোড) ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দিলখুসা কেবিন ও উল্টো দিকে জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান খুব বিখ্যাত ছিল সেকালে। কফি হাউসের চেয়েও। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট উত্তরে মহাত্মা গান্ধী রোড পার হয়ে গিয়ে মিশেছে যে রাস্তায়, সেটির নাম কলেজ রো। এখানকার একটি খাবারের দোকান—সন্তোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এখনও আছে, সুনাম বজায় রেখেই। আর আছে মির্জাপুর স্ট্রীটে (এখন নাম—সূর্য সেন স্ট্রীট) পুঁটিরামের দোকান। এই মির্জাপুর স্ট্রীটে এক সময়ে দু-তিনটি মেসবাড়িতে বিখ্যাত মানুষরা থাকতেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একটি মেস বাড়িতে থাকতেন। আর একটি বাড়িতে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বোপদেব শর্মা—কথাসাহিত্যের এক সময়ের সম্পাদক) ও রামমনোহর লোহিয়া থাকতেন। মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর অধুনালুপ্ত পেন-কালির দোকান ধর ব্রাদার্সের দোকানের সামনে একটি বিরাট ফাউন্টেন পেন এই অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে মিত্র ও ঘোষ প্রতিষ্ঠানের বাঁদিকে আর দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল, ইস্টার্ন ল হাউস-এর ব্রাঞ্চ, এঁর দেখাশোনা যিনি করতেন, অনাথবাবু, তিনি আরতি এজেন্সি নামে কিছু ছোটদের বইও প্রকাশ করতেন। আর একটি পুরাতন বইয়ের দোকান ছিল পাশেই, ক্যালকাটা ওল্ড বুক স্টল বা সি. ও. বুক স্টল।

এই পরিবেশে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের গোড়াপত্তন

হয় ১৯৩৪ সালের ৯ই মার্চ। গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ দুই বাল্যবন্ধু এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করেন। গজেনবাবুর বাল্যকালের পড়াশুনো কাশীতে। সেখানে অ্যাংলোবেঙ্গলি স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে উত্তীর্ণ হবার পর ওঁরা চলে আসেন প্রথম কলকাতায় নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলায়, তারপর দক্ষিণে ঢাকুরিয়ায়, যা এখন দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে পড়ে। ঢাকুরিয়ায় আসার পর গজেনবাবু বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। বসেন সুমথবাবুর পাশে। সেই বন্ধুত্ব অটুট ছিল আমৃত্যু।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর পরীক্ষার ভালো ফল দেখে গজেনবাবুর অভিভাবকরা তাঁকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু যিনি কাশীতে বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের রসে আপ্লুত, বিজ্ঞান তাঁকে টানবে কেন। সে সময়ে চাকরি পাওয়াও সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশায়ের কাছে শুনেছি তাঁদের মেস-বাড়িতে এম. এ পাশ তরুণ নয়জন গোল্ড মেডালিস্ট ছিলেন। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। সকলেই পয়সার অভাবে তাঁদের সেই সব সোনার মেডেল বিক্রি করে মেসের খরচ মিটিয়েছেন। এই সময়েই সেন ব্রাদার্সের ইংরেজি নোট বই লেখার কাজ পেয়ে জিতেনবাবুর অর্থ-সংকটের সুরাহা হয়। জে. এল. ব্যানার্জি—বিখ্যাত অধ্যাপকের নামে যে নোট বই চলত, সেগুলি জিতেনবাবুই লিখতেন। শুনেছি সেন, রায় কোম্পানির এম. সেন-এর নামে বাংলা নোট বইগুলি কবিশেখর কালিদাস রায় লিখতেন। গজেনবাবু বিজ্ঞানের পড়া ছেড়ে এবং কোন

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

চাকরি না নিয়ে ঠিক করলেন, সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনায় মনোনিবেশ করবেন। সুমথবাবুও প্রকাশনায় যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুমথবাবুর অঙ্কনশিল্পে দক্ষতা ছিল। প্রথমে হয়তো ভেবেছিলেন চিত্রশিল্পীই হবেন। দুজনে মিলে পত্রিকা বার করলেন *বিজয়*। তারপর সুমথবাবুও অঙ্কন ছেড়ে সাহিত্যরচনায় নেমে পড়লেন।

দুজনেরই প্রথম রচনা কিশোরদের জন্য। তবে গজেনবাবু সেইসঙ্গে বড়দের জন্যও ছোট গল্প লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনের প্রথম বই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটদের জন্য গ্রন্থ *বিজ্ঞানের দান*। চটি বই। তখনকার দিনে দাম পাঁচ আনা মাত্র। এখনকার হিসেবে ত্রিশ পয়সা। তারপর বের হল গজেনবাবুরই একটা বই *বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন*, এবং উভয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ *ঐতিহাসিক গল্প সঞ্চয়ন*, বিভিন্ন লেখকের ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে সংকলন। তখনকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ এই বইয়ের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

এই সব বই বিভিন্ন দোকানে জমা দিয়ে আসতে হত। বিক্রি হলে দাম আদায় করতে হত। শ্রীমানী মার্কেটের কাছে শ্রীগুরু লাইব্রেরি এঁদের বই ভালো বিক্রি করতেন। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলেও মন্ডল ব্রাদার্স এবং আরও কিছু কিছু বিক্রেতা ছিলেন। এই বিক্রিতে প্রকাশন হয়তো কোনমতে চলে, কিন্তু স্বনির্ভর হয়ে সংসার চালানো যায় না। যদিও দুই বন্ধুর কেউই তখনও বিবাহ করেন নি। কোনও স্থায়ী কাউন্টারও হয় নি।

সেজন্য কিছু আয়ের জন্য নতুন বছর শুরু হবার আগে এঁরা দুজনেই স্কুলপাঠ্য-প্রকাশকদের বই নিয়ে বিভিন্ন স্কুলে ক্যানভাসিংয়ে বেরোতেন। গজেনবাবু বুক কোম্পানির হয়ে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন। ফলে এই জায়গার অনেক সমাজজীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ছোটগল্পে, উপন্যাসে এখানকার মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

স্কুল ক্যানভাসিং শেষ হলে, দুই বন্ধু আবার কিছু সঞ্চয় নিয়ে প্রকাশনে নেমে পড়তেন। এই সময়ে এঁদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন গজেন্দ্রবাবুর এক সময়ের হিতৈষী অগ্রজতুল্য ডাঃ রণেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র। এঁর কথা পরেও আসবে। ফাঁক পেলে গজেনবাবু ও সুমথবাবু নতুন পুরোনো সব রকম বই ট্রাঙ্কে বোঝাই করে বেরিয়ে পড়তেন বাংলার বাইরে বাংলাভাষী অঞ্চলে, যেখানে বাংলা বই সহজে পাওয়া যায় না। পাটনা, কাশী, ভাগলপুর, মুঙ্গের

এই সব শহরে অনেক পাঠক ও লেখকও থাকতেন। এই ভাবেই ভাগলপুরে বনফুলের (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) কাছে তাঁরা পৌঁছে যান।

তাঁদের এই যৌথপ্রচেষ্টা বনফুলকে অভিভূত করে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সংবর্ধনা সংখ্যায় 'বনফুল' সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই কবিতাটি লেখেন—

স্নেহাস্পদ শ্রীমান গজেন্দ্রকুমার মিত্র
কল্যাণীয়েষু

ভাই গ,

তোমার সম্বর্ধনা হচ্ছে
এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।
অনেককে সম্বর্ধিত করেছ তুমি
এ সম্বর্ধনা তোমার ন্যায্য পাওনা।
সম্পাদক মশাইরা অনুরোধ করেছেন
তোমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি যেন।
কিন্তু তা পারব না ভাই
তোমাকে ভালোবাসি ছোট ভাইয়ের মতো
আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে।
তোমার সাহিত্যের বিচার
মহাকালই যথাকালে করবেন
এবং আশা করি তুমি পাস মার্ক পাবে।
তোমাকে আমি ভালোবাসি,
তোমার কর্ম-প্রতিভার জন্য
তোমার ভদ্রতার জন্য
তোমার চক্ষুলজ্জার জন্য
তোমার শালীনতার জন্য।
যতদূর মনে পড়ছে
তোমার সঙ্গে আমার
প্রথম যখন দেখা হয়েছিল
তুমি ও সুমথ
'মিত্র ও ঘোষ' ছোট্ট দোকান তখন।
এখন তা অনেক বড় হয়েছে

সুমথর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব
আজও অটুট।
তোমরা দেখিয়ে দিয়েছ
ব্যবসার মূল-ধন টাকা নয়
চরিত্র।
তোমাদের চারিত্রিক গুণাবলীই
আজ জ্বল জ্বল করছে
তোমাদের সুবিস্তৃত ব্যবসায়ে,
এই সমুজ্জ্বল পটভূমিকায়
প্রতিফলিত হয়েছে
তোমার গুণগ্রাহিতা,
তোমার রসবোধ
তোমার সাহিত্য-প্রতিভা
তোমার সততা
তোমার অধ্যবসায়
তোমার ভদ্রতা
তোমার প্রেম।

আশীর্বাদ করছি।
সুস্থ দীর্ঘায়ু নিয়ে
তুমি তোমার আদর্শের পতাকাটি
এ দেশের আকাশে সমুড্ডীন রাখো
যে দেশে ছেলেরা
ন্যুব্জ হয়ে চাকরি খুঁজছে কেবল,
চরিত্র-বলে
নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না।

শুভার্থী
বনফুল

এই সময় এঁরা নিজেদের সৌভাগ্যক্রমেই দুজন আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পান। একজন হলেন কালিকা প্রেস ও টাইপফাউন্ড্রির তদানীন্তন বড় কর্তা মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, আর একজন হলেন প্রখ্যাত কাগজব্যবসায়ী

ভোলানাথ দত্তর কনিষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণ দত্ত, বইপাড়ায় কাগজের মহলে এঁর পরিচয় ছোটবাবু বলে। বোধ হয় ভোলানাথবাবুর ছোট ছেলে বলেই।

মনোরঞ্জনবাবু বললেন—গজেন, এভাবে তোমাদের ব্যবসা হবে না। একটা দোকান করে বসো।

তখন দোকান-ঘরের জন্য এত সেলামি বা ভাড়া লাগত না।

গজেন বাবু বললেন, দোকান নিয়ে সাজাবো তা এত বই কোথায়? আর বই রাখার আলমারিই বা পাবো কোথায় এত?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, তোমরা ঘরটা তো নাও, তারপর আমি দেখছি।

এগারো নম্বর কলেজ স্কোয়ারে একটা ঘর পাওয়া গেল। আগেই বলেছি, তখনও বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট নাম হয় নি। মনোরঞ্জনবাবু তিনটি আলমারি দিলেন। মিত্র ও ঘোষের নিজস্ব বই সামান্যই তখন। মনোরঞ্জনবাবুদের কালিকা প্রেসের নিজস্ব কিছু ভালো প্রকাশনা ছিল, ছোটদের বইই বেশি, গীতগোবিন্দের অনুবাদ ও কিছু ধর্মপুস্তক ছিল। সেই সব বই দিয়ে মনোরঞ্জনবাবু র‍্যাক আলমারি ভরিয়ে দিলেন।

দোকান করে বসার আগেই অবশ্য কতকগুলি নামী বই মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় বিভূতি দত্ত মশাই এঁদের কাজকর্ম দেখে ধারে কাগজ দিলেন। বই বেচে দেনা শোধ হবে। তখন যাঁদের বই বেশি বিক্রি হত—শরৎচন্দ্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের কাছে যাওয়াই তো দুষ্কর, তারপর বইয়ের প্রকাশ। গজেনবাবু সুমথবাবুরা ঠিক করলেন—উপন্যাস নয়, প্রবন্ধের বই ছাপবেন। দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য দর্শনের উপর অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি একত্র করে একটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন তাঁরা। সুরেন্দ্রবাবু প্রস্তাব শুনে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন একটু বিস্মিত ভাবেই, আপনারা নিজের খরচে ছাপাবেন? আমি কিন্তু পয়সাকড়ি কিছু দিতে পারবো না।

গজেনবাবু-সুমথবাবু বললেন, না-না, আপনি কেন পয়সা দেবেন, আমরা নিজেদের খরচেই ছাপাবো। বিক্রি হলে বরং আপনাকে রয়্যালটি দেবো।

প্রথম বই বেরোল মিত্র-ঘোষের, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *রবি-দীপিতা*।

এই বইটি বেরোবার পর সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মজা করে লিখেছিলেন—'মিত্র ও ঘোষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের রবি-the-পিতা বাহির হইয়াছে।'

'দী' শব্দটি ইংরেজিতে লিখলাম, পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য। সজনীবাবু লিখেছিলেন 'রবি-দী-পিতা' এইভাবে।

মিত্র ও ঘোষের দ্বিতীয় বইও প্রবন্ধের বই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য*।

সুনীতিবাবুও সুরেন্দ্রবাবুর মতো বলেছিলেন, আমি কিন্তু এক পয়সা দিতে পারব না।

তখন প্রবন্ধগ্রন্থ বিক্রির এমনই অবস্থা ছিল।

গজেনবাবু সুমথবাবু ঢাকুরিয়ায় থাকতেন। প্রবোধকুমার সান্যাল মশাই তখন *মহাপ্রস্থানের পথে, যাযাবর, প্রিয়বান্ধবী* প্রভৃতি বই লিখে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছেন। কল্লোল গোষ্ঠীর আর কোন লেখকের এত খ্যাতি হয় নি তখন। প্রবোধবাবুর বাড়ি সে সময়ে ঢাকুরিয়ার দাসপাড়ায়। গজেনবাবু সুমথবাবুর প্রতিবেশী। সেই সুবাদে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও। প্রবোধবাবুর কিছু ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে একটা বই হল *দেশ-দেশান্তর*— ভ্রমণকাহিনী। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবিদের আলোচনা নিয়ে সংকলন গ্রন্থ *সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ*ও এই সঙ্গে বেরোল।

সে সময়ে প্রবোধবাবুর বাড়ির একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। মেঝেয় মাদুর পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছেন তন্ময় চিত্তে। পেটের কাছে কী চুলকোচ্ছে। প্রবোধবাবু তাতে পাত্তা না দিয়ে লেখা শেষ করে মাদুর তুলতে গিয়ে দেখেন, নিচে একটা কাঁকড়া বিছে। বিষ ঢোকে নি, কিন্তু আঁচড়েই জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। তখনকার দিনে লেখকদের সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল এই রকমই।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ

১১ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে মিত্র ও ঘোষের কাউন্টার কিছুদিন পরেই স্থানান্তরিত হল ১০ নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর স্মৃতিকথা *সেই সব দিন* গ্রন্থে লিখেছেন—"এই বাড়িটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই বাড়িতেই প্রথম মেডিক্যাল কলেজের কাজকর্ম শুরু হয়। ব্যঙ্গপত্রিকা 'অবতার'-এর এক সময়ে খুব নাম ছিল। কভারে একটি ছবি থাকত—অর্ধেকটা সাহেব, বাকি অর্ধেক নিষ্ঠাবান পৈতাধারী ব্রাহ্মণ।* সে পত্রিকারও অফিস ছিল এখানে। সেকালের এক বিখ্যাত প্রকাশক এস. কে লাহিড়ীর প্রেস ছিল এই বাড়িতেই।"

সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যতিক্রমী গ্রন্থের প্রকাশনায় মিত্র ও ঘোষের প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কবিশেখর কালিদাস রায় ইংরাজি থেকে বাংলা একটি ছোট অভিধান তৈরি করে দিলেন—*স্কুল পকেট ডিক্‌শনারি*। সেটি এখনও চলছে।

এই বাড়িতেই প্রকাশন চলার সময়ে কাজে যোগ দিলেন গজেনবাবু সুমথবাবুর পরে আমাদের বর্তমানের প্রবীণতম ডিরেক্টর প্রফুল্লকুমার বসু। আমরা ডাকনামে মন্তুদা বলতাম। প্রায়ই বিকেলবেলা কবি-সাহিত্যিকরা এখানে এসে আড্ডা দিতেন।

এরই সঙ্গে ঢাকুরিয়াতেও একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠছিল। গজেনবাবুর কাছে একটি কিশোর ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি

---

*আমি যখন ১৯৪৯ সালে এই প্রকাশনায় কাজ করতে আসি, তখনও *অবতার* পত্রিকার একটি ছোট সাইনবোর্ড বাড়ির দরজায় আটকানো থাকতে দেখেছি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পড়তেন। ছেলেটির পরিবারে আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল না। ছেলেটি মেধাবী ছিল। আর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একটি ইংরাজি বাংলা অভিধান গোটাটাই মুখস্থ করে ফেলেছিল। গজেনবাবু স্নেহবশত তাঁকে 'বৎস' বলে ডাকতেন। এই 'বৎস'ও তাঁকে আজীবন 'মাস্টার মশাই' বলে অভিহিত করে এসেছেন। এই 'বৎস'ই ভবিষ্যতের সাংবাদিক অনুবাদক ভূপেন্দ্রনাথ বসু। *ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট, গ্রোথ অব্ দি সয়েল* প্রভৃতি বিদেশী উপন্যাস তিনি অনুবাদ করেছিলেন। এঁর সহপাঠী ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ভূপেন্দ্রনাথের মাধ্যমেই গৌরীশঙ্কর গজেনবাবু-সুমথবাবুর সংস্পর্শে এলেন। গৌরীশঙ্করের সাহিত্যের নেশা ছিল। তিনি ঢাকুরিয়ায় বাসা নিলেন ভূপেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই। প্রবোধবাবুর সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। এখন প্রবোধবাবু গজেনবাবু সুমথবাবু গৌরীদা ভূপেনদাদের নিত্য সাপ্তাহিক বৈঠক হতে লাগল, কখনও এঁর বাড়ি কখনও ওঁর বাড়ি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভূপেনবাবু স্নাতক হবার পর অধুনালুপ্ত হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে সাংবাদিক রূপে যোগ দিলেন। গৌরীশঙ্কর অনুবাদ কর্ম, গল্প লেখার সঙ্গে গজেনবাবু-সুমথবাবুর সাহায্যে প্রকাশনার ব্যবসায় শুরু করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম হল 'মিত্রালয়'। 'মিত্রালয়ে'র আলাদা কোন কাউন্টার হয়নি তখনও। মিত্র ও ঘোষের কাউন্টার থেকেই মিত্রালয়ের বই বিক্রি হত।

ঢাকুরিয়ার আড্ডার কথা বললাম এই কারণে যে এই আড্ডার আলাপ-

আলোচনা এখান থেকে শুরু হয়ে যেত কলেজ স্ট্রীটে, আবার কলেজ স্ট্রীটের আলোচনা গড়িয়ে আসত ঢাকুরিয়ায়। এইভাবে সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য আলোচনার আড্ডা পরিধি ও সময় দুইই বাড়তে লাগল। প্রকাশন ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলল এই আড্ডা।

আগেই বলেছি, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে কাউন্টার উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানে সাহিত্যিকদের আনাগোনাও বেড়ে গেল। কবিশেখর কালিদাস রায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাসবাবুর এক সময়ের ছাত্র ও মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন, মির্জাপুর স্ট্রীটের) বাংলার শিক্ষক কবি কৃষ্ণদয়াল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধবাবু-প্রবোধকুমার সান্যাল ঢাকুরিয়া থেকে বইপাড়ায় গেলে, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজার থেকে—এঁরা ছিলেন আড্ডার প্রথম যুগের মানুষ। কালিদাসবাবু, সুনীতিবাবু, কৃষ্ণদয়ালবাবু প্রায় নিয়মিত সদস্য ছিলেন। অন্যেরা যখন এসে পড়তেন এদিকে, যোগ দিতেন আড্ডায়।

মিত্র ও ঘোষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বই *অভিযাত্রিক*, স্মৃতিকথা-মূলক ভ্রমণকাহিনী। তারশঙ্করের প্রথম বই *প্রতিধ্বনি*।

গৌরীশঙ্কর চতুর্থ বর্ষে পড়তে পড়তে কঠিন অসুখে পড়েন। তাঁর অল্পবয়সেই বিবাহ হয়। তিনি সুস্থ হয়ে পুরোপুরি প্রকাশন ব্যবসা ও সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করলেন। রিপন (এখন সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ছাত্র হবার সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেবতীভূষণ ঘোষ। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের এক বছর বা দুই বছরের পরের বর্ষে পড়তেন। প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকরা পড়াতেন রিপন কলেজে। বিভূতিভূষণ কাঁঠাল, যিনি একদা গজেনবাবুদের জগদ্বন্ধু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, তিনিও তখন রিপন কলেজে যোগ দিয়েছেন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন ভবতোষ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। এই কলেজে ছাত্র হওয়ায় পরিচিতির ফলেই গৌরীশঙ্কর প্রমথনাথ বিশী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশ

করেন। প্রমথবাবু আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হলে প্রায়ই গৌরীশঙ্করের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনার জন্য কলেজ স্ট্রীটে নামতেন। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ছিল চিৎপুরে, বর্মন স্ট্রীটে। এইভাবে প্রমথবাবুও এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলেন।

প্রমথনাথ বিশী

প্রবোধবাবু, গজেনবাবু ও সুমথবাবুরা তিন বন্ধুতে যুক্তি করে মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন। এই সময়েই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে দুটি আপাত-বিরুদ্ধ ঘটনা চোখে লাগার মতো। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু হল, কাগজ বই বাঁধাইয়ের খরচা বাড়ল। কাগজ দুষ্প্রাপ্যও হল আবার সেই সঙ্গে বইয়ের বিক্রিও বাড়ল। আগে বই ছাপা হত ৫৫০, ৭৫০ এখন ছাপা হতে লাগল ১১০০, ২২০০ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ততোধিক। আর বিপরীত দিকে শুরু হল কলকাতাবাসীর কলকাতা ছেড়ে পালানো। কারফিউ ব্ল্যাক আউটে কলকাতা শহর অচেনা হয়ে উঠল।

"যুদ্ধের সময়ে নিষ্প্রদীপের (ব্ল্যাক আউট) ঘোষণা হওয়া মাত্র কলকাতার চেহারা পালটে গেল। রাস্তার আলোগুলির ঠুলি বসল। বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ রাখার হুকুম হল, যাতে রাত্রে আলো না দেখা যায়। অসতর্ক গৃহস্থের দরজা জানালা দিয়ে আলো দেখা গেলেই এ. আর. পি. সিভিক গার্ডের শাসানি শোনা যেত। মাঝে মাঝেই সাইরেনের শব্দে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আচ্ছাদনের নিচে আশ্রয় নিতে হয়। মাঠে উন্মুক্ত স্থানে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হল। হাসপাতাল, সরকারী অফিসগুলির সামনে ইঁটের পাঁচিল ব্যারিকেড বসল। বোমার টুকরো যাতে ভিতরের ব্যক্তিদের সরাসরি আঘাত না করে এ জন্যই পাঁচিলগুলি এমন ভাবে হত যাতে লোকও যাতায়াত করতে পারে আবার সামনা-সামনি নজর না আসে। বইপাড়ায় দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানির বড় কাউন্টারের সামনেও বসেছিল এইরকম ইঁটের পাঁচিল। তার একাংশ এখনও রয়ে গেছে।

যুদ্ধের সময় নতুন নতুন খবরে শহর তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। তারই সঙ্গে নতুন জোয়ার যোগ হল স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতে। গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধান শোরগোল তুলেছে সরকারী বেসরকারী সব মহলেই। দেশবাসী সব খবর জানতে পায় না। ইংরেজ সরকারি সংবাদপত্রে সেন্সর রেখেছেন।

সাহিত্যের আড্ডা কিন্তু কিছুমাত্র কমে নি। এর মধ্যেও আড্ডা চলে অব্যাহত। এই আড্ডার মধ্যেই প্রবোধবাবু বললেন, চলুন ঘুরে আসি। প্রবোধবাবু গজেনবাবু সুমথবাবু গৌরীশঙ্কর বেড়াতে চললেন—বানজারি, রোটাসগড়ের কাছে একটি সুন্দর মনোরম স্থান। তাঁরা যখন বাইরে সেই সময়ই বোমা পড়ল কলকাতার ডালহৌসিতে, হাতিবাগানে। কলকাতার লোক এবার দলে দলে আতঙ্কে পালাতে লাগল। ফেরার পথে প্রবোধবাবুরা দেখলেন কলকাতাগামী ট্রেন জনশূন্য। স্টেশনে স্টেশনে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে ভিড়। তাঁরা কলকাতা থেকে যতদূরে পারেন চলে যাবেন। প্রবোধবাবুদের দিকে অপেক্ষমাণ জনতা সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন, এঁরা কী জন্যে কী সাহসে কলকাতা যাচ্ছেন! কেউ কেউ তো বলেই ফেললেন, ফিরুন মশাই, কোথায় যাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশনই নেই, সেখানে তো একটা ভয়াবহ গর্ত রয়েছে বোমার ঘায়ে।

হাওড়া পৌঁছে অবশ্য দেখা গেল, কলকাতা রয়েছে কলকাতাতেই।

এই সময়ে অনেকেই বাড়ি জমি জায়গা জলের দরে বিক্রি করে চলে যান মফঃস্বলে বা নিজেদের দেশগাঁয়ে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সুন্দর নতুন দোতলা বাড়ি নাকি উনিশ হাজার টাকায় বেচে ঝাড়গ্রাম চলে গেলেন। কেউ বা মফঃস্বলে গিয়ে পাকা আস্তানা গাড়েন। কলকাতা যখন যেতে বসেছে, তখন আর এখানে সম্পত্তি রেখে কী লাভ! বর্তমান প্রাচী সিনেমার কাছে এক পানের দোকানী দুখানা বাড়ি ১৩ হাজার টাকায় কিনে নেন। পরে যখন আবার উল্টো উজানে কলকাতা আসা শুরু হল তখন কলকাতায় জায়গা পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠল। সেই যে দরদাম বাড়তে শুরু হল কলকাতার জমি জায়গার, সে আর কমল না।

যুদ্ধ সম্বন্ধে নিত্য নানা গুজব রটত। ইংরেজ ছেড়েছুড়ে সব পালাচ্ছে। অথবা জার্মানির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে যুদ্ধ থামানোর। পরদিন সংবাদপত্র দেখার আগ্রহে রাত কাটত। এইসময় নীরদবাবু (বিখ্যাত নীরদ সি. চৌধুরী) রেডিওতে মিলিটারী কমেন্টেটর (সামরিক ভাষ্যকার) ছিলেন। তিনি নিজের

বিদ্যাবুদ্ধিতে একবার মিত্রপক্ষের সামরিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। ইউরোপে মিত্রপক্ষের সেনাদল তখন ঠিক সেই সময় কোথায় অবস্থান করছেন জানিয়ে তিনি তাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করার সম্ভাবনা আছে বলেন। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী পুলিস তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল একেবারে জঙ্গীলাট ওয়াভেলের সামনে, সিমলায় শুরু হল নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদ। যে কথা উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ জানে না, সে আক্রমণের পূর্বসংবাদ নীরদবাবু কেমন করে জানলেন? সামরিক বিভাগেই তবে কোথাও ছিদ্র আছে, আছে কোন গুপ্তচর? অবশেষে বহু চেষ্টায়, ম্যাপ ও বই দেখিয়ে নীরদবাবু বোঝাতে পারলেন, ভৌগোলিক জ্ঞান ও সামরিক স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে পড়াশুনো থাকলে এবং একটু কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে মিত্রপক্ষের ঐ দুটি স্থান দখল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে নীরদবাবু অব্যাহতি পান। শোনা যায়, আসবার সময়ে সামরিককর্তা

বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এভাবে কাণ্ডজ্ঞান আর খাটাতে যাবেন না, তাতে আপনার আমার দুজনেরই বিপদ। নীরদবাবু জিতেনবাবুর (কথাসাহিত্যের প্রাক্তন সম্পাদক ৺জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) ও ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুদিনের বন্ধু। নীরদবাবু ও জিতেনবাবুর সঙ্গে এক মেসে থাকতেন সোস্যালিস্ট নেতা রামমনোহর লোহিয়া। একটা ঘরে তিন মহান ব্যক্তি— নীরদবাবু, বিভূতিবাবু ও দক্ষিণারঞ্জন কিছুদিন বাস করেছিলেন।" [গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *সেই সব দিন* গ্রন্থ থেকে।]

যখন গজেনবাবু, সুমথবাবুরা উভয়ে অথবা প্রবোধবাবু ও অন্য সব সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন, তখন মন্তুদার (প্রফুল্লকুমার বসু) ওপর প্রকাশন ব্যবসায়ের যাবতীয় ভার থাকত। তাঁর একজন সহকারী পরিচারক ছিল—কেষ্ট, কৃষ্ণকালী। নিত্য আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন কবি কৃষ্ণদয়াল বসু। আগেই বলেছি, কৃষ্ণদয়াল মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) এর

বাংলার শিক্ষক ছিলেন। সব সময়ে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি এবং চাদরে আবৃত, দীর্ঘ চেহারা, একটু কৃশতনু।

কৃষ্ণদয়ালবাবুর ব্যাকরণে ছন্দে ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। ইনি উলার স্কুলে পড়বার সময়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের ছাত্র ছিলেন। মেধাবী কৃষ্ণদয়ালকে কবিশেখর বরাবর স্নেহ করতেন। আড্ডায় প্রতি শুক্রবার কখনও কখনও মঙ্গলবারেও কবিশেখর আসতেন। গজেনবাবু-সুমথবাবুর অনুপস্থিতিতেও আড্ডা চলার বিঘ্ন ঘটত না। একবার গজেনবাবু হরিদ্বার গেছেন তাঁর মা'র কাছে। গজেনবাবুর মা প্রায় সময়ই হরিদ্বারে থাকতেন। কবিশেখর এসে গজেনবাবুর খোঁজ করতে জানলেন তিনি হরিদ্বারে। আড্ডা জমবে না তাই ভেবে বিরক্ত হয়েই যেন বললেন—বাজারে নেই খরিদ্দার, গজেন গেল হরিদ্বার।

কৃষ্ণদয়ালের ব্যাকরণ জ্ঞান ও ছন্দের অধিকারের কথা বলেছি। পানিংয়েও (Punning) তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। একবার আড্ডার মধ্যে গজেনবাবুকে সুমথবাবু ডাকলেন বাইরে—একটু প্রাইভেট কথা আছে। কৃষ্ণদয়াল বললেন—আপনাদের দুজনের তো প্রায়ই ভেট (দর্শন) হয় মশাই, আবার প্রাইভেট। আড্ডার মধ্যে মুড়ি-বাদামের সঙ্গে নুন খাওয়া ভালো নয় কে যেন বললেন। একজন লেখক বললেন তাঁর নুন ছাড়া খাওয়া হয় না, রোজই নুন চাই। কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন—আপনি মশাই তাহলে ফি রোজ খান নুন।

কবিশেখর কালিদাস রায়

তখন ফিরোজ খান নুন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। *সোনার বাংলা* পত্রিকা বেরোত পূর্ববঙ্গ থেকে। তার সহযোগী সম্পাদক প্রফুল্লকুমার গুহ প্রায়ই আসতেন।

এঁদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতা। এঁদের সঙ্গে দু-পুরুষের হৃদ্যতা আজও বজায় আছে। প্রফুল্লবাবুরা বিজয়গড়ে উঠেছেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এসে। প্রফুল্লবাবু বলছিলেন পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দুঃখের কথা। কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন, সত্যিই, পাকিস্তান থেকে এসে এখন *পা কি স্থানে* রাখবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কৃষ্ণদয়ালবাবুকে সবাই মাস্টার মশাই বলতেন। সে হিসেবে কবিশেখরও মাস্টার মশাই ভবানীপুরে মিত্র ইনস্টিটিউশনের (ব্রাঞ্চ)। তিনি কিন্তু কালীদা অথবা কবিশেখর। কালিদাসবাবুরও ব্যাকরণজ্ঞান খুব গভীর ছিল। কালিদাসবাবুর *রচনাদর্শ* নামে ব্যাকরণ ও রচনার বইটি আজও বাংলা শিক্ষার্থীদের আদর্শ মনে হয়। তেমনই ছিলেন তাঁর ছাত্র—কৃষ্ণদয়াল। তাঁর দুখানি বই *এসেন্সিয়ালস অফ বেঙ্গলি গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন* এবং *বর্ণশ্রী* অমূল্য ছাত্রবান্ধব বই ছিল।

এঁদের দুজনের বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাজ্ঞান কেমন ছিল দু-একটা ঘটনা দিয়ে বোঝাই। একদিন সুনীতিবাবু হন্তদন্ত হয়ে এলেন, বললেন, আচ্ছা কবিশেখর বা কৃষ্ণদয়াল এখন আসবেন?

আমরা বললাম, তাঁরা এলে তো বিকেলেই আসেন।

সুনীতিবাবু বললেন, মুশকিল হল, একটা শব্দ মনে পড়ছে না, বইয়ের উৎসর্গপত্রে দেবো, আপনারা জানেন? ওই যে যাকে বার বার দেখেও আশ মেটে না,—কি যেন শব্দটা।

আমরা *নয়নাভিরাম* এরকম সব শব্দ বললাম। পছন্দ হল না সুনীতিবাবুর। বিকেলে কৃষ্ণদয়ালবাবু আসতে বললাম। উনি শুনেই বললেন—কেন, তোমরা *অসেচনক* শব্দটা পাওনি কোথাও!

পরিভাষার শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিস্টালাইজেশন-এর বাংলা হয়েছে 'কেলাসন'। কবিশেখর শুনে বললেন, কেন যে এসব শব্দ তৈরি করে। স্ফটিকায়ন করলেই তো হত। মানুষ শুনেই বুঝতে পারে যাতে।

৩

যুদ্ধের সময়ে কলকাতা ও দেশের অবস্থা পালটে গেলেও সাহিত্যিকদের দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়ার বিরতি ঘটে নি আগেই বলেছি। একবার বিভূতিবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), গজেনবাবু, সুমথবাবু, গৌরীশঙ্কর সবাই গরমের সময়ে পুরী বেড়াতে গেছেন। সেখানে বীরেন রায় মশাই (বেহালার নয়, ইনি প্রত্নতাত্ত্বিক) ছিলেন। খুব আড্ডা জমে উঠত তাঁদের সকালে বিকেলে। বিভূতিবাবু সপরিবারে গিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণকে এঁরা সবাই বড়দা বলতেন, এই নামটা গৌরীশঙ্করই প্রথম চালু করেন। একসঙ্গে নাম বলে 'দাদা' যোগ করার চেয়ে বড়দা বলা ভালো। বিভূতিভূষণের পত্নীর নাম 'রমা' হলেও উনি ওঁকে কল্যাণী বলে ডাকতেন। ফলে তিনি সকলের কল্যাণী বৌদি। সকাল বেলায় সমুদ্রস্নানের জন্য সবাই তোড়জোর করছেন, কল্যাণী বৌদি গজেনবাবুর কাছে আড় হয়ে পড়লেন, ঠাকুরপো, আপনি আপনাদের বড়দাকে সমুদ্রে নামতে দেবেন না। এই বয়সে পা ভাঙলে জোড়া লাগতে কষ্ট হবে। এমনই ব্যাকুলতা ছিল তাঁর স্বামী সম্বন্ধে।

অগত্যা ওঁরা তীরের কাছে দাঁড়িয়ে বসে যতটা সমুদ্রস্নান করা যায় করছেন। গৌরীশঙ্কর ভালো সাঁতার জানতেন। সাঁতরাতে সাঁতরাতে দূরে চলে যেতেন। নুলিয়ার সাহায্য তোয়াক্কা করতেন না। বিভূতিবাবু বলে উঠলেন, দেখুন দেখুন, ফোতোটার কাণ্ড দেখুন। বিপদ না ঘটায়।

গৌরীদা জামা-কাপড়ে খুব ফিটফাট থাকতেন। সেজন্যই বিভূতিবাবুর ঐ সম্বোধন, তবে অবশ্যই স্নেহ-ভরা।

ওঁরা পুরীতে উঠেছিলেন কোন এক জমিদার-বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় বসে গল্প হচ্ছে সবাই মিলে—জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য নিয়ে। বিভূতিবাবু গজেনবাবুকে বললেন, হ্যাঁ, মশাই, আমি যদি বলি আমার এখন গরম মালপো খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে তো আপনার জগন্নাথদেব খাওয়াবেন?

বিভূতিভূষণ

গজেনবাবু বললেন, সে জগন্নাথই বলতে পারবেন, আমি কী বলব?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়েছেন। গজেনবাবুর পাণ্ডা মধুসূদন শিঙ্গাড়ির এক ছড়িদার এসে গজেনবাবুর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে।

কারও অসুখ-বিসুখ কি না ভেবে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গজেনবাবু দরজা খুললেন—দেখেন পাণ্ডাজীর ছড়িদার। জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

ছড়িদার বললেন—এই জগন্নাথদেবের শৃঙ্গার ভোগ হল, গরম মালপো, তাই পাণ্ডাজী বললেন গজেনবাবুকে দিয়ে এসো।

গজেনবাবু বললেন—তুমি ঐ সামনের ঘরে গিয়ে কড়া নাড়ো তো, বিভূতিবাবুই খেতে চেয়েছেন।

পাণ্ডা কড়া নাড়তে, বিভূতিভূষণও ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে বললেন, কী ব্যাপার, কী হল গজেনবাবু?

গজেনবাবু বললেন, ঐ যে আপনি মালপো খেতে চেয়েছিলেন, জগন্নাথদেব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পরদিন সকালে বসে বারান্দায় আবার গল্পগুজব চলছে। বিভূতিভূষণ বললেন—অবাক কাণ্ড মশাই, মালপো চাইলাম আর খোদ জগন্নাথদেব পাঠিয়ে দিলেন! তা মশাই, আমি যদি এখন সন্দেশ আর ল্যাংড়া আম খেতে চাই, তাও দেবেন জগন্নাথদেব?

বিভূতিভূষণের কথা শেষ হয়েছে কি হয় নি, ঐ জমিদার-বাড়ির গৃহিণী এলেন ভেতরবাড়ি থেকে, সঙ্গে পরিচারিকা ও তার হাতে একটি বড় বারকোশ।

সেই সম্ভ্রান্ত গৃহিনীটি ওঁদের উদ্দেশ করে বললেন, বাবা, আপনারা সব বড় বড় সাহিত্যিক এসেছেন শুনলাম, তা আমার কর্তামশাইটির কাণ্ড দেখুন না, আমরা দুটি প্রাণী মাত্র, আমাদের জন্য পেটি ভর্তি বাগানের আম আর সন্দেশ পাঠিয়েছেন। তাই থেকে কিছুটা নিয়ে এলাম আপনাদের জন্যে।

উনি চলে গেলে বিভূতিভূষণ বললেন, না মশাই, আর কিছু চাওয়া উচিত হবে না জগন্নাথদেবের কাছে।

এই ঘটনা নিয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র একটি গল্পও লিখেছেন।

বিভূতিভূষণের পরলোকতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতায় খুব বিশ্বাস ছিল। প্ল্যানচেট ইত্যাদি ব্যাপারে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে ওঁর নিয়মিত পত্রালাপ ছিল।

যুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, তারই মধ্যে সাহিত্যচর্চা কিন্তু থেমে থাকেনি। থেমে থাকেনি আড্ডা এবং ভ্রমণও।

সাহিত্যিকদের এই যে দল বেঁধে বেড়ানো তা কিন্তু বেশি দূর না, পুরী ভুবনেশ্বর ঘাটশিলা মধুপুর শিমুলতলা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। প্রবোধ সান্যাল মশাই মাঝে মধ্যে দূর দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি দিতেন। সে কিন্তু একলাই বা একজন মাত্র সঙ্গী, তাও কোন লেখক নয়। বিভূতিভূষণের প্রিয় জায়গা ছিল ঘাটশিলা। তাঁরই আগ্রহে ওখানে গজেনবাবু-সুমথবাবু বাড়ি জমি কেনেন। সুবর্ণরেখার ধারে। প্রমথবাবুর প্রিয় জায়গা ছিল মধুপুর, দেওঘর; পরে ঘাটশিলা। ঘাটশিলায় নরেন্দ্র দেব ও বাণী রায়দেরও বাড়ি ছিল। শিমুলতলায়ও গজেনবাবু, সুমথবাবু, বিজনবাবু, জিতেনবাবু যেতেন। এই সব অঞ্চল পুজোর পর সাহিত্যিক অধ্যাপকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠত। যুদ্ধের ভয়ে কলকাতা থেকে লোক পালানো যেমন ছিল, পুজোর পর এই সব ভ্রমণের ফলে শহর প্রায় ফাঁকা দেখাতো।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের সময়ের যে মন্বন্তর ও চরম খাদ্যাভাব তার অনেক চিত্র ধরা আছে সেকালের সব গল্প উপন্যাসে—বিভূতিভূষণের *অশনি-সংকেত* ও তারাশঙ্করের *মন্বন্তর*, প্রবোধকুমার সান্যালের *অঙ্গার* ছোটগল্প, অচিন্ত্যকুমারের *কাঠ খড় কেরোসিন* গ্রন্থের গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

বিবেকানন্দ রোড কর্নওয়ালিস স্ট্রীট মোড় অঞ্চলে ডি. এম. লাইব্রেরি, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগুরু লাইব্রেরি প্রকাশক ও পাইকারী বিক্রেতারা ছিলেন। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত ডি. জে কীমারে ছিলেন, পরে বাটা কোম্পানিরও পাবলিসিটি অফিসার হয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই বিষয়ের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশন ব্যবসায়ে ঢাললেন। রঙীন প্রচ্ছদ, ভাল ছাপা এই সব নিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিগনেট প্রেস, এঁরা শিল্পী হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে পেয়েছিলেন। তখন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব হয় নি।

এই সময়ে কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক তাঁদের লাভের সঞ্চয় নিয়ে সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশনে এলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি এঁদের অন্যতম। এঁরা প্রতি মাসের (ইংরেজি ও বাংলা) ৭ তারিখে একটি করে নতুন বই বার করতেন।

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় দুটি আড্ডা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল—মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনে একটি আর একটি এম. সি. সরকার-এ।

এম. সি. সরকারে প্রবীণ ব্যক্তিরা বসতেন বলে সেটার নাম ছিল—হাউস অফ লর্ডস। আর মিত্র ও ঘোষে অপেক্ষাকৃত নবীনরা যেতেন, সেজন্য নাম দেওয়া হয় হাউস অব কমন্‌স। দুটি নামই প্রমথ বিশীর দেওয়া।

যুদ্ধ-পরবর্তী কতকগুলি বই পাঠকমহলে সাড়া ফেলে দেয়—এর মধ্যে আছে সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* উপন্যাস। এই বইটি প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কার পায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে-বিদেশে* আর যাযাবরের *দৃষ্টিপাত*। এই দুটি গ্রন্থ উপন্যাস নয়, কিন্তু বহু দিন এমন বিক্রি বইপাড়ায় কেউ দেখে নি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

যুদ্ধের পর পর আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহনওয়াজ ভোঁসলে, ধীলন প্রভৃতি বীর সেনানীদের বিচার নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ আন্দোলন ধর্মঘটে কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠল। নিরস্ত্র অহিংস প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর ইংরেজ সরকারের পুলিস গুলি চালালো। রামেশ্বর মারা গেলেন। আরও অনেক

ছাত্র আহত হল। ১৯৪৫ এর শেষ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলল এই আন্দোলন ও প্রতিবাদ। রসিদ আলী দিবসে ১৯৪৬-এর এপ্রিল মাসে হিন্দু-মুসলমান মিলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংরেজ পুলিসের হাতে পিস্তল বন্দুক এবং এদের হাতে লাঠি ও বোমা। আসলে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, এই প্রচার এমনভাবে চালানো হয়েছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বর্মা আরাকানের মধ্যে দিয়ে ভারতের দোরগোড়ায় এসে গিয়েছিলেন দেশকে ইংরেজের শাসনমুক্ত করার জন্য, সেসব ঘটনা ইংরেজ সরকারের কৌশলে সাধারণ মানুষের অগোচর ছিল। বন্দীমুক্তি আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে নেতাজীর বিরুদ্ধে প্রচারেও মানুষের রোষ ফেটে পড়েছিল। কিন্তু তারপর এই আপাত ঐক্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ১৯৪৬-এর দাঙ্গায়।

যুদ্ধ-পরবর্তী বইপাড়া বই বিক্রি করে গুছিয়ে বসতে না বসতে এই নিদারুণ অভিশাপ দেশে নেমে এল—হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাটোয়ারবাগান-বৈঠকখানা কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকাকে দপ্তরীপাড়া বলে। ভাবতে অবাক লাগে বাংলা সাহিত্যের সমস্ত ভরকেন্দ্র এইটুকু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকাশকদের মধ্যে বেশির ভাগই হিন্দু— সে পাঠ্যপুস্তক হোক বা সাহিত্যগ্রন্থ, আর দপ্তরীদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই ছিলেন মুসলমান। দপ্তরীরা আসতে ভয় পেতেন বইপাড়ায়, প্রকাশকরা দপ্তরীপাড়ায় যেতেন সশঙ্কচিত্তে। এরই মধ্যে রাজাবাজার থেকে একদল উন্মত্ত যুবক এল দপ্তরীপাড়ায় হিন্দুদের গুদাম পোড়াতে। মুসলমান দপ্তরীরা উল্টোদিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বই হিন্দুদের হোক, কিন্তু এই বই বেধেই তাঁদের জীবিকা চলে। বই পোড়াতে হলে তাঁদের মেরেই তবে ঐ যুবকরা দপ্তরীপাড়ায় ঢুকতে পারবে। শেষে উন্মত্ত যুবকের দল হতাশ-নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। যথার্থ বৃহৎ স্বার্থ চিন্তায় কী মহৎ কার্য হতে পারে, সেই কথা বলবার জন্যই এই ঘটনার উল্লেখ করলাম। কিন্তু দপ্তরীপাড়া রক্ষা পেলেও ভারত, বাংলার হিন্দু মুসলমান অনেকেই রক্ষা পেল না। দাঙ্গা দেশ-ভাগে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে সেখানে আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষ পাগল হয়ে উঠল।

আবার এই দাঙ্গার ফলেই আমাদের পুরোনো নিবাস পাকসার্কাস অঞ্চল ছেড়ে ঢাকুরিয়ায় আসা। আর এই দাঙ্গাই আমার মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনে যুক্ত হওয়ার অন্যতম যোগসূত্র।

এই দুটি অধ্যায় না লিখলে আমার প্রকাশন জগতে আসার কারণ জানানো হয় না। এজন্য হয়তো কিছু পুনরুক্তি ও পূর্ব প্রকাশিত প্রসঙ্গের পুনর্কথন হয়ে যেতে পারে।

বড় হয়ে অবধি দেখেছি আমরা তিন ভাই মামার বাড়িতেই মানুষ হচ্ছি। মা, বাবা, চার মামা, দিদিমা, দাদামশাই, আমরা তিনভাই, [আমি মেজো] এই নিয়ে আমাদের সংসার। আমি জন্মাই নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল- (তখন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল) এর উল্টোদিকের একটি দোতলা বাড়িতে। দাদামশাই, এক ইংরেজ অফিসের ড্রাফটসম্যান, দোতলাটি ভাড়া নিয়েছিলেন। দিদিমা ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সেজ মেয়ে। বড় মেয়ে প্রায়ই আসতেন, আমরা বড় দিদিমা বলতাম। মেজ দিদিমাকে দেখিনি, শুনেছি, ময়মনসিংহে বিয়ে হয়। ছোট দিদিমা শৌখিন মানুষ ছিলেন—তাঁর দুই মেয়ে অরুণা (পরে ইনি আসফ আলিকে বিবাহ করেন) ও পূর্ণিমা রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন। ছোট দিদিমারই এক দেবর নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছোট জামাই। ত্রৈলোক্যনাথের আর একটি নাম ছিল চিরঞ্জীব শর্মা। তাঁর নাম অনুসারেই বড় মামার নাম হয় চিরঞ্জীব। অন্যান্য মামাদের নাম যথাক্রমে প্রিয়ব্রত, দেবব্রত ও জীবানন্দ। মাসীমার নাম বিনতা, মায়ের নিবেদিতা।

মামারা চার ভাই ও দুই বোন। মা সর্বকনিষ্ঠ। মাসীমার বিবাহ হয় আমাদের তিন ভাইয়ের জন্মের আগেই প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর এক পুত্র স্বধানাথের সঙ্গে।

বড়মামা কর্মসূত্রে ময়ূরভঞ্জে কাজ করতেন, উনি তখন ময়ূরভঞ্জের 'রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি। ময়ূরভঞ্জের রাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের ছোট মেয়ে সুচারুর বিয়ে হয়েছিল। কেশব সেন মশাইয়ের নাতনী সাধনা সেন (পরে বসু) মা-মাসীমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সাধনার বাবা সরল সেন মশাইয়ের সঙ্গে দিদিমা দাদামশাইয়ের আলাপ-পরিচয় থাকার ফলেই বড়মামার ময়ূরভঞ্জে চাকরি পেতে সুবিধা হয়।

আমি মামাদের মুখে শুনেছি, এখানে থাকতেই সেজ ও ছোট মামা একদিন আগে পরে কলেরায় আক্রান্ত হন। তখন সংক্রামক রোগীর চিকিৎসা ক্যাম্পবেল হাসপাতালেই হোত। বাড়িতে মেজমামাই দাদামশাইয়ের একমাত্র সহায়। মেজ মামা দৌড়োদৌড়ি করে দুই মামাকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। সেখানে এক তরুণ ছাত্র শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপ হল। ছাত্রটি তখনকার দিনে এল. এম. এফ শিক্ষারত। সেই তরুণ শিক্ষার্থী চিকিৎসকের যত্নেই হোক, বা আয়ুর জোরেই হোক, দুই মামা সেরে উঠলেন। বাড়ি ফিরে এলেও দাদামশাই ও মামারা এই উঠতি চিকিৎসককে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। পরবর্তী পথ্য চিকিৎসা ইত্যাদি উপদেশের জন্য প্রায়ই তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতেন।

আমার এখন মনে হয়, বারবার ডেকে আনার আরও একটা কারণ ছিল। আমার মা দেখতে সুন্দর হলেও তাঁর একটি শারীরিক অনুপপত্তি ছিল, শরীরের কোনো কোনো অংশে শ্বেতি অর্থাৎ লিউকোডার্মা দেখা দিয়েছিল। মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারেও দিদিমা দাদামশাই এই তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

তরুণ চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ এটা কোনো রোগই নয় বলে উড়িয়ে দেন। এজন্য বিবাহ না হবার কোনো কারণ নেই এও বলেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ এই পরিবারের ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে মাকে পছন্দ করে ফেললেন, বাড়ির মতামত না নিয়েই বিবাহ করলেন। দাদামশাই ও দিদিমা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেয়ে হয়তো নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নিজের মতে বিবাহ করার ফলে পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হলেন। এর ফল হল এল. এম. এফ পাশ করার পর তাঁর আর এম. বি. পড়া হল

না। এদিক সেদিক প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পিতা সুরেন্দ্রনাথকে ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর-এ যোগ দিতে হয়।

যে বাড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করি, সে বাড়ির ক্ষীণ স্মৃতি এখনও মনে আছে। চক মিলানো বারান্দা দোতলায়। নিচের একটা ঘরে পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ গায়ক আব্বাসউদ্দীন ভাড়া থাকতেন। আমার জীবনের দুটি ঘটনা বেশ মনে পড়ে। মা আমাকে তেল মাখিয়ে ছেড়ে দিতেন। আমি স্নানের আগে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতাম। একবার একটা চলন্ত টেবিলফ্যানে হাত দিয়ে প্রচণ্ড শক খেয়েছিলাম। আর একবার বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে, একটা রেলিং ভাঙা ও ফাঁকা ছিল, সেখান দিয়ে গলে নিচে পড়বার উপক্রম হয়। কে যেন পেছন থেকে পা টেনে ধরলেন, হৈ-হৈ চেঁচামেচি, নিচে ক'জন চাদরের খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে বলছেন, দিদি ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, আমরা ধরে নেবো।

মা-ই পা চেপে ধরেছিলেন। পা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। শুনেছি, রাত্রে মায়ের প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। এর পর একবার খোলা ক্ষুরে কীভাবে হাঁটু কাটে, বাসি রাবড়ি বায়না করে খেয়ে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি হয়, এমন সব জ্বালাতনে আমি ছোটবেলা থেকেই মাকে হাড় জ্বালিয়েছি। দাদা, দাদামশাই অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় ছিলেন, ছোটভাই দিদিমার (আনন্দদায়িনী)।

১৯৩৯ সালে দাদামশাই পার্কসার্কাসে বাড়ি করলেন ৫ নম্বর লোয়ার রেঞ্জে। কারনানি ম্যানসনের পূব দিকে। এই বাড়ির দক্ষিণে ছিল নীতীশ লাহিড়ীর বাড়ি, পরবর্তীকালে রোটারিয়ান, এঁর দুই মেয়ে অন্নপূর্ণা গোস্বামী ও ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ীর কিছু সাহিত্যিক খ্যাতি হয়েছিল। উত্তরে ছিল শেখ আতিকুল্লার বাড়ি। ইনি বলতেন, ইনি নাকি ইশা খাঁর বংশধর।

আমরা পার্কসার্কাসে মডার্ন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। হেডমাস্টার মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী গম্ভীর রাশভারী অথচ স্নেহপ্রবণ শিক্ষক ছিলেন। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, বিরাট গোঁফ, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, দেখলেই সম্ভ্রম জাগতো। মনোরঞ্জনবাবু ক্রীশ্চান ছিলেন কিন্তু আমি খুব অল্প হিন্দুকেই এরকম আপাদমস্তক বাঙালি দেখেছি। অবশ্য এই স্কুলেই আর একজনকে পেয়েছিলাম, তিনি হলেন রামনারায়ণ বসু, ইনিও আপাদমস্তক বাঙালি, একই সঙ্গে অঙ্ক এবং বাংলার শিক্ষক। রামনারায়ণবাবু একদিন অঙ্কের

ক্লাসে এসে বললেন, আজ আর অঙ্ক করাবো না, একটা ভালো বই পেয়েছি, তাই থেকে তোদের একটা গল্প পড়ে শোনাই। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *রাণুর প্রথম ভাগ* সেই তখন তাঁর মুখে শোনা। গল্পের শেষে আমাদের মুখে হাসি, চোখে জল। আমার মধ্যে যদি সাহিত্যের কোনো নেশা জন্মে থাকে তার জন্য রামনারায়ণবাবুই প্রধান কারণ। পরে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর এঁদের রচনার দিকে আমাদের আকৃষ্ট করেন। বই পড়ার নেশা আমায় পেয়ে বসল। কিছু কিছু নিষিদ্ধ বইও আকৃষ্ট করল। সব থেকে বেশি গোয়েন্দা কাহিনী—দস্যু মোহন, কালো ভ্রমর প্রভৃতি। জয়ন্ত মানিকের গল্প। অ্যাডভেঞ্চার চাঁদের পাহাড়, হিমালয় ও মেরু অভিযানের গল্প। কালোভ্রমরের শেষ পর্ব রক্তলোভী নিশাচর স্কুলে লুকিয়ে পড়ছিলাম, ধরা পড়ে' বেঞ্চির ওপর দাঁড়ালাম।

এই সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে দেশের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল। ব্ল্যাক আউট, মাঠে ট্রেঞ্চ কাটা, রাস্তার ফুটপাথে বোমার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য ডিম্বাকৃতি শেলটার ঘর—কদিনের মধ্যেই কলকাতা শহর বদলে গেল আমাদের সামনে। এই সময়েই এল একের পর এক বিপর্যয় সংসারে। দাদামশাই ডায়বিটিস ও সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে লাগল। দিদিমারও সন্ন্যাস রোগে পক্ষাঘাত হল। তখন পক্ষাঘাতের ভালো চিকিৎসা বেরোয় নি। দিদিমা ঐ অবস্থাতেই বসে বসে কুটনো কোটা ইত্যাদি কাজ করতেন। কাজ করতে করতেই একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। সেই প্রথম বড় হয়ে দেখলাম দাদামশাই ও কিছুদিন পরে দিদিমার শ্রাদ্ধ—নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মমতে।

দেশের অবস্থা যুদ্ধের দরুন খারাপ হতে লাগল সব দিক দিয়ে। সেই সঙ্গে আমাদের বাড়িরও। বড়মামা রাগারাগি করে ময়ূরভঞ্জের চাকরি ছেড়ে চলে এলেন। ভেবেছিলেন ওরা আবার ডাকবে। কিন্তু ডাক এল না। মেজমামা কোনো একটা বেসরকারী কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেজমামা জেনারেল পোস্ট অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। ছোট মামার কাজ নেই। এই সময়ে অনেকগুলি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি খুলল যুদ্ধের জন্য। বড়মামা এইখানে একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন।

ছেলেদের নিয়ে পিতৃগৃহে পড়ে আছেন, এখন তো বাবা-মা কেউ নেই, সেজন্য একটা অপরাধবোধ হয়তো মায়ের মনে কাজ করছিল। বড়দা, মেজদা কেউ বিয়ে করুক, মা আপ্রাণভাবে চাইছিলেন। বড়মামা বিয়ে

করতে রাজী নন। মা ও মাসীমা (বালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে থেকে) সম্বন্ধ
করে অবশেষে মেজমামার বিয়ে দিলেন ঢাকুরিয়ায়। এই সময়ে মেসোমশা
মারা গেলেন। ওঁদের বালিগঞ্জের বাড়ি মাসিমার ননদ সংজ্ঞা দেবী (সুরে
ঠাকুর মশাইয়ের স্ত্রী) রাখতে দিলেন না। ও-বাড়িতে তাঁর তিন ভা
যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। তাই ওই বাড়ি ভেঙে সমস্ত জমি বিক্রি কে
দিলেন। যত দূর জানি মাসিমা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ভাগে পেয়েছিলেন
মেসোমশাই মারা যাবার পর গৃহহীন হয়ে মাসীমা দুই মেয়ে ও তিন ছেলে
নিয়ে ভাইদের কাছে চলে এলেন। আমরা আট ভাইবোন মিলে মামা
বাড়িতে মানুষ হতে লাগলাম।

এই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলা বিভাগটি ছোটদের মহলে
শোরগোল তোলে। আনন্দমেলার পরিকল্পক ও রূপকার মৌমাছি ছো
ছেলেমেয়েদের আনন্দমেলার সভ্য করার ব্যবস্থা করেন। প্রতি সোমবার
আনন্দমেলা বেরোতো। একটা কুপন থাকতো, সেটা কেটে নাম-ঠিকান
লিখে পাঠালেই একটা ব্যাজ ও আনন্দমেলার সদস্য নম্বর পাওয়া যেতো
মৌমাছি এই সদস্যদের নিয়ে দেশের সর্বত্র পাড়ায় পাড়ায় মণিমেল
আন্দোলন গড়ে তুললেন। আমাদের স্কুলে তখন বয়স্কাউট, কাব ও স্কাউট
ড্রিল হত। ইংলন্ডের রাজার নামে শপথ নিতে হত। মণিমেলা আন্দোলনই
প্রথম আমাদের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আনল। এই সময়ে ১৯৪২-
এর আগস্ট আন্দোলন স্কুলের ছাত্রদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। দাদার
ক্লাসের এক বন্ধু সত্যদার পায়ে গুলি লাগল। দাদাকে মামারা বকুনি দিয়ে
বাড়িতে আটকে রাখলেন।

এইসময়ে আমাদের বাড়িতেও নানা অশান্তি। মেজমামা মামীমাকে নিয়ে
চলে এলেন ঢাকুরিয়ায়। সংসারে সেজমামার বেতন ষাট টাকা, বড়মামার
একশ পঁচিশ টাকা, বাবার প্রতিমাসে পাঠানো চল্লিশ—এই মোট আয়।
চালের দর বেড়ে হল মন প্রতি চল্লিশ টাকা, চিনি উধাও, তার বদলে
পেলাম কাশীর চিনি বা ভেলিগুড়, চন্দোসী আটার প্যাকেট তিন টাকা,
আমরা ডাল ভাত এবং আটার রুটি ও ভেলি গুড়—এছাড়া আর কিছু
খেতে ভুলে গেলাম। চাল, চিনি, আটা, কয়লা সবই কন্ট্রোলের দোকানে
লাইন দিয়ে কিনতে হয়। মাথা পিছু এক সের পাওয়া যেত, লাইন থাকতেই
মুখের ওপর কন্ট্রোলের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেত। আগে ধামায় চাল

আটা আসত। বাজারে ঝাড়ন ব্যবহার হত। এখন রেশন উঠে রেশন ব্যাগ এল। বাড়ি বাড়ি মাথা গুনে রেশন কার্ড চালু হল।

এর মধ্যে মণিমেলার কাজকর্ম কিন্তু আটকায় নি। আমাদের স্কুলের হাসানদা—মহম্মদ হাসানজান ছিলেন আমাদের নেতা বা মধ্যমণি। তাঁরই উৎসাহে দাদামশায়ের নামে স্থাপিত হল আমাদের বাড়িতে অরুণোদয় মণিমেলা। প্রথম মণিমেলা মহাসম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালে, প্রথম সম্পাদক সম্পাদিকা যত দূর মনে পড়ে সত্যব্রত বসু ও মালবিকা গুপ্ত। প্রতি বছরই মণিমেলা মহাসম্মেলনে দেখতাম, জাতীয় নেতারা আসছেন নানা সভায়। তিনদিন চারদিন ধরে মণিমেলা মহাসম্মেলন হত। এই সময়ে যুদ্ধের পরিণতি শেষ দিকে আসতে লাগল। দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশার চরম রূপ কলকাতায় দেখলাম। দেশ-গ্রামের খবর তো আমরা জানি না, কলকাতার বাইরে তখনও কোথাও পা দিই নি।

বাবা হঠাৎই একদিন পুণা থেকে ফিরে এলেন অবসর নিয়ে। অ্যাক্সিডেন্টে একটা চোখ নষ্ট হয়েছে। সমরবিভাগের ডাক্তার ছিলেন বলে এখানে এ. আর. পি'র ডাক্তার হলেন।

কলকাতা ক্রমে ক্রমে উত্তাল হচ্ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর বীরত্বের কথা প্রকাশ পেল।

আগেই বলেছি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতা জুড়ে আন্দোলন শুরু হল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে রসিদ আলী দিবস পালিত হল, দেখা গেল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। এরপরই এই ঐক্যকে ব্যঙ্গ করেই যেন নিদারুণ দাঙ্গা নেমে এল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ এ। মৌলানা আক্রাম খাঁর বাড়ি আমাদের পাড়ায়, পার্ক সার্কাসে। এই পাড়াই মুসলিম লীগের অন্যতম কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠল—হাতে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—এই স্লোগান কানে ভেসে আসত যখন তখন।

এর আগে থেকেই আমাদের অর্থাৎ মামাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের পর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলি গুটিয়ে নিল সরকার। বাবা একটি মাড়োয়ারী বরফ কলে ডাক্তারের চাকরি নিলেন। তাঁদের ফ্যাক্টরি এবং বাড়ি—দুই জায়গাতেই ডাক্তারি করতে হত, একই মাইনে। বড়মামার চাকরি গেল। বাবার মাঝে মধ্যে আসা টাকা আর সেজমামার পোস্ট অফিসের মাইনে এইমাত্র সম্বল। ছোটমামার তখনও কোন চাকরি নেই।

আমাদের এই চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের এক ধনী আইনজীবী সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। আমাদের কার কী চাই জানতে চান। আমাদের খাদ্য বস্ত্র সমস্তরই নিদারুণ অভাব। তিনি মাকে বললেন, নিবেদিতা, তোমার কী চাই!

মা আমাদের তিন ভাইয়ের জন্য পড়ার বইয়ের অভাবের কথা বললেন। সেই আইনজীবী ভদ্রলোক বলেছিলেন, নিবেদিতা, এত ভালো জিনিস আমার কাছে কেউ কখনও চায় নি।

স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই আমার শরীরে মায়ের অসুখ শ্বেতি বা লিউকোডার্মা দেখা দেয়। এই নিয়ে মা ও বাবা খুব চিন্তায় পড়লেন। বাবা ডাক্তার (যদিও এল. এম. এফ.) হওয়ার সুবাদে অনেক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ ছিল। আমাকে নিয়ে ডাঃ গণপতি পাঁজার কাছে গিয়েছিলেন। ফল না পেয়ে রামপ্রাণ কবিরাজ মশাইকে দেখালেন। তিনি আয়ুর্বেদিক খবার ওষুধ, প্রলেপ এবং নিরামিষ আহারের বিধান দিলেন। তখন থেকেই আমার নিরামিষ আহারের প্রতি আসক্তি। আমি রাত্রে শোবার পর আধ ঘুমন্ত অবস্থায় মাঝে মধ্যে টের পেতাম—মা আমার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রলেপ দিচ্ছেন। আজও এই ছবিটি মনে পড়লে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কবিতার একটি বিখ্যাত লাইন মনে পড়ে—*শিয়রে কার আঁখি জাগে রে।*

আমার এই ব্যাধির জন্য বাবা চিন্তিত, মা ততোধিক লজ্জিত ছিলেন। যেন এজন্য মা-ই দায়ী।

আমায় শরীরের অসুখের জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মা বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের স্নেহও কম পাই নি। কথঞ্চিৎ ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য শিক্ষকরাও স্নেহ করতেন। ব্যাধির জন্য কারও কারও অনাদর ও অধিকাংশদের স্নেহ দুইয়ে মিলে আমাকে গড়ে তুলেছিল। হয়তো একটা প্রতিরোধ শক্তিও যোগাচ্ছিল—এই ব্যাধি আমাকে অনেক সময়ে অনেক দিকে সংযত ও স্থিতধী রাখতে বাধ্য করেছে। আমার শারীরিক এই অনুপপত্তি আমার জীবনে পরবর্তীকালে এমন সব বিচিত্র যোগাযোগ ঘটিয়েছে, যা আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এখন এই অসুখ নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামায় না, তখন সেকালে ব্যাপারটি আদৌ সহজ ছিল না।

এরই মধ্যে মণিমেলার খেলাধুলো চলছিল। মৌমাছির নির্দেশে আমাদের

মণিমেলা পার্কসার্কাসের আর একটি মণিমেলা—চিত্তরঞ্জন মণিমেলার সঙ্গে মিশে গেল। নাম হল চিত্তোদয় মণিমেলা। হাসানদাই মুখ্যনেতা, তারপর সুশীল দাশগুপ্ত, অরুণ গুহ, গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত, আমার দাদা, আর তাদের পর আমরা কনিষ্ঠরা। এখনও মনে পড়ে, ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী জন্মদিবসে হাসানদা মাদল বাজিয়ে বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুম ভাঙ্গিয়ে প্রভাত-ফেরিতে ডাকতে এসেছেন। কখনও বা দল বেঁধে মাঝেরহাট থেকে ফলতা-গামী ছোট ট্রেনে ব্রতচারি গ্রামে যাত্রা। সারাদিন ব্রতচারির ব্যায়াম খেলাধুলো, কাঠিনাচ, রায়বেঁশে আর চড়ুইভাতি। আমার মা মাসীমার এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল। হাসানদা তাঁদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা-মাসীমাও হাসান বলতে অজ্ঞান ছিলেন।

এই সময়ে রাজনীতিক টালমাটালের কথা আগে বলেছি। ঘটনার ক্লাইম্যাক্স হল ১৬ই আগস্টের দাঙ্গায়, ঐদিন শুক্রবার ছিল, মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা করায় স্কুল ছুটি ছিল আগে থেকেই, গোলমালের আশঙ্কায়। ১৬ই বিকেল থেকে মিছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আওয়াজ শোনা যেতে লাগল পথে পথে।

আমাদের পাড়ায় টম নামে একজন রেসের বুকিং এজেন্ট ছিলেন। আমরা টম কাকা বলতাম। ছোটমামার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ছোটমামার আর একজন বন্ধু ছিলেন আরসাদ, ডাক নাম জানু। আমরা বলতাম জানুমামা। মডার্ন হাই স্কুল এবং আমাদের পাড়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান অধিবাসীদের নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। আমরা ঈদের সময়ে মুসলমান বন্ধুদের বাড়ি যেতাম, বড়দিনে খ্রীষ্টানদের বাড়ি, পুজোর সময়ে তাঁরা আসতেন বিজয়ায়। এই রকম দাঙ্গা হবে কখনও কল্পনাতেও ভাবি নি। ১৬ই আগস্ট একরকম কাটল। ১৭ই, পরদিন, পাড়া উত্তাল হয়ে উঠল। টম কাকা সন্ধ্যেবেলা এসে বললেন, আমরা সব হিন্দুবাড়ি পাহারা দিতে পারছি না। বেপাড়া থেকে সব উন্মত্ত মুসলমান যুবকেরা আসছে হামলা করতে। সবাই নিজের নিজের বাড়ি বন্ধ করে এক জায়গায়—কারও বড় বাড়িতে থাকুন। আমরা অগত্যা তাই করলাম। রবিবার সকালে টম কাকা ও আরও কিছু বর্ষীয়ান মানুষ এসে বললেন, আমরা আর ভরসা পাচ্ছি না। অনবরত অন্য মহল্লার লোকজন এসে হুমকি দিচ্ছে। আপনাদের রেখে আসি পার্ক স্ট্রীট থানায়।

রবিবার সকালে সবাই তাঁদের পাহারায় দল বেঁধে চললাম থানায়। সেখানে অনেক হিন্দু জড়ো হয়েছেন। এত লোকের স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব।

একটি সাহায্যকারী সংস্থা আমাদের অনেককে নিয়ে গেলেন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। রোগীদের শয্যা খালি করানো হল, তাঁরা কোথায় গেলেন জানলাম না, সেই সব বিছানায় আমাদের আশ্রয় হল। সোমবার সকালে চিত্তরঞ্জনের পুত্রবধূ সুজাতা দাস এলেন, ব্রাহ্মসমাজের বলে আমাদের আগেই চিনতেন। চিনতে পেরে আমাদের সবাইকে একটি বড় কেবিন ঘরে বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেবাব্রতীর দল ভিজে চিঁড়ে মুড়কি দিলেন। তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল।

পরের দিন মামাদের এক জাড়তুতো বোন, আমরা টুনুমাসী বলতাম, এসে জোর করে নিয়ে তুললেন ভবানীপুরে তাঁদের বাড়িতে। দুদিন পরে মেজমামা আমাদের খবর পেলেন। মেজমামা, তাঁর মাসতুতো দুই সম্বন্ধী, সেন্টুমামা মন্টুমামা ও আরও কেউ কেউ ছিলেন সঙ্গে, আমাদের নিয়ে এলেন ঢাকুরিয়ায়। মেজমামা তখন মাসীশাশুড়ীর বাড়ি ভাড়া থাকতেন। আমরা সবাই সেই সুবাদে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। বোনঝি-জামাইয়ের বাপের বাড়ির এতগুলি প্রাণীকে আশ্রয় দেওয়া বড় মাপের মন না হলে সম্ভব হয় না। মেজ মামীমার মাসী সেই বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

তখন থেকেই আমরা ঢাকুরিয়ার পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনায় আড্ডার মুহূর্তে : গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মৌমাছি বিমল ঘোষ

১৯৪৬ সালে পার্ক সার্কাস দাঙ্গায় আতঙ্কে দুরধিগম্য হয়ে উঠেছিল। স্কুলে যাওয়া তো অসম্ভব। লেক মার্কেটের কাছে অভয়াচরণ বিদ্যামন্দিরে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হল, পার্ক সার্কাসের মডার্ন হাইস্কুল ও এই স্কুলটির যৌথ ব্যবস্থায়। আমরা সবাই পরবর্তী ক্লাসে উঠলাম। দাদা এইখান থেকেই টেস্ট ও পরে দক্ষিণ কলকাতার একটি কেন্দ্র থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন।

ক্লাস নাইনএ উঠে কোথায় পড়ব নিজেকেই ঠিক করতে হল। সংসারে তখন ছন্নছাড়া অবস্থা। মেজমামার শ্বশুরবাড়ি থেকে উঠে মামারা একটি বাড়ি ভাড়া করলেন কাছেই, সেলিমপুরে। বলা বাহুল্য, আমরাও সেখানে। পাড়ার এ-স্কুল সে-স্কুল দেখতে দেখতে শেষে কসবা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাসচন্দ্র ঘোষ কঠোরে ও কোমলে মেশানো মানুষ। উনি কথাবার্তার পর আমাকে, ছোট ভাই ও আমাদের মাসতুতো দুই ভাইকেই ভর্তি করে নিলেন। এই স্কুলটি গড়ে তুলেছিলেন রাধাশ্যাম সিংহ নামে এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি; পরে শুনেছি, জনপ্রতি এক পয়সা মাত্র সাহায্য নিয়ে।

স্কুলে ভর্তি হলাম। কিন্তু স্থান হল পিছনের বেঞ্চে। ব্যাকবেঞ্চার-এর অভিজ্ঞতা পার্কসার্কাসে হয় নি। এখানে হল নির্মম ভাবেই। নারী-দেহ সম্পর্কে আলোচনা, নর-নারীর দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে অশ্লীল কথা পার্কসার্কাসে শুনি নি। এখানে প্রথম শুনেই আঘাত লাগল, কারণ

এতাবৎকাল নারী বা নারীদেহ ভাবলেই মায়ের মূর্তি চোখে ভেসে উঠত। একই সঙ্গে নারীদেহ সম্বন্ধে পবিত্রতা-বোধ এবং যৌন-আলোচনার ফলে এক অমোঘ নিষিদ্ধ আকর্ষণ—এই দুই সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে হয়তো ভেসেই যেতাম। কিন্তু এক ঘটনায় অদ্ভুত ভাবে উদ্ধার পেলাম। বাংলার শিক্ষক চিত্তবাবু একদিন প্রশ্ন করতে করতে প্রথম থেকে পিছনের বেঞ্চের সব ছাত্রদের ধরলেন। দুটি প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে নি। প্রথমটি হল *বিধি* শব্দের বিশেষণ কি হবে? শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে চিত্তবাবু সঠিক উত্তর পেলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, রক্ত শব্দের দুই রকম প্রয়োগ—বিশেষ্য ও বিশেষণ। পার্কসার্কাসে প্রচুর গোয়েন্দা গল্প পড়ার ফলে *রক্ত* ও *রক্তবর্ণ* শব্দ দুটোই আমার অধিগত ছিল। এবারও চিত্তবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা আমি। চিত্তবাবু বললেন, তোর তো ভাল বাংলা জ্ঞান আছে। তা তুই ওখানে কেন? সামনে এসে বোস্। সামনের বেঞ্চির অন্য ছাত্রদের বললেন, এই ওকে তোদের মধ্যে বসা।

এই ঘটনার পর থেকে সব মাষ্টার মশাইয়েরই চোখে পড়ে গেলাম। সেদিন থেকে পরীক্ষার ফলাফলে আমরা পাঁচজন সর্বপ্রথম থাকতাম। সুবীর, শম্ভু, সৌরেন, শান্তি ও আমি। আমাদের ইংরাজি আদ্যক্ষর সকলের 'এস' দিয়ে। আমাদের 'ফাইভ এস'-এর দল নামটি চালু হয়ে গেল।

বাড়ি এসে মাকে-বাবাকে সব ঘটনা বললাম। মা বললেন, টিউটর রাখলে ভালো হয়। কিন্তু যেখানে মামাদের আশ্রয় প্রধান ভরসা, বাবার সামান্য আয়, তাও অ্যাক্সিডেন্টের ফলে দুই চোখেরই দৃষ্টি যেতে বসেছে, টিউটরের মাইনে কোথা থেকে আসবে!

পাড়ার প্রায় সকলের কাকাবাবু লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র কাছেই থাকেন শুনেছি, মেজমামার শ্বশুরবাড়ির গায়ে। তাঁর স্ত্রী প্রতিমা মিত্র সকলের কাকীমা। তিনি সেকালের বেথুন কলেজের গ্রাজুয়েট। বাড়িতে অনেককে পড়ান।

মা গিয়ে পড়লেন কাকীমার কাছে। বললেন, প্রতিমা, তুমি কত ছেলেমেয়েদের তো পড়াও। আমার মেজ ছেলেটাকে যদি দেখিয়ে দাও।

কাকীমাদের বাড়ির বারান্দায় ঢালাও শতরঞ্চি পেতে পড়াশুনো করে ছ-সাতজন ছেলেমেয়ে। বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের পড়ুয়া। বলাবাহুল্য সব ব্যবস্থাটাই অবৈতনিক। এখন আমিও সেই সব পড়ুয়ার দলে ভর্তি হলাম। আমার কাজ হল প্রথম এসে শতরঞ্চি পাতা, ও সবশেষে শতরঞ্চি

গুটোনো, আমার পড়ার সময়ই ছিল সব চেয়ে বেশি। নতুন ভাড়া বাড়িতে যে ঘরে থাকতাম, সেখানে পড়ার জায়গা ছিল না।

প্রতিমা দেবী যেমন পাড়ার সকলের কাকীমা, গজেন্দ্রকুমার মিত্র তেমনি পাড়ার কাকাবাবু। সেই প্রথম আমার কোন লেখককে সামনাসামনি দেখা। কাকাবাবুকে প্রথম দর্শনে রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ মনে হল। তারপর ক্রমে আলাপ হতে দেখলাম একেবারেই অমায়িক, অত্যন্ত মিশুকে, স্নেহপ্রবণ এবং ছোটদের সঙ্গেও সমান মনোযোগ দিয়ে আলাপ করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা চালিয়ে যান। আমাদের একটুও বিরক্তি বা একঘেয়েমি বোধ হয় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় একজন ভদ্রলোক এলেন। কাকাবাবুর শরীর ভারী হলেও বেশ লম্বা। ইনি কাকাবাবুর তুলনায় অনেকটাই হ্রস্বদৈর্ঘ্য। আমাকে দেখে বললেন, প্রতিমা, তোমার ছাত্রসংখ্যা যে বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাকীমা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভানু প্রণাম করো, ইনি লেখক সুমথনাথ ঘোষ, তোমার সুমথকাকা।

কাকীমার কাছেই পরে শুনি, এই দুই লেখক বন্ধু মিলেই গড়ে তুলেছেন মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রতিষ্ঠানটি।

রবিবার দিন আর একজন কমবয়সী সাহিত্যিককে দেখলাম— গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। আমার সহপাঠীরা মণীশ, রমু তো এঁদের আগেই চিনতো। ওরা গৌরীদা বলতো, আমিও তাই দেখে গৌরীদা বলতে শুরু করলাম। আরও একজন মাঝে মধ্যে আসতেন, ভূপেনদা—ভূপেন্দ্রনাথ বসু। সুমথনাথ ঘোষ এঁর ভগ্নিপতি, পরে জানতে পারি।

মন্তুদা (প্রফুল্লকুমার বসু) তখন মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনে কাকাবাবু সুমথকাকার পরেই প্রধান কর্মকর্তা। কাকাবাবুর বাড়িতেই থাকেন। সকালে বেরিয়ে যান। রাত্রে আসেন।

একদিন সকালে সাহিত্যের আড্ডায় প্রবোধবাবু এলেন—প্রবোধকুমার সান্যাল। এঁরা সবাই ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা। প্রবোধবাবু বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, উন্নত কপাল। দেখলেই সমীহ ভাব জাগে। আড্ডার সর্বোচ্চ উদাত্ত কণ্ঠ বারান্দায় ভেসে আসে। কাকীমা ওঁদের জন্য চা, কিছু ভাজা-ভুজি নিয়ে আসেন; ফেরার সময়ে আমাকে দুটো দিয়ে যান—ভানু, এটা খেয়ে নাও।

১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। সেদিন স্কুল বন্ধ, কাকীমার পাঠশালাতেও দুদিন ছুটি। কাকীমা সমস্ত জানলা দরজা খইয়ের মালা দিয়ে সাজালেন। আমরা যে যতটা পারলাম সাহায্য করলাম।

পুজোর কয়েকদিন আগের এক রবিবারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। ওঁকে এঁরা সবাই বড়দা বলতেন। কাকীমা বললেন, বড়দা, আজ আর কোথাও যেতে পারবেন না। আজ থাকবেন, এখানে দুপুরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করবেন। কাল আপনার বন্ধুর সঙ্গে কলকাতা যাবেন।

বিভূতিবাবু বললেন, ইন ফ্যাক্ট বউমা, আমিও তাই ভেবে এসেছি। মেস-এ এসে দেখি, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। তাই চলে এলাম এখানে।

বিভূতিভূষণ হাত মুখ ধুয়ে বসলেন ডেকচেয়ারে বারান্দাতেই, যেখানে বসে আমি পড়ছি। কাকীমা চা-খাবার নিয়ে এসে বললেন, বড়দা, এটি আমার নতুন ছাত্র। আপনারই 'অপুর পাঠশালা' থেকে ওকে প্রশ্ন দিয়েছি উত্তর লেখার জন্য।

আমাকে বললেন, ভানু লেখা হয়েছে? তাহলে বড়দাকেই দেখাও।

তখন আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন সিলেক্‌শনে পথের পাঁচালীর একটি অংশ পাঠ্য ছিল। নাম ছিল—অপুর পাঠশালা। আমি ভয়ে ভয়ে খাতাটি নিয়ে বিভূতিভূষণের কাছে দাঁড়ালাম। বিভূতিভূষণ মন দিয়ে খাতা দেখছেন। আমি উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কাকীমাও উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করছেন, বিভূতিবাবু কি বলেন।

বিভূতিভূষণ খাতা পড়ে ফেরত দিলেন, বাঃ, দারুণ লিখেছিস তো, আমিও এত ভালো উত্তর লিখতে পারতাম না।

কাকীমা বললেন, বড়দা, আমার এই ছাত্রটি পরের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, মনে হয় ভালো করবে।

বিভূতিবাবু বললেন, হ্যাঁরে, পড়ার বই ছাড়া আর কী কী বই পড়েছিস?

কাকীমা বললেন, ও গল্পের বই খুব পড়ে।

বিভূতিবাবু বললেন, দীনবন্ধু মিত্রের বই কি পড়েছিস?

আমি বললাম—নীলদর্পণ।

বিভূতিবাবু বললেন—সধবার একাদশী পড়িস নি?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—ওটা তো বড়দের শুনেছি।

বিভূতিভূষণ উড়িয়ে দিলেন আমার কথা—দূর, বইয়ের আবার ছোটদের

বড়দের কি। তাহলে নীলদর্পণ-ও তো মনে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়েছিস! বই সব পড়বি, সর্বদা মূল বই পড়ার চেষ্টা করবি।

কাকীমার কাছে পড়তে এসে বিভূতিভূষণের এই সান্নিধ্যলাভ আমার জীবনে তখন এক দারুণ ব্যাপার। স্কুলের বন্ধুদের কাছে বলার মতো ঘটনা। ১৯৪৮ সালের ভাদ্র মাসে বিভূতিভূষণের জন্মদিন হল কাকাবাবুদের বাড়িতে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা পড়ার ছুটি। কাকীমা বললেন, বিকেল থেকে এসো, অনেক লেখক আসবেন দেখবে।

আমি তখন খুব লাজুক। বিকেলে গিয়ে দেখি ঘর ভর্তি সাহিত্যিক। সজনীকান্ত দাস, প্রবোধকুমার সান্যাল, বাণী রায়, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—আরও কতজন, তাছাড়া কাকাবাবু, সুমথকাকা, গৌরীদা তো আছেনই। কাকীমাই চেনালেন সবাইকে দূর থেকে। আমি বারান্দা থেকে চুপিসাড়ে নেমে আসব, কাকীমা সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন, ভানু পালাবে না, খেয়ে যেয়ো।

এত সব মানুষের সামনে খাবার কথা বলাতে আমি লজ্জায় ঘেমে উঠলাম। কাকীমার হাত থেকে প্লেট নিয়ে, সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনোমতে গোগ্রাসে খাবার শেষ করে পালিয়ে এলাম।

পরদিন আসতে কাকীমা বললেন, ও কি ভানু, ও ভাবে পালিয়ে গেলে কেন! আরও সব কত লেখক এলেন দেখবে তো। কত আবৃত্তি হল, সজনীবাবু প্রবোধদা বাণীদি সঞ্চয়িতা থেকে পড়লেন, বড়দাও বললেন। শেষকালে সাগরময়বাবু গান গাইলেন।

আমি লাজুক হাসি নিয়ে পড়তে বসে গেলাম।

জন্মদিনের পরদিনও বিভূতিবাবু আছেন। সন্ধ্যায় বিভূতিবাবু, কাকাবাবু, গৌরীদা, সুমথকাকা গল্প করছেন।

আমি পড়ছি, একটা কান অবশ্য আড্ডার গল্পের দিকে। বিভূতিবাবু মনোহরপুরের জঙ্গলের বিবরণ দিচ্ছেন—বুঝলে বৌমা, সে কত রকম পাখি, কত রকম প্রজাপতি আর কত যে গাছপালা। সকালে মনে হবে স্বর্গরাজ্য।

কাকীমা বললেন, বড়দা, আপনারা যে সব বেড়াবার প্ল্যান করছেন আমায় নেবেন তো?

বিভূতিবাবু বললেন, নেবো না মানে? তুমি অবশ্যই যাবে। গজেনবাবু, বৌমাও যাবেন আমাদের সঙ্গে।

কাকীমা উৎসাহে বললেন, বসুন বড়দা, ঠাকুরপোরা, আমি চা নিয়ে আসি।

কাকীমা উঠে যেতেই কাকাবাবু বললেন, আপনি বেশ করলেন বড়দা, মহিলাদের নিয়ে বেড়ানোর কত বিপত্তি বলুন তো। আমরা যেখানেই থাকি, এক মিনিটেই তৈরি হবো। উনি কি পারবেন? তাও যদি একাধিক মহিলা যেতেন, ওঁরা ওঁদের মতো থাকতে পারতেন।

সুমথকাকাও কাকাবাবুকে সমর্থন করলেন। গৌরীদাও।

কাকীমা চা নিয়ে এলেন। বিভূতিবাবু বললেন, তা বৌমা ঐ যে মনোহরপুরের কথা বলছিলাম এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর কোথাও নেই। কোথায় লাগে ঘাটশিলা!

কাকীমা সোৎসাহে বললেন, তাহলে আমরা কবে যাচ্ছি বড়দা?

বিভূতিবাবু বললেন, সেই কথাই হচ্ছিল বৌমা। তা অসুবিধা একটা হচ্ছে যে ভালো বাথরুম নেই। মানে ঐ আর কি। জঙ্গলের মধ্যে তো। হয়তো স্নানের সময়ে তুমি দেখলে পাঁচিলের ওপর একটা গিরগিটি বা তক্ষক। ঐ রকম কিছু একটা। সাপ-খোপ বিষাক্ত কিছু একটা দেখিনি। একবার একটা হেলে আর একটা দাঁড়াশ দেখেছিলাম স্নানঘরে।

কাকীমা একটু হতাশ হয়েই বললেন, না বড়দা, তাহলে আমি যেতে পারব না।

বিভূতিভূষণ বলেই চলেন, ওটুকু কিছু নয় বৌমা, মনোহরপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে।

বলে আবারও কিছু কল্পিত বিপদের বর্ণনা করেন। কাকীমা মনোহরপুর যাওয়া নিজে থেকেই একেবারে নাকচ করে দিলেন।

সেই বছরই চলন্তিকা পত্রিকার পুজো সংখ্যায় বিভূতিভূষণের একটি গল্প বেরোল, অবিকল এইসব ঘটনা নিয়ে, ভালো মনোহরপুর ও খারাপ মনোহরপুর।

কাকীমা পড়ে বিভূতিবাবুকে বলেছিলেন—বড়দা, আপনারা সবাই মিলে এইভাবে আমায় ঠকালেন!

বিভূতিভূষণ হেসে বললেন,—ইন ফ্যাক্ট বৌমা, ওরা সব বলল কিনা মহিলা নিয়ে বেড়ানোর অসুবিধে তাই ...

আমার টেস্ট পরীক্ষার ফল ভালো হল। কাকীমা আমার পড়ার ওপর আরও জোর দিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও শেষ হল। আমাকে একদিন কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর কি করবে ভানু?

বাড়ির আর্থিক দুরবস্থার কথা কাকীমা সবই জানতেন। বললাম—একটা চাকরি খুঁজছি, সকালে কাজ করব, রাত্রে পড়ব।

কাকীমা কাকাবাবুকে বলে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সে আমার কাজ ঠিক করে দিলেন। বললেন—সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাসী আর সিটি এই তিনটে ছাড়া তো আর কোন কলেজে রাত্রে পড়ার ব্যবস্থা নেই। কলেজ স্ট্রীট থেকে এই তিনটে কলেজ খুবই কাছে । তোমার সুবিধেই হবে।

১৯৪৯ এর মে মাসে 'মিত্র ও ঘোষ'-এ প্রবেশাধিকার পেলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরোতে তখনও মাসখানেক দেরি।

৬

মে মাসের গোড়ার দিকে একদিন কাকীমা বললেন, ভানু, কাল ভালো দিন আছে। কাল থেকেই তুমি মিত্র-ঘোষে যাও।

কাকাবাবু [গজেন্দ্রকুমার মিত্র] ও সুমথকাকা দুজনেই জলপাইগুড়ি গেছেন, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে, কোনো সভায়। আমি বললাম, কাকাবাবুরা নেই, এখনই কাজে যোগ দেব!

কাকীমা বললেন, তাতে কী হয়েছে। কথা তো হয়েই গেছে। মে মাসের মাইনেটা পুরো পাবে। আমি মন্তুকে বলেও রেখেছি তুমি যাবে কাল থেকে। চিনতে পারবে তো? ১০ নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোড-এর মোড়ে।

হ্যারিসন রোড তখনও মহাত্মা গান্ধী রোড হয়নি। বাড়ি গিয়ে মাকে বলে সেদিনই একটা কম দামী ধুতি কিনলাম। তখনও তো হাফ প্যান্ট পরি, কিন্তু হাফ প্যান্ট পরে আর যাই হোক অফিস করা যায় না। 'বয়-বয়' ভাব দেখায়।

ধুতি-শার্ট পরে মা-বাবা মামাদের প্রণাম করে বেরোব, সেজো মামা বললেন, ভানুর এই বয়সে কি চাকরি না করলে চলতো না। আমরাও তো পড়াতে পারতাম সবাই মিলে।

মা বললেন, করুক না একটু কাজ, এমন তো শক্ত কিছু না, প্রতিমার কাছে শুনলাম। রাত্রে কলেজে পড়বে, তখন তো সাহায্য লাগবেই, বই-পত্র কিনতে।

তখন সেজো মামার বিয়ে হয়েছে। বড় ও ছোট মামার বিয়ে হয়নি। বড় মামা কোল বোর্ডে একটা চাকরি পেয়েছেন। ছোট মামা একটা সওদাগরী ফার্মে। দাদাও একটা ছোটখাটো চাকরি করেন। একান্নবর্তী সংসার মোটামুটি চলছে। তবে মা চাইছিলেন—আমরা যা হোক কিছু সংসারে আনি। কারণ বাবার তখন দুই চোখই যেতে বসেছে।

বেরোবার আগে আপত্তি সত্ত্বেও মা একটা কৌটোতে রুটি ও তরকারি দিলেন। বললেন, কখন কি খাবে, একটু খাবার সঙ্গে থাক।

টিফিন বাক্স পকেটে পুরে, ধুতি সামলে ঢাকুরিয়া থেকে এক আনার টিকিট কেটে শেয়ালদায় নামলাম। সেখান থেকে হ্যারিসন রোড ধরে, বিশাল কলমের দোকান ধর ব্রাদার্স, দিলখুসা কেবিনের পাশ দিয়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।

মিত্র ও ঘোষ-এ ঢুকতেই মন্তুদা বললেন, ভানু এসে গেছ। এই টুলটা তোমার।

একটা জাবদা খাতা দিলেন, দেখিয়ে বললেন—দ্যাখো, এটাতে প্রতিদিনের জমা ও খরচের হিসেব আছে। তুমি জমা ও খরচ আলাদা ভাবে মাসেরটা যোগ করে যাও। অর্থাৎ প্রতিমাসে মোট কত জমা ও মোট কত খরচ। যোগ করে জের টেনে নিয়ে যাবে পরের দিনে।

আমি খাতা ও একটা পেন্সিল নিয়ে কাজে বসে গেলাম।

দোকান-ঘরে উঠেছিলাম, বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে একটা রক, তার উপরের দরজা দিয়ে। দুটো ছোট সাইনবোর্ড দরজার দুই পাল্লায়—কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ও ফাইন আর্ট প্রিন্টারি—ছাপাখানা। বাঁদিকে ওপরে একটা ছোট সাইন বোর্ড—অবতার পত্রিকার।

আমি যেখান দিয়ে রক-এ উঠলাম, তার উল্টোদিকের রক-এর উপর কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের স্টল। সুধীরবাবু নামে এক তরুণ, বয়সে আমার থেকে কিছু বড়, স্টলটি চালাতেন। ছাপাখানা বাড়ির ভেতর দিকে। পুরো বাড়িটাই শুনেছিলাম অজিত সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোকের। তিনি ও তাঁর ভাই অসিতবাবুদের সংসার দোতলায়। অজিতবাবুর বেঙ্গল ইউনিয়ন নামে তৈরি পোশাকের দোকান আছে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে। অসিতবাবুর টেলারিং শপ—এই বাড়িতেই সদর দরজার উত্তরে পাশের ঘরে—এটি এখনও আছে। যদিও দুই ভাই অনেকদিন বিগত।

টুলে বসার পর মন্তুদা বললেন, ক্যাশমেমো কাটতে কাটতেই, ভানু,

কাজ করতে করতেই সব দিক দেখবে, কে কী বই চাইছেন, কোথায় কী বই আছে, ক্যাশমেমো কীভাবে কাটা হচ্ছে। মাঝে মাঝে তোমাকেও ক্যাশমেমো কাটতে হতে পারে।

দোকানের সামনে দুটি খিলানের নিচে দুটো দরজা। দুটো দরজার সামনে একটি বড় টেবিল ও একটি ছোট টেবিল পাশাপাশি পেতে কাউন্টার। দুই দরজার মাঝখানে তিনফুটের দেওয়াল, তার গায়ে ছোট র‍্যাক। সেখানেই নতুন ক্যাশমেমো, অন্যান্য আরো কিছু খাতাপত্র। র‍্যাকের মাথায় গণেশ ও মা কালীর মূর্তি। আমি আসার পর এক পূজারী এসে মালা পরাল, ক্যাশে গঙ্গাজল ফুল দিল, তারপর সবাইকে চন্দন পরাতে শুরু করল। মন্তুদা বললেন, দাও, এই নতুনবাবুকেও চন্দনের ফোঁটা দাও।

দোকানে তখন আমরা তিনজন মাত্র। মন্তুদা, মন্তুদার সহকারী কৃষ্ণকালী ও নবাগত আমি। মন্তুদা কাজের মধ্যেই মাঝে মধ্যে উপদেশ দিচ্ছেন। বইয়ে কতরকম ডিসকাউন্ট বা কমিশন দিতে হয়। এককপিতে শতকরা পনেরো, পাঁচকপিতে সাড়ে সতেরো, দশ কপি হলে শতকরা কুড়ি টাকা হারে ডিসকাউন্ট। স্কুল-পাঠ্য বই হলে যাই নিক, শতকরা পনেরো টাকার বেশি কমিশন হবে না। এর উনিশ-বিশ যেন না হয় কখনো।

মন্তুদা বলে যাচ্ছেন, সেই সঙ্গে খরিদ্দারদের ক্যাশমেমো কাটছেন। কৃষ্ণকালীকে বলছেন, কেষ্ট এই বই দাও, সেই বই দাও।

কৃষ্ণকালী তৎক্ষণাৎ এখান থেকে সেখান থেকে বই বার করে যাচ্ছে। যন্ত্রের মতো। আমি ভাবলাম, মনে রাখে কী করে এত বই কোথায় কোনটা আছে। আমি কি পারব এত মনে রাখতে!

একটু পরে গৌরীদা এলেন—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ফর্সা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মুখে গুন্ডি পান। আমাকে দেখেই বললেন—ও, ভানু আজ থেকেই বসে গেছে, গজেনদা বলছিলেন বটে বাইরে যাবার আগে। মন্তু, ভানুকে মিত্রালয় আর মিত্র-ঘোষের ক্যাশমেমো আলাদা বুঝিয়ে দিয়েছো তো?

মন্তুদা বললেন, আজই তো এল, শোন ভানু, তোমার বাঁদিকের যে র‍্যাক, ও তিনটেতে সব মিত্রালয়ের বই, আর এদিকে সব মিত্র-ঘোষের।

একটা বই খুলে দেখালেন, কোথায় প্রকাশকের নাম লেখা থাকে। বললেন, দেখে নিয়ে ক্যাশমেমো করবে। আর এই দ্যাখো, দুরকম ক্যাশমেমো বই—বড়টা মিত্র-ঘোষের, ছোটটা মিত্রালয়ের, দেখো, ভুল না হয়।

একই কাউন্টারে দুটি বিভিন্ন প্রকাশকের ক্যাশমেমো কাটা হচ্ছে। অথচ ক্যাশ জমা হচ্ছে এক জায়গায়। কি ভাবে হিসেব থাকে? মন্তুদা বললেন, ও তুমি থাকতে থাকতে বুঝে যাবে। রাত্রে বিক্রি বন্ধের পর, মিত্রালয়ের যা বিক্রি, যোগ করে সেটা অন্য এক কৌটোয় সরিয়ে রাখা হয়।

একটু পরে এক কৃশকায় কিন্তু সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এলেন, ধুতি সাদা পাঞ্জাবি, গায়ে সাদা চাদর। ঢুকেই বললেন, ও এই ভানু।

মন্তুদা বললেন, ভানু, প্রণাম কর, ইনি মাস্টার মশাই।

পরে জেনেছিলাম, কৃষ্ণদয়ালবাবুকে সবাই মাস্টার মশাই বলেন। মিত্র ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষক, কবি। মনে পড়ল ওঁর কবিতা আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ছিল— *পথের পাথর*। 'পথের মোড়ে ছিল পড়ে প্রকাণ্ড এক পাথর/কত কালের কেউ না তাহা জানে/হোঁচট খেয়ে পড়ত সবাই সরিয়ে দিতে কাতর/এমন কাণ্ড দেখেছে কোনোখানে?' পরে আরও জেনেছি, বিখ্যাত অস্থি-শল্য-বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডাক্তার বিশ্বজিৎ সেন, ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক হোসেনুর রহমান—এঁরা সবাই এঁর ছাত্র ছিলেন।

মাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষা কীরকম হল ভানু?

আমি বললাম, এই মোটামুটি।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই, পাশের টেবিলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। হাতের ছাতা দরজায় এক পাল্লায় রাখলেন। একটা ব্যাগ টেবিলে রেখে ওদিকের কাউন্টারের টেবিলেই বাবু হয়ে বসলেন। বসে মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণদয়াল কতক্ষণ রে?

মাস্টার মশাই বললেন, এই একটু আগে। আজ স্কুলে তাড়াতাড়ি ছুটি পেলাম।

আমি খাতা একটু সরিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছি। মন্তুদা একটা ছোট চিরকুটে লিখে জানালেন, ইনি কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রণাম কর।

আমি উঠে প্রণাম করতেই কালিদাসবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। মাষ্টার মশাই বললেন—ও ভানু, গজেনবাবুর স্ত্রীর ছাত্র। এর কথাই গজেনবাবু বলতেন।

কালিদাসবাবু বললেন, তুই তো এবার ম্যাট্রিক দিয়েছিস না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তারপর বললেন, তা তোর ভালো নাম কী রে?

বললাম—সবিতেন্দ্র।

দুবার নিজেই আওড়ালেন—সবিতেন্দ্র, সবিতেন্দ্র, কী করে হল?

আমি ফট্ করে বলে বসলাম—কেন, সবিতা ও ইন্দ্র যোগ করে।

কালিদাসবাবু বললেন—স্টুপিড, শব্দটা কি সবিতা না সবিতৃ? পিতার আদেশ, পিতাদেশ হয় না পিত্রাদেশ? র-টা যাবে কোথায়? সেই ভাবেই তো তোর নাম হওয়া উচিত ছিল। যাকগে, এখন তো সবই চলছে, সার্বজনীন, আকর্ষণীয় কোনটাই বাদ যায় না।

সকলের সামনে স্টুপিড বলাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তবে পরে দেখলাম উনি তা-বড় তা-বড় কবি-সাহিত্যিককেও স্টুপিড বলতে ছাড়েন না। আসলে এমনই শ্রদ্ধার আসনে তিনি আসীন ছিলেন, এটাকে সস্নেহ তিরস্কার বলেই সবাই মেনে নিতেন। মাস তিনেক পরের একটা ঘটনা। একদিন কবি জসীমউদ্‌দীন যেতে যেতে হঠাৎই কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মন্তুদাই বললেন—কবি জসীমউদ্‌দীন। ওঁকে দেখেই পাঠ্য বইয়ের কবিতা মনে পড়ল। 'এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে।' কবি জসীমউদ্‌দীন এসে কালিদাসবাবুকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, ও কালীদা, আইবিড সাহেবের বই কোথায় পাই বলেন তো? ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি কোথাও পাই না।

কালিদাসবাবু যথারীতি ধমক দেন, ওরে স্টুপিড, আইবিড কোন সাহেব নয়, ওটা আইবিডেম শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ওর মানে হচ্ছে, তথায় অর্থাৎ আগে উল্লিখিত বই বা পরিচ্ছেদটা দ্যাখো। তোরা পড়বি না জানবি না, আইবিড সাহেবের বই খুঁজে মরছিস।

জসিমউদ্‌দীন হেসে বললেন—দ্যাখেন দিকি, আমি খুঁজে খুঁজে হদ্দ, ঐ জন্যই আমায় বাঙাল কয়।

ফিরে আসি প্রথম দিনে। গৌরীদা কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন, কালীদা কখন এলেন? এই গরমে লংকোট কেন, সুতির হলেও গরম তো হয়, পাওনা-টাওনা আদায় হল বোধ হয়?

কালিদাসবাবু হাতের তেলো দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন—ঐ হল আর কি, কোটটা পরলে বুঝিস না, টাকা-পয়সা নিরাপদে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়। এখান থেকে ট্রামে এসপ্ল্যানেড, সেখান থেকে টালিগঞ্জ, পথটা তো কম নয়।

গৌরীদা হঠাৎ আমাকে বললেন, ভানুর পকেটে মনে হচ্ছে টিফিন এনেছ, খেয়ে নাও না।

দুপুরে মন্তুদার সঙ্গে চা-টোস্ট খাওয়া হয়েছে। এরপর এত লোকের মাঝখানে টিফিন কৌটো খুলে খাওয়া যায়! মা কী দিয়েছেন কে জানে! মন্তুদাই বাঁচালেন, বললেন, ভানু আজ বাড়ি যাও, প্রথম দিন, ৫টা বেজে গেছে। কাল ঠিক সময়ে এসো।

বাইরে বেরিয়ে মনে হল, এই বিকেল তো কিছুদিন বাদেই আর দেখতে পাবো না। পাশ করলে এখান থেকেই কলেজ। কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে ১০ নম্বর বাস-এ উঠলাম। তখন সবই প্রাইভেট বাস। কলেজ স্ট্রীট থেকে গড়িয়াহাট ভাড়া এক আনা। গড়িয়াহাট মোড়ে নেমে হিন্দুস্থান রোডে ঢুকলাম। এখন যেখানে মুরলীধর গার্লস স্কুল, সেখানে তখন মাঠ, সেখানেই শুরু হয়েছিল চিত্তোদয় মণিমেলা, সুশীল, অরুণ মিলে এখানে শুরু করেছিল, হাসানদাও আসতেন পার্কসার্কাস থেকে। আমার দেরি দেখে প্রশ্ন করতে বললাম, আজ থেকেই তো কাজে ঢুকলাম।

তখন পার্কসার্কাসে যেমন সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতরতা ছিল, হিন্দুপ্রধান বালিগঞ্জ এলাকাতেও তেমনি। তা সত্ত্বেও হাসানদা পার্কসার্কাস থেকে রোজ আসতেন। হাসানদাই খবরটা দিলেন, সবিত, মৌমাছি সবাইকে জানাতে বলেছেন, আগামী রবিবার সকাল আটটায় সোনারপুর স্টেশনে সবাইকে জমায়েত হতে হবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কোদালিয়া হরিনাভি বোড়াল ভ্রমণ। দুপুরে খাওয়া ওখানেই, পয়সাকড়ি লাগবে না, শুধু যে যার ট্রেন ভাড়া বহন করবে। সন্ধ্যেয় ফেরা।

কথামতো রবিবার দিন যথাসময়ে পৌছলাম সোনারপুর। ব্রতচারীর গান, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি, নজরুল—এঁদের লেখা স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাঁটা। নেতাজীর বাড়ি থেকে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ি, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন হল। একটি স্কুলবাড়িতে বসে খিচুড়ি ভোজন, আবার সেইভাবেই ফেরা। ফেরার পথে মৌমাছি বললেন—আজকের ভ্রমণের বিবরণ যারা পারো, লিখে পাঠিও। যেটা ভালো হবে, আনন্দমেলায় ছাপাব।

৭

দিন দশেক পরে হাসানদাই খবর দিলেন, সবিত, তোমার লেখাটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আগামী সোমবার আনন্দমেলায় বেরোবে।

পরের সোমবার আনন্দমেলায় আমার লেখাটা বেরোল। মৌমাছির চিঠি ছাড়া পাতার প্রায় সবটা জুড়েই আমার লেখা। কাকাবাবু কাকীমা খুব খুশী। মা তো উচ্ছ্বসিত। বাবা তখন চোখে ভালো দেখতে পান না, তবু আনন্দিত, পড়ে শোনানো হয়েছে।

পয়সার বড় অভাব। তবু কোনোমতে চার আনা যোগাড় করে, চার কপি আনন্দবাজার পত্রিকা কিনলাম। একে, ওকে ডেকে পড়াই, বিতরণ করি।

মিত্র ও ঘোষে তখন বাইশ-তেইশ দিন কাজ হয়ে গেছে। সকালে যাবার সময়ে পকেটে একটা আনন্দবাজার পত্রিকা নিতে ভুলি নি। পুরো পত্রিকা নয়, আনন্দমেলা অংশটা। ঢুকতেই মন্তুদা বললেন, বাস রে ভানু, তোর কত বড় লেখা বেরিয়েছে আজ!

আমি হেসে টুলে গিয়ে বসলাম। জাবদা খাতা নিয়ে যোগ দিয়ে যাচ্ছি। গৌরীদা এলেন, একে একে কাকাবাবু সুমথকাকাও এসে গেলেন। একটা বেতের চেয়ারে কাকাবাবু বসতেন, হরিণের চামড়া পাতা। সুমথকাকা পাশের একটা চেয়ারে। পূব দিকের র‍্যাক ঘেঁষে একটা ছোট বেঞ্চি ছিল,

শুনেছিলাম সেটা যমুনা পত্রিকার অফিস থেকে কেনা, শরৎচন্দ্র ওখানে গেলে বসতেন, কাকাবাবু তাই শুনে বেঞ্চিটা কিনে আনেন। মাস্টার মশাইয়ের প্রিয় জায়গা ছিল সেই বেঞ্চি।

দুপুর দেড়টা নাগাদ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহসা প্রবেশ। হাতে ছাতা, একটা থলে, খাকি শার্ট ও ধুতি—এই সাদামাটা পোশাক। কাকাবাবু দেখেই বলে উঠলেন, আরে বড়দা যে, কোথ্‌থেকে? ঘাটশিলা না বারাকপুর?

পরে জেনেছি এই বারাকপুর বিভূতিভূষণের দেশের বাড়ি বনগাঁয়, নৈহাটি লাইনের ব্যারাকপুর নয়। বিভূতিবাবু বললেন, ইন ফ্যাক্ট বারাকপুর থেকে।

গৌরীদা বললেন, বড়দা কী খাবেন বলুন?

বিভূতিবাবু বললেন, ইন ফ্যাক্ট ভাত খেয়েই বেরিয়েছি, তবে বললে যখন চা আর আলুভাজা খাওয়াও।

গৌরীদা চট করে বেরিয়ে গেলেন। পাশের দোকান পান্থপেয়াবাসে চা বলা হল। এ দোকানটি এখন নেই, বইয়ের দোকান হয়ে গেছে। গৌরীদা কফি হাউস থেকে পটাটো চিপ্‌স নিয়ে এলেন। চাও এসে গেছে ততক্ষণে। বিভূতিবাবু দেখে বললেন—দূর দূর, এগুলো আলুভাজা নাকি, এ তো পটাটো চিপ্‌স। যত ফোতোদের কাণ্ড। আলুভাজা হবে মোটা মোটা, যা খিচুড়ির সঙ্গে খাওয়া যায়।

গৌরীদা বললেন, তাহলে তো বাড়ি যেতে হবে বড়দা, ও আলুভাজা এখানে কোথায় পাবেন?

এমন সময়ে খুকু এসে দাঁড়াল কাউন্টারের সামনে, গৌরীদার এক আত্মীয়-কন্যা। গৌরীদা উঠলেন, বসুন বড়দা, আমি ওকে একটু খাইয়ে আনি।

বড়দা হেসে বললেন, যাক, গৌরী কাজ পেয়ে গেল।

এ-কথা সে-কথার পর বিভূতিবাবুর আমার ওপর হঠাৎই চোখ পড়ল—আরে, এ তো বৌমার ছাত্র গজেনবাবু, ও কি এখানে কাজে লেগে গেল?

কাকাবাবু বললেন—হ্যাঁ, ও এখানে সকালে কাজ করবে, রাত্রে পড়বে এইরকম কথা আছে। সিটি, বঙ্গবাসী, রিপন—এই তিনটে কলেজ আছে কাছে, কোনোটাতেই আর্টস নেই, কমার্স আর সায়েন্স। আমরা বলছিলাম তাহলে রিপনই ভালো।

বিভূতিভূষণ বললেন—সে কথা বলতে। আমিও তো রিপনের ছাত্র। আমি নীরদ সব রিপনে পড়েছি।

এই তো গজেন-সুমথ বাড়ি করেছে—আমারই পাড়ায়—দাহিগোড়ায়। সবাই মিলে দারুণ বেড়ানো যাবে।

কালিদাসবাবু ততক্ষণে বাবু হয়ে বসা পা একটা ছড়িয়ে টিপতে টিপতে বলেন—আমার পা দুটো নিয়েই হয়েছে মুশকিল, দিন দিন অচল হয়ে আসছে। মন্তুদাকে বলেন—কীরে, তোদের মুড়ি কি হল?

মন্তুদা বললেন—এই আসছে, আমাকে বললেন, ভানু, পাঁচটা বেজে গেছে, এবার বাড়ি যাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলাম আড্ডা ছেড়ে। আসলে আমার লোভ ছিল—যদি কোনো গতিকে আবার আমার লেখার কথা ওঠে।

ফেরার পথে মণিমেলা গেলাম। লেখা তো সবাই দেখেছে। কবে খাওয়াব জিজ্ঞাসাবাদ চলল। বললাম—পরীক্ষা পাশের আর এটার একসঙ্গে খাওয়াব।

আড্ডার মুহূর্তে : কুমারেশ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মণীশ চক্রবর্তী ও প্রফুল্লকুমার বসু (মন্তুদা)
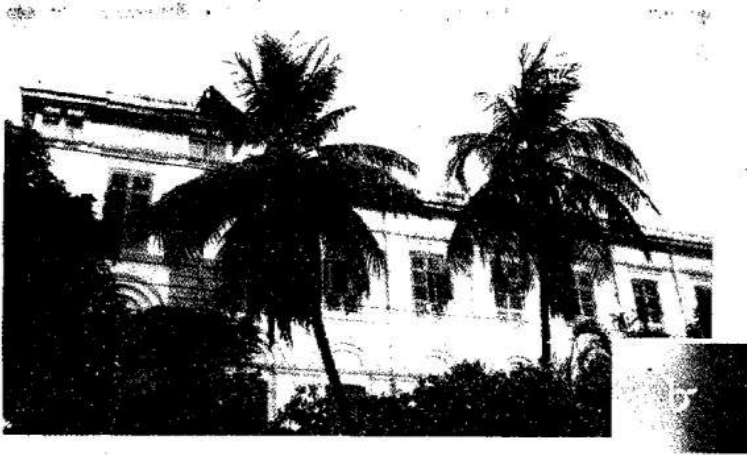
ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরোল। কবিশেখর ও সুনীতিবাবুর সৌজন্যে বাংলা প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্রের ফল আগেই জেনেছিলাম। আশানুরূপ হয়নি। একটায় ৫৮, আরেকটায় ৫৯। ফার্স্ট ডিভিশন হবে কি না সন্দেহ ছিল। একদিন সকালে সেলিমপুরের বাড়িতে আমার স্কুলের দুই সহপাঠী সুবীর ও শান্তি এলো—ইংরেজির মাস্টার মশাই রাজেনবাবু খবর এনেছেন সুবীর শান্তি সৌরেন শম্ভু ও আমি এবং কল্যাণ—এই ছ জন চিত্তরঞ্জন স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি।

আমাদের বাড়িতে তখন খুব অনটন। মা চিনির শরবত করে বন্ধুদের খাওয়ালেন। একটু মিষ্টি আনারও পয়সা ছিল না।

আজকালকার মতো পরীক্ষায় তখন এত নম্বর উঠত না, ফার্স্ট ডিভিশন কম হত। চিত্তরঞ্জন স্কুলে ছ জন ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও ঢাকুরিয়ায় আমার সময়ে আমার পাড়ার বন্ধু মধুসূদন ও আমি—দুজন মাত্র ফার্স্ট ডিভিশন পাই। মার্কশীট বেরোলে দেখা গেল, বাংলা দুটি পত্রে নম্বর কম পেলেও অন্য সব বিষয়ে সত্তরের কাছে নম্বর। সংস্কৃতয় ছিয়াশি। কাকীমা খুব খুশী। সুযোগ পেলেই সবাইকে বলছেন, আমার কাছে পড়ে ভানু সংস্কৃতয় লেটার পেল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হব আই এসসিতে, এইটাই ঠিক হল। অ্যাডমিশন ফী সেশন ফী ল্যাবোরেটরী কশন মানি ইত্যাদি নিয়ে পঁয়ষট্টি টাকা লাগবে। মা একদিন কাকীমার কাছে সাহায্য চাইলেন আমাকে লুকিয়ে।

আমার যেন মাথা কাটা গেল। আমি মাকে বললাম, পরীক্ষা পাশের পর কিছু দেওয়া হয়নি, তুমি সেখানে টাকা চাইলে!

মা বললেন, তা কি হয়েছে? প্রতিমা কিছু মনে করে না।

পরের দিন দোকানে দুপুর বেলা কাকাবাবু পঁয়ষট্টি টাকা দিলেন, এই নাও ভানু, কলেজ ভর্তির টাকা। সুমথ, আমি ও গৌরী সবাই মিলে দিয়েছি। লজ্জার কিছু নেই।

মায়ের কথা কাকীমা নিশ্চয় বলেছেন কাকাবাবুকে বুঝলাম। মাথা নিচু করে টাকাটা নিলাম।

ঐদিন বিকেলেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হলাম। আই-এসসিতে। ইংরেজি বাংলা ফিজিক্স্ কেমিষ্ট্রি ম্যাথামেটিক্স, ফোর্থ সাবজেক্ট নিলাম না। এই-ই পড়ার সময় পাবো কিনা কে জানে। টাকা জমার পর কেরানী বাবু বললেন, আসা হবে কোত্থেকে?

আমি বললাম—ঢাকুরিয়া থেকে, ট্রেনে।

উনি বললেন—তাহলে এই রসিদ দেখিয়ে ওখান থেকে ট্রেনের কনসেশন ফর্ম নাও। ঢাকুরিয়া তো, দেড় টাকায় মাস্থলি টিকিট হয়ে যাবে।

শুনলাম, জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু হবে। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। ভর্তি হয়ে বেরিয়ে এলাম। আকাশে তখনও রোদ। মনে হল, পৌনে পাঁচটা হলেই মিত্র-ঘোষ থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর পাঁচটা থেকে নটা। সোম থেকে শনি। আমার আর মণিমেলা যাওয়া হবে না।

কদিন দোকানে একটু কাজের চাপ ছিল। মণিমেলা যেতে পারিনি। জুন মাসের গোড়াতেই মাইনে দিলেন মন্তুদা—ত্রিশ টাকা। ভাবলাম আজ মণিমেলায় সবাইকে একটু খাইয়ে আসি। গড়িয়াহাটা পৌঁছে একটা দোকান থেকে মিষ্টি কিনলাম। অরুণের সঙ্গে দেখা—কি হল সবিত, আমি বললাম—এই যাচ্ছি, খাবার নিয়ে। পরীক্ষা পাশের, লেখা বেরোনোর সব। অরুণ বলল—এসো কথা আছে। সবাইকে দিলাম, একটা করে মিষ্টি। হাসানদা এক পাশে দাঁড়িয়ে। মিষ্টি দিলাম। একটু বিষণ্ণ হেসে নিলেন।

খেয়ে নিয়ে রুমালে হাত মুখ চোখ মুছলেন। যেন চোখে জল। জিজ্ঞেস করলাম—কিছু হয়েছে হাসানদা?

হাসানদা মাথা নাড়লেন। সুশীলের ভাই সুনীলই বলল—অভিভাবকদের অনেকে নাকি বলেছেন, ওঁর এখনও এখানে আসার দরকার কি? আমরা

তো উৎখাত হয়ে চলে এলাম। ওঁর যদি মণিমেলা এতই ভালো লাগে, ওখানেই অর্থাৎ পার্ক সার্কাসে আর একটা করুন না! মুসলমান ছেলেদের নিয়ে।

হাসানদা এক সময়ে বললেন—চলি সবিত। আর বোধহয় এদিকে আসা হবে না।

আমি বলতে পারলাম না, কাল থেকে হয়তো কলেজের জন্যই আমারও আসা হবে না।

হাসানদার সঙ্গে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এলাম। আসতে আসতেই হাসানদা বললেন—তুমি তো জানো সবিত, অরুণোদয় থেকে চিত্তোদয়, সবটা কি ভাবে আমার হাতে গড়া—এর সঙ্গে আমার রক্ত মাংস প্রাণ জড়িয়ে আছে! এত সহজে সব ভোলা যায়!

হাসানদাকে দশ নম্বর বাসে তুলে দিয়ে দাঁড়ালাম। জানলার পাশে বসা হাসানদার বিষণ্ণ মুখ একসময়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

এমন করুণ সন্ধ্যা আমার জীবনে খুব কমই এসেছে।

পরদিন সকাল বেলা দপ্তরে গিয়েই খাতা নিয়ে বসে গেছি। একজন সুদর্শন তরুণ এলেন। কমনীয় চেহারা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মন্তুদা, গজেনদার আসতে দেরি আছে, না?

মন্তুদা ঘড়ি দেখে বললেন, হ্যাঁ রঘু, এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে।

তরুণটি একটি কার্ড বের করে মন্তুদাকে দিলেন, বললেন, এইটে দিয়ে দেবেন গজেনদাকে, বলবেন পছন্দ হলে ফাইনাল করে দেবো।

তিনি চলে যেতে মন্তুদা বললেন, ইনি হলেন রঘুনাথ গোস্বামী, গৌরীদার সম্পর্কে শালা, আর্ট কলেজে পড়েন। গৌরীদার বেশির ভাগ বই, মানে মিত্রালয়ের, ওর আঁকা।

আমি বললাম, ওটা দেখাবেন মন্তুদা?

দেখলাম, একটা পোস্টকার্ড সাইজের একটু শক্ত সাদা কাগজে আঁকা ছবি। খোপ খোপ করে অনেকগুলি ঘর। প্রতি খোপে হলদে রঙের ওপর সাদা রেখায় দুটি করে পায়রা। নিচে খয়েরি জমির ওপর সাদা অক্ষরে লেখা মিলনান্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

মন্তুদা বললেন, মামার কতকগুলি মিলনান্তক গল্পের একটা সংকলন হচ্ছে।

আমি বললাম, এতটুকু ছবিতে কী করে বইয়ের কভার হবে?

মন্তুদা বললেন, পছন্দ হলে তখন বড় করে দেবে। যদি পছন্দ না হয় আগে থেকে এত পরিশ্রম করবে কেন?

কাকাবাবু সুমথকাকা এসে পড়তে মন্তুদা ওঁদের দেখালেন রঘুবাবুর আঁকা ছবিটা। দুজনেরই খুব পছন্দ। সুমথকাকা বললেন, মন্তু, রঘু এলে বলবে, এই যে খোপগুলোয় হল্‌দে রঙ দিয়েছে, এগুলো যেন গোল্ড দেয়, তাহলে পায়রার আউটলাইনগুলো আরো ভালো খুলবে।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, পয়সাও আরো খুলবে। হলদে—এ তো ইয়েলো অকার দিয়েছে, একটা ইম্প্রেশন পনেরো-কুড়ি টাকা নেবে। যেই গোল্ড করবে, রঘু বলবে গজেনদা গোল্ড পাউডার দেবেন, তারপর হাতে না লেগে যায়, সেলোফেনের কভার দাও। কত খরচ বাড়বে ভাবো তো?

সুমথকাকা বললেন, দ্যাখো, একটা কভার যখন করছই একটু ভালো ভাবে তো করতে হবে। সিগনেট প্রেস দেখছ তো কত খরচ করে। বেঙ্গল পাবলিশার্সও এখন দু-তিন রঙের কভার করছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তো চলতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, চলো তবে তাল মিলিয়ে। মন্তু, রঘু এলে বোলো তাহলে তোমার সুমথমামার কথা। এ বইটা তাহলে আমার খরচেই ছাপতে হবে। এত খরচ আর ফার্মের ওপর চাপাবো না।

এই সব আলোচনার মধ্যেই আর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন, ধুতি, পাঞ্জাবি, চশমায় ভারিক্কি চেহারা। সবাই আপ্যায়ন করলেন, আসুন আসুন জিতেনবাবু, অনেকদিন পরে যে।

ভদ্রলোক জিতেনবাবু বললেন, আরে এদের যে সব সিলেবাস পালটালো। সব নোট্‌স্ নতুন করে লিখতে হল।

কাকাবাবু বললেন, ভানু, প্রণাম কর, এত বড় ইংরেজি অধ্যাপক কম পাবে। যত জে. এল. ব্যানার্জির নোট দেখেছ, পড়ছ সব এঁর লেখা।

আড্ডা চলছে, এমন সময়ে এক হ্রস্বকায় কিন্তু স্বাস্থ্যবান, শান্তিনিকেতন রঙের গেরুয়া পাঞ্জাবি ধুতি পরা হাস্যমুখ ভদ্রলোক বাঁদিকের কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাসি-মুখে বললেন, বাঃ, আড্ডা বেশ জমে গেছে।

কাকাবাবু দেখেই বললেন, এই যে আশু, কভার কী হল? আরণ্যক, শ্রেষ্ঠগল্প-র।

আশুবাবু হেসে বললেন, সব এনেছি দেখাচ্ছি।

ইনি আর এক শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। গজেনবাবুর দিকে চেয়ে আমার সম্বন্ধে ইশারা করলেন, বোধ হয় নতুন কিনা জানতে চাইলেন। কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, এ তো ভানু, বলেছিলাম না, তোমার বৌদির ছাত্র। এখানে কাজ করবে, রাত্রে পড়বে। রিপন কলেজে আই-এসসিতে ভর্তি হয়েছে।

এঁদের কারও মুখে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বেরোয় না। সবাই রিপন বলেন। জিতেনবাবুও বললেন, এখানে বঙ্গবাসী সিটির চেয়ে রিপনই ভালো। আর আমিও তো আই-এসসি পড়েছি।

সুমথকাকা বললেন, তাহলে ইংরেজিতে এম.এ. করলেন কী করে!

জিতেনবাবু বললেন, সংসারের অভাব। আই-এসসি পড়ে চাকরি করলাম, তারপর ফিরে এসে ইংরেজি অনার্স নিলাম। তখন তো স্ট্রীম বদলাতে এত ঝঞ্ঝাট ছিল না।

কাকাবাবু বললেন, ও আশু, তুমি কথার ফাঁকে তোমার স্কেচগুলো দিতে ভুলে যাবে, কই দেখি ছবিগুলো।

আশুদা হেসে বললেন, গজেনদা ভবী ভোলবার নয়। বলে পকেট থেকে দুটো স্কেচ বার করলেন।

—এই দেখুন *আরণ্যক*-এর কভার। এক কালারে।

আগে শুধু বড় টাইপে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম কভার কাগজে ছেপে বইয়ের মলাট হতো। সিগনেট প্রেস রঙীন ছবি-ওলা মলাট শুরু করতে সব প্রকাশকই রঙীন মলাট শুরু করেছেন এখন।

আরণ্যক-এর এক রঙা মলাট সত্যিই সুন্দর। আশুদা বললেন, দেখুন গজেনদা, এক রঙা বলছি

বটে, কিন্তু দেখাচ্ছে দুই রঙা। আসলে আমি কাগজের সাদাটাকেও ব্যবহার করেছি ডিজাইনে।

সত্যিই সাদার মধ্যে গভীর বনজঙ্গলের ইঙ্গিতে আরণ্যকের ভাবটি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

জিতেনবাবু বললেন, এই একটা বই মশাই বিভূতিবাবুর, একেবারে ফেদার-টাচ্‌এ লেখা, মনে হয় বই পড়ছি না ওকাকুরার ছবি দেখছি! আর দেখুন, সংসারের সব কথাই আছে কিন্তু কোথাও অতিশয়োক্তি নেই।

কাকাবাবু বললেন, আশু, আর একটা, শ্রেষ্ঠ গল্প?

আশুদা বললেন, বার করব?

সুমথকাকা বললেন, হ্যাঁ, এখন সব নিজেদের লোক।

আশুদা পকেট থেকে আর একটি স্কেচ বার করলেন। আলপনা দিয়ে আঁকা, সুন্দর একটি ছবি। মধ্যে সাদা জায়গা। তিনটি বইয়ের নাম আলাদা কাগজে লেখা—বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রবোধ সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প।

আশুদা বললেন, বুঝলেন দাদা, মলাটের গ্রাউন্ড এক রং, লেটারিং আর এক। বিভিন্ন লেখকের সময়ে বিভিন্ন রঙের কমবিনেশন।

সুমথকাকা দেখতে দেখতে বললেন, বেশ হয়েছে। তার পরই ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হে, বড়দা প্রবোধবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কিন্তু হয় নি, তাড়াতাড়ি সারতে হবে ওটা।

সুমথকাকা আর কাকাবাবু কখনও কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকতেন না। অন্যদের কাছে একজন গজেন বা সুমথ বলছেন, কিন্তু সামনাসামনি কখনও 'হ্যাঁ হে' ছাড়া আমরা আর কিছু বলতে শুনি নি।

সুমথকাকার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, একটি কালো অস্টিন গাড়ি এসে দাঁড়ালো। মন্তুদা বলে উঠলেন, ঐ তো তারাশঙ্করবাবু এলেন।

তারাশঙ্কর ঘরে ঢুকলেন, রক দিয়ে। সঙ্গে এক যুবক। কাকাবাবু বললেন, একশ বছর বাঁচবেন এবং লিখবেন। এই মাত্র নাম হচ্ছিল।

তারাশঙ্কর বললেন, শেষেরটা কাম্য, প্রথমটা নয়। তারপর জিতেনবাবু, কেমন আছেন?

জিতেনবাবু সেকথার উত্তর না দিয়ে বললেন, প্রথমটা কাম্য নয় বলছেন কেন? বাঁচাটা তো দরকারই, অবশ্যই সুস্থ ভাবে, তবেই তো লেখাটা হবে একশ বছর।

—ঐ যে বললেন সুস্থ ভাবে, ঐটাই আসল কথা।

সুমথকাকা বললেন, আজ যে যুবরাজ সমেত বেরিয়েছেন, কী ব্যাপার?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, ওসব কথা পরে, আগে এই ভাউচারটা সই করে দিন।

তারাশঙ্কর ভাউচার পড়ে বললেন—একশ এক টাকা, এত টাকা কেন? কী বাবদ, তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প! এখনও লিখছি, লিখব, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ কী করে বুঝব?

কাকাবাবু বললেন—আপাতত যা বেরিয়েছে তার থেকেই বাছা হবে, আপনাকে দেখিয়ে নেবো। পরে সংস্করণ হলে, যোগ বা পরিবর্তনে অসুবিধে নেই।

তারাশঙ্করবাবু রসিদ সই করতে করতে বললেন—তোমাদের মাথায় তো বেশ খেলে। আগে একটা বার করলে না, সকলের প্রিয় গল্প নিয়ে—আমার প্রিয় গল্প, সেটারও তো এডিশন হচ্ছে। সনৎকে তো তাই নিয়ে বেরোলাম। ও তো শুধু চেনে মিত্র-ঘোষ, ওকে আজ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কাত্যায়নী, ডি. এম. লাইব্রেরি সব জায়গায় নিয়ে যাবো। দ্যাখো, এরা মাথা খাটিয়ে এই সব করে আমাদের আয় বাড়াচ্ছে। তোমাকে তো সব দেখতে হবে। মনে রেখো এটাও একটা জমিদারি, আর জমিদারি শুধু বাপের নয়, দাপেরও।

তারাশঙ্করবাবু উঠলেন, যাই ঘুরে আসি। শচীন-মনোজের কাছ থেকে।

তখন বেঙ্গল পাবলিশার্সের দুজন স্বত্বাধিকারী। লেখক মনোজ বসু ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শচীনবাবু কমলা বুক ডিপোর ম্যানেজার ছিলেন। মনোজবাবু লিখতেন আবার সাউথ সুবার্বন স্কুলে পড়াতেন, কিছু পাঠ্যবই ছিল। সেই সুবাদেই শচীনবাবুর সঙ্গে আলাপ এবং সেই আলাপের সূত্রেই দুজনে গড়ে তোলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। সে সময়ে কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় বেঙ্গল পাবলিশার্স একটি বিখ্যাত অগ্রগণ্য সাহিত্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করবাবু চলে যাবার পরেই এসে পড়লেন মাষ্টার মশাই কৃষ্ণদয়াল বসু। তার পরে পরেই কবিশেখর কালিদাস রায়। আশুদা আড্ডা জমছে দেখে ভিতরে ঢুকে এলেন। মন্তুদা যথারীতি আমাকে তাঁর চেয়ারের আধখানায় বসতে বললেন। জিতেনবাবুকে দেখে কালিদাসবাবু খুব খুশী। বললেন, হ্যাঁরে জিতেন, বলাই সেন টাকা দিল? বলাই সেন তখন সেন ব্রাদার্সের কর্তা।

জিতেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, বলাইবাবু থাকলে তো অসুবিধা হয় না। ঐ বিভুবাবুই গোলমাল করেন।

জে. এল. ব্যানার্জির ইংরেজি নোট বই বেরোতো সব সেন ব্রাদার্স থেকে। জিতেনবাবু বলছিলেন, বিভু পুরোপুরিই চলে যাবে, ও তো কফি হাউসের নিচে আলাদা দোকানই করেছে, বুক হাউস নামে।

মাস্টার মশাই বললেন, দুটো বই বিভুকে দিয়েছিলাম, বর্ণশ্রী আর এসেন্সিয়াল্‌স অফ বেঙ্গলি গ্রামার এণ্ড কম্পোজিশন, আমিও ভাবছি, এডিশন শেষ হলে তুলে নেবো। টাকা পেতে বড় হয়রানি হয়।

একটু পরে দেখি সনৎদা ঢুকছেন, রক দিয়ে। কাকাবাবুর পাশে বসলেন। কাকাবাবু বললেন, কী হল, বাবা কোথায়?

সনৎদা বললেন, হিসেব নিয়ে বসেছেন। শচীনবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। তারপর বললেন—গজেনদা আমি বোধ হয় আপনাদের একটা ক্ষতিই করে ফেললাম, সেইজন্যই তাড়াতাড়ি বলতে এলাম।

কাকাবাবু সুমথকাকা বললেন—কী ক্ষতি?

সনৎদা বললেন—আমি আপনাদের শ্রেষ্ঠ গল্পের কথা বলতে ওঁরা লাফিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমারকে অ্যাডভান্স করতে পাঠালেন। আমার বলাটা উচিত হয় নি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি জানাতে এলাম।

সুমথকাকা বললেন—সে তো আর আপনি ইচ্ছে করে বলেন নি। দেখা যাক, আমরাও চিঠি টাকা পাঠাই দেখি কী হয়।

সনৎদা বিষণ্ণ মুখে বিদায় নিলেন।

সব জায়গায় মিত্র ও ঘোষ থেকে চিঠি ও অ্যাডভান্সের চেক পাঠানো হল। কিন্তু বনফুল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার জানালেন অন্যত্র অর্থাৎ বেঙ্গলে কথা হয়ে গেছে। মিত্র-ঘোষকে তখনকার মতো তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠগল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

আশাপূর্ণা দেবী, পুত্রবধূ নূপুর, কাকীমা প্রতিমা মিত্র

মৌমাছির *জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড* বইটির প্রকাশক ছিলেন গৌরীদা। এটি তখন অনেক স্কুলে সাধারণ জ্ঞানের বই হিসেবে পাঠ্য ছিল। মৌমাছি এক সময়ে ভাল প্রচ্ছদ-শিল্পী ছিলেন। আমাদের একটি বই *এ টেল অব টু সিটিজ*-এর মলাট তাঁরই আঁকা। খুব সাদা-মাটা কভার, কিন্তু মাঝখানে একটা চমৎকার গিলোটিনের ছবি।

দেখতাম কোনো কোনো শিল্পী খুব খাটেন। ছোট সূক্ষ্ম কাজ সব, আর কেউ বা মাথা খাটিয়ে এমনই মলাট করলেন, খাটুনি কম, কিন্তু দেখলেই চোখ টানে, বই খোলবার আগেই পাঠক জেনে যায়, কি আছে বইয়ে। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌমাছি বিমল ঘোষ এই রকম শিল্পী ছিলেন। মৌমাছি আবার এঁকে যা পেতেন, দিলখুসা কেবিনের চপ কাটলেট আনিয়ে খেয়ে খাইয়ে অর্ধেক খরচ করে ফেলতেন। আনন্দমেলার পরিচালক হওয়ার পর থেকেই তাঁর শিল্পীজীবনে প্রায় ইতি পড়ে।

আশুদা, রঘুবাবু ছাড়াও আরও কিছু কিছু নতুন শিল্পীকে দিয়ে প্রচ্ছদ করানো হত। তবে আশুদার মতো মন-ভরানো প্রচ্ছদ বড় একটা কেউ পারতেন না।

একদিন এরই মধ্যে মাস্টার মশাই বললেন, গজেনবাবু, আশাপূর্ণা দেবীর লেখা দেখেছেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ খুবই ভালো লেখা। মেয়েদের মন, মধ্যবিত্ত সংসারের খুঁটিনাটি এরকম কারো লেখায় পড়ি নি। আমি তো একটা উপন্যাস চেয়েছি। মন্তু, তোমার বাড়ি ফেরার সময়ে হয়ে যেয়ো একদিন। বেলতলার মোড়ে। বেলতলা রোড ল্যান্সডাউনে যেখানে মিশেছে।

মন্তুদা বললেন, ঐ তো মৃত্যুঞ্জয় মিষ্টির দোকানের সামনে।

সুমথকাকা হেসে বললেন, দ্যাখো, মন্তুকে তুমি খাবারের দোকানের অবস্থান দিয়ে বোঝাও, মন্তু ঠিক বুঝে যাবে।

সেদিন আমার কলেজ ছিল না। মন্তুদাকে বললাম, মন্তুদা আজ আপনার সঙ্গে বেরোব। যদি যাবার সময়ে হয় তো আশাপূর্ণা দেবী হয়ে যাবেন? আমি কাকাবাবুর বাড়িতে বাণী রায় ছাড়া আর কখনও কোনো লেখিকা দেখি নি আজ পর্যন্ত।

তাই হল। রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে হ্যারিসন রোডে গ্লোব নার্সারি ফুলের দোকানের সামনে ১০এ বাসে উঠলাম। রিচি রোডের ম্যাডক্স স্কোয়ারের সামনে নামলাম। তারই পাশ দিয়ে এসে পড়লাম ল্যান্সডাউনে, তখনও তো শরৎ বসু রোড নাম চালু হয় নি।

রাস্তা পেরোবার আগে মন্তুদা দেখালো, এই দ্যাখ ভানু, মৃত্যুঞ্জয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

আশাপূর্ণা দেবীর বাড়ি ৭৭ বেলতলা রোডে। সামনের ঘরে এক প্রবীণ ব্যক্তি বসে কয়েকটা টাইপ মেশিন নিয়ে ছেলেদের টাইপ শেখাচ্ছেন। তাঁকে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে

এসেছি বলতে, বললেন, আপনারা ওদিকের দরজায় যান, আমি খুলে দিচ্ছি, আর ওঁকেও খবর দিচ্ছি।

আমরা গিয়ে দাঁড়াবার আগেই উনি গিয়ে দরজা খুলেছেন দেখলাম। ভেতরে ঢুকে সোফায় বসলাম। একটা পেতলের জলচৌকি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ঝক্ ঝক্ করছে। তার ওপর ঘট বা ঐ জাতীয় কিছু রাখা।

কিছুক্ষণ বসবার পর আশাপূর্ণা দেবী এলেন। বললেন, 'তোমাদের একটু বসতে হবে বাবা, আমি মাকে খাওয়াচ্ছি। ওঁর খাওয়া হলে আমি আসব। গজেনবাবুর চিঠি পেয়েছি। তোমরা বসো একটু।'

একটি মেয়ে দুটি রেকাবিতে দুটো করে দরবেশ দিয়ে গেল। তারপর জল। বলল, আপনারা খান, চা নিয়ে আসছি।

আমি মন্তুদাকে চুপি চুপি বললাম, মন্তুদা, আপনার মৃত্যুঞ্জয়।

মন্তুদা গম্ভীর ভাবে বললেন, বেশি পাকামো করিস না। খেয়ে নে।

আশাপূর্ণা দেবী এলেন। বললেন, মিষ্টি খেয়েছ বাবা তোমরা?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব। চা মিষ্টি।

আশাপূর্ণা দেবী একটা খাম থেকে তিনটে প্যাড বার করলেন। বললেন, আমার এই উপন্যাসটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তোমরা গজেনবাবুকে বোলো, এইটে দিয়ে কাজ শুরু করতে। আমি আর দিন পনেরোর মধ্যে শেষ করে দেবো। আর একটা কথা, তোমরা যদি কষ্ট করে সকালে আসতে পারো ভালো হয়, নতুবা বিকেলে। এই সময়টা আসলে শাশুড়ী-মাকে খাওয়াতে হয়।

মন্তুদা বললেন, তাহলে এই ভানু এসে নিয়ে যাবে। ও তো দশটা নাগাদ বেরোয়।

বিদায় নেবার সময়ে বললেন, তোমাদের প্রথম দেখাতেই তুমি বললাম, কিছু মনে কোরো না বাবা।

আমরা বললাম, কী বলছেন, আপনি আমাদের মায়ের মতন।

আমরা প্রণাম করে বিদায় দিচ্ছি। বললেন, গজেনবাবুকে বোলো, বইটার নাম *বলয়গ্রাস* দিয়েছি। মনে হয় এই নামটাই ঠিক হবে।

পরবর্তীকালে আশাপূর্ণা দেবী ও তাঁর স্বামী কালিদাস গুপ্ত আমাদের কাছে কখন মাসীমা ও মেসোমশাই হয়ে গেলেন আমরা জানতেও পারি নি।

বলয়গ্রাস মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম বই।

এই সময়ে কতকগুলি মাসিক সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকার পড়তি অবস্থা। *ভগ্নদূত* তেমন আর লোকের হাতে দেখা যায় না। *সচিত্র শিশির, সচিত্র ভারত* চলছে বটে, তবে আগের মতো নয়। প্রবাসীও তাই। *সচিত্র শিশির*—যার প্রকাশক ছিলেন দস্যু মোহনেরও প্রকাশক, আগের মতো চলে না। *ভারতবর্ষ* মোটামুটি চলছে। *মাসিক বসুমতী* তার সাহিত্য সম্ভারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ* এখানেই ধারাবাহিক বেরোয়। সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকা ক্রমশ সাড়া জাগাচ্ছে। *গল্পভারতী* পত্রিকাটি ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে। এক প্রবল জোয়ার নিয়ে শোরগোল তুলে উঠে আসছে দীপ্তেন সান্যালের *অচলপত্র*। প্রকাশকরা কিন্তু তখনও বইয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য *প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, শনিবারের চিঠি*—এই চারটি পত্রিকাকেই পছন্দ করছেন। *শনিবারের চিঠির* সম্পাদকীয় আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি ছিল।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী কোনো লেখায় বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী অথবা ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেমন সার্থক শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তেমনটা হয় না। কথাটা কেউ মানুক না মানুক, অনেকের মুখেই শুনেছি, স্বাধীনতার আগে বা তার অব্যবহিত পরে যে সব সাহিত্য শিল্পকলা পেয়েছি, তেমন মন-ভরা সৃষ্টি আর পাই না। কারও কারও মত, শিল্প-সৃষ্টি দূরবর্তী হলে তবেই মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে, আর স্থায়িত্বের বিচারটাও সেই সঙ্গে হয়ে যায়।

তবে একটা কথা ঠিক, দেশ-ভাগ এর আগে পরে যে বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার ঢেউ এসেছিল তার পরে তেমনটা কেউ দেখে নি। *আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী* এই তিনটি দৈনিক পত্রিকা তো আগে থেকেই চলছিল, ছিল মুসলীম লীগ-এর মুখপত্র *আজাদ*। দেশ-ভাগের আগে-পরে এক ঝাঁক নতুন দৈনিক পত্রিকায় পত্রিকা স্ট্যান্ড ছেয়ে গেল। *প্রত্যহ, স্বরাজ, ভারত, কৃষক, হিন্দুস্থান, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* প্রগতিশীল মুসলমানদের কাগজ *ইত্তেহাদ*—সব নাম এখন মনেও নেই। সাময়িক পত্রিকাও বেরোল অনেক। সবগুলি দাঁড়াতে পারে নি, তবু *অরণি* পত্রিকাটিকে এখনও মনে পড়ে। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে *স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। কংগ্রেস ছাড়ার পর শরৎচন্দ্র বসু বার করেছিলেন *দি নেশন* পত্রিকা। সাপ্তাহিক *ইলাস্ট্রেটেড উইকলির* কাটতি ছিল ভালো। *ওরিয়েন্ট* নামের একটি পত্রিকা চলত, তবে তত উঁচু মানের ছিল না।

সেদিন আমার কলেজ নেই। কলেজ না থাকলে আমি কাউন্টার বন্ধ অবধি থেকে যাই। আড্ডায় আসর খুব সরগরম। *শনিবারের চিঠি* মাসিক পত্রিকায় 'কল্লোল'-এর এক নামী লেখকের লেখার অংশবিশেষ ও তার পাশাপাশি একটি বিদেশী উপন্যাসের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। বাংলা লেখা ইংরেজি লেখাটির প্রায় হুবহু অনুবাদ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপক। খয়রার মহারাজার অনুদানে এই চেয়ারটি তৈরী হয়, সেইজন্য এই পদের অধিকারীকে *খয়রা অধ্যাপক* বলা হয়। সুনীতিবাবু যেতে যেতে দোকানের ভিতর গজেনবাবুদের দেখে কাউন্টারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন, মশাই, এবারের শনিবারের চিঠি দেখেছেন? সজনীবাবু এসব বার করেন কী করে বলুন তো? যোগাড় করার দারুণ ক্ষমতা সজনীবাবুর।

বাণী রায়

সুনীতিবাবুর কথা শেষ হতে না হতে বাণী রায় এসে ঢুকলেন। সুনীতিবাবু বললেন, এই তো বাণী দেবী এসেছেন। দেখেছেন এবারের শনিবারের চিঠি?

বাণী রায় বললেন, আরে ওটা তো এই শর্মাই দিয়ে এসেছে। সজনীবাবুকে দিয়ে বললাম, দেখুন কী কাণ্ড!

বাণী রায় তখনকার দিনে ইংরেজিতে এম. এ. করেছিলেন। বাণী রায়ের কথা শেষ হতেই গজেনবাবু বললেন, সুনীতিবাবু, দেবী কি কখনও শর্মা হতে পারে?

সুনীতিবাবু বললেন, গার্গীর মতো হলে পারে। যাজ্ঞবল্ককে তো ঘোল খাইয়ে দিয়েছিলেন। শেষকালে মাথা ফেটে যাবে বলে নিরস্ত করলেন।

বাণী রায় সোৎসাহে বললেন, দেখুন ভাষাচার্য কী বলছেন গজেনবাবু!

সুনীতিবাবু বললেন, গজেনবাবু মুড়ি আনান, আর বেগুনি আলুর চপ। মুড়ি ক্লাবে মুড়ি ছাড়া চলে! আর তেলেভাজা না হলে আড্ডা জমে না। জানেন তো, অসারে খলু সংসারে আড্ডাং দদাতি পণ্ডিতাঃ। কেউ ভুল ধরছেন নাকি সংস্কৃতয়, আড্ডায় ভুলই বলতে হয়।

শনিবারের চিঠির খবর নিয়ে আসর সরগরম। সুনীতিবাবুর পাশ কাটিয়ে কালিদাস রায় ছাতা দরজায় টাঙিয়ে কাউন্টারের টেবিলে উঠে বসলেন। দুজনের চেহারায় ব্যক্তিত্বের ভারে ওদিকের কাউন্টার বন্ধ। যা কিছু বেচা-কেনা মস্তুদার সামনের কাউন্টারে। সুনীতিবাবু বললেন, এই তো কবিশেখর এসে গেছেন, এই দেখুন *শনিবারের চিঠি*। বাংলা লেখা ও ইংরেজি পাশাপাশি ছেপে দিয়েছেন সজনীবাবু। নামী লেখক হুবহু অনুবাদ করে নিজের নামে ছেপে দিয়েছেন।

ততক্ষণে মাস্টারমশাই (কৃষ্ণদয়ালবাবু) এসে গিয়েছেন। উনি দেখে বললেন, আমাদের এক বন্ধু পরীক্ষার খাতায় কেউ নকল করলে উত্তেজিত হয়ে বলত, একেবারে *হুবাহুবো* নকল। এও তাই বলতে ইচ্ছে হয়।

সুনীতিবাবু বললেন, তবে এই কুম্ভীলক বৃত্তি বা প্লেজিয়ারিজম শুধু একালে নয়, আগেও ছিল, তা না হলে এ সব শব্দই তো তৈরী হত না।

একজন বললেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী'ও তো শোনা যায় মোহিতলাল মজুমদারের কোন কবিতার ভাব থেকে নেওয়া।

কালিদাসবাবু বললেন, তবে ভাব থেকে নেওয়া তেমন প্রতিভাধর স্রষ্টার হাতে পড়লে অনেক ভালো সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র সঙ্গে অনেকে হুইটম্যানের কবিতাটির কথা বলেন। যদি ধরেও নিই, হুইটম্যানের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল, তবু 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' অনেক ভালো। এগুলিকে 'কুম্ভীলক' বলা যায় না, সমালোচকরা যাই বলুক। এগুলোকে বড় জোর অ্যাসিমিলেশন বলা যায়। অ্যাইভ্যান্‌হো-দুর্গেশনন্দিনী নিয়ে তো কত কথা হয়েছে। বঙ্কিম নিজেই

বলেছেন, অ্যাইভ্যান্‌-হো তাঁর পড়া ছিল না। তবে বৈষ্ণব পদাবলী থেকে অনেক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাঁর কবিতায়—এই দ্যাখ না—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'র ছন্দে অবিকল—'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী!'

কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন—আরও আছে, দীর্ঘস্বর প্লুত উচ্চারণ কাজে লাগিয়েছেন—'চন্দনচর্চিত নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী'র মতো 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।'

সুনীতিবাবু বললেন, আচ্ছা কবিশেখর, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এখনকার কবিদের ওপর কী রকম?

কালিদাসবাবু এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন—বিলক্ষণ, যতই যাই করুক, নতুন নতুন কারিগরি, ঐ তো অচিন্ত্যর কবিতাতেই আছে, পথ রুধি বসে থাকুন রবীন্দ্রঠাকুর, ওটা খাঁটি কথাই, যতই যাই করুক, রবীন্দ্রনাথেই ফিরতে হবে সবাইকে। এমন কি গদ্য-কবিতাও কত ভালো হতে পারে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে এড়ানো অসম্ভব। তবে কথাসাহিত্য যদি বল তো সেখানে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম কেউ নেই। বিভূতি, তারাশঙ্কর, কল্লোল-কালিকলমের লেখকদের উপন্যাস একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলেই নজরে পড়বে, শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের আদল। তবে ইংরেজি অনুবাদের কথা আলাদা।

মৌমাছি বিমল ঘোষ

কালিদাসবাবু বলার শেষে হাসলেন কি না, গোঁফের আড়ালে বোঝা গেল না।

বিকেল হতেই সুনীতিবাবু বিদায় নিয়েছেন। মৌমাছি বিমল ঘোষ এসেছেন গৌরীদার খোঁজে। শনিবারের চিঠির কথা শুনে পত্রিকাটা সাগ্রহে প্রায় কেড়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তেই বললেন—কী কাণ্ড মশাই!

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কালিদাসবাবু উঠে ছাতা নিতে গিয়ে দেখলেন, ছাতা নেই। সবিস্ময়ে বললেন, ওরে মন্তু, আমার ছাতা কোথায় গেল?

মন্তুদা বললেন, আপনি এসেই তো দরজার মাথায় রাখলেন, বেতের ডাঁটির ছাতা।

কবিশেখর সক্ষোভে বললেন, এইজন্য গুরুনিন্দা করতে নেই। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের গুরুই। ঐসব তুলনা দিয়েই পাপ কুড়োলাম। সেই পাপে ছাতা গেল। কতদিনের সঙ্গী বল তো! আবার একটা ছাতা কিনতে হবে।

মৌমাছি বিমল ঘোষ বললেন, কালীদা, আপনি এইটার ওপর কবিতা লিখে দিন আনন্দমেলায়। আপনার ছাতার দাম পেয়ে যাবেন।

কালিদাসবাবু বললেন, তুই তো আবার সাত টাকার বেশি দিস না। একটা ভালো ছাতা দশ টাকার কমে হবে না।

মৌমাছি বললেন, একটু বড় কবিতা দেবেন। আমি দশ টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দেবো।

কিছুদিন পরেই কালিদাসবাবুর কবিতা বেরোল 'আনন্দমেলা'য়—

ছত্রবিয়োগ

বর্ষাসাথী আমার ছাতি, আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার 'পরে বাদর ঝরে তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে
সঙ্গে ছিল বাঁক্‌ড়ো, ব'রম-পুর হাজারিবাগে
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে, চুমি'
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুরে জাগে।

থাকতে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জামায় দাগটি বাঁটের মলিন হয়ে আছে।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে রেখেছিলাম বগল দেবে
বসলে তুমি থাকতে কোলে হারাও ভেবে পাছে।

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মিকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি
হাত চলে না পিঠে যেথায় চুলকে দিতে তুমিই সেথায়
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচিল 'পরে চড়ি।

রৌদ্রে পুড়ে জ্যৈষ্ঠিমাসে বাঁচিয়ে দিলে মাথা,
ওরে আমার দিল-দরদী পথের সাথী ছাতা।
সেদিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্‌লা কুকুর আসলো তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে হলে আমার ত্রাতা।

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে,
'ব্যাঙের ছাতা' মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইকো তেমন আঙুলে বল কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি বারে বারে।

খোকার ঘোড়া ছিলে, খোকা ছুটতো তোমায় চ'ড়ে।
খেলা-পাতি পাত্‌ত খুকী তোমারে ঘর করে।
লুকিয়ে নভেল টেবিল তলে যে সব ছাত্র কৌতূহলে
পড়ত, তুমি ছত্র, তাদের পড়তে পিঠে জোরে।

হয়ত নূতন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে
হায়রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে জানছ না তো, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে।

হয়তো নেহাৎ দায়েই পড়ে গিয়েছে কেউ নিয়ে
বেরোয় না কো ধরা পড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়তো মাকড়শাদের জালে বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশুলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে।

নতুন মালিক হয়তো দালাল, নয়তো ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটা দিন মরছ ভিজে, পুড়ে'।
কেমন আছ নতুন হাতে? সইবে তো ভাই তোমার ধাতে?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরাণ আমার কুরে।

এই কবিতার টাকায় কালিদাসবাবুর নতুন ছাতা হয়ে গেল। তবে কালিদাসবাবু এরপর পারতপক্ষে আর ছাতা নিয়ে বেরোতেন না।

১১
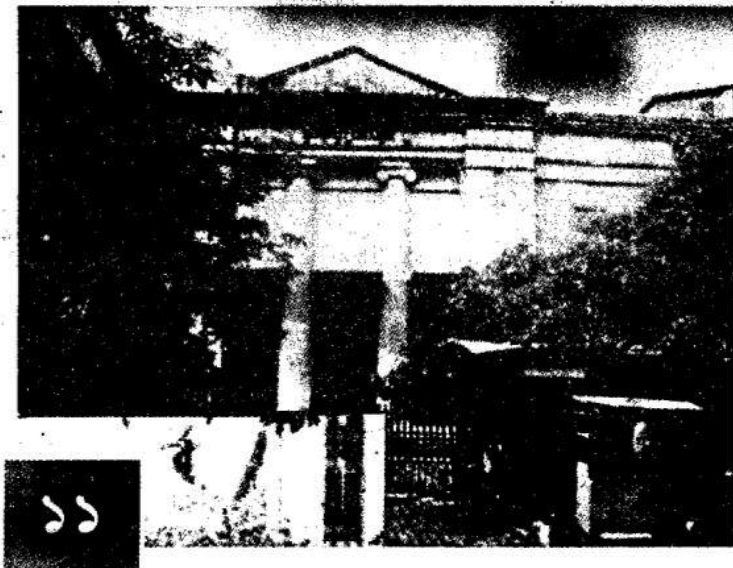
আমি কাজে লাগার পর প্রথম মোটা বই বেরোল মিত্র ও ঘোষ থেকে অনুবাদের বই—*এ পেয়ার অফ্ ব্লু আইজ*—টমাস হার্ডির, অনুবাদ করেছিলেন চারুপমা বসু। যেদিন বই বেরোল সেদিন কোনো কারণে কৃষ্ণকালী আসে নি। নতুন বই বেরোলে সব দোকানে দোকানে গিয়ে দেখাতে হয়। তাহলে তারা অর্ডার এলে নিয়ে যাবে। বিজ্ঞাপন তো সবার নজরে পড়ে না। মন্তুদা বললেন, ভানু, আজ বইটা বেরোলো, আজই কেষ্ট নেই, তুই দোকানগুলোয় একটু দেখিয়ে আসবি? যারা আমাদের বই নেয়।

আমি ক্যাশমেমোতে তখনও তত রপ্ত হই নি। কারা আমাদের নিয়মিত বই নেয় তা ঠিক জানা নেই। বইটি নিয়ে সামনের স্টল থেকে শুরু করে একে একে সব দোকানগুলোয় বই নিয়ে গেলাম। সামনেই ছিল শ্রীনাথ লাইব্রেরি, এখন উঠে গেছে, সেখানে শরৎ বুক হাউস হয়েছে। স্কুলপাঠ্য বইয়ের দোকান, লেখাপড়া, আনন্দ পাবলিশার্স (এখনকার আনন্দ পাবলিশার্স নয়, এটির মালিক ছিলেন—শিশির সেন), তারপর হিন্দুস্থান বুক ডিপো, মণ্ডল ব্রাদার্স। মণ্ডল ব্রাদার্সের মালিক বললেন, পড়াশুনো চলছে? আমি বললাম—হ্যাঁ, মোটামুটি। এঁরা অধ্যাপক পঞ্চানন দে'র

ইনর্গানিক কেমিস্ট্রির বই ছেপেছিলেন। আমাকে এক কপি বিনামূল্যে দিয়েছিলেন।

এরপর অমর লাইব্রেরি, বাণী লাইব্রেরি হয়ে দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানিতে গেলাম। কাউন্টারে এঁদের অর্ডার আসত দেখেছি, ৫ কপি বা ১০ কপি একই রকম বই নিতেন। এখানেই অন্যতম অংশীদার অমূল্যবাবুকে দেখলাম। সুদর্শন শুভ্র বেশ। আমাকে দেখে বললেন, কবে এসেছেন? আমি বললাম, এই তো মাসখানেক হল। আমি পরে শুনেছিলাম, অমূল্যবাবুদের পিতৃদেব সন্ন্যাসী বা সংসার-বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন, পরে আবার ফিরে আসেন। অমূল্যবাবুর ছোট ভাই ভেতরের দিকে ক্যাশে বসতেন। দুজনেই সর্বদা হাসিমুখ। ভালো ব্যবহারের জন্য ক্রেতারা সন্তুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি, এখনও।

এরপর এস. কে. লাহিড়ীর দোকান। ওঁরা বই দেখে ফেরত দিয়ে বললেন, আমরা তো এসব বই রাখি না। দরকার হলে আনিয়ে নেবো। দেখলাম, আলমারিতে বেশির ভাগ আইনের বই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বই। পরে শুনেছি, এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল রামতনু লাহিড়ীর, যাঁর নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে একটি চেয়ার আছে।

এস. কে. লাহিড়ীর পর কোঅপারেটিভ বুক ডিপো, কমলা বুক ডিপো হয়ে সেন ব্রাদার্সে ঢুকলাম। এঁরা পাঠ্য বই ছাপালেও মাঝে মধ্যে আমাদের বই কিনতে অর্ডার পাঠাতেন। এঁদের পূর্বপুরুষ ভোলানাথ সেন কাউন্টারে বসেই নিহত হন। এঁদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বই *প্রাচীন কাহিনী*-তে নবীর ছবি ছাপা হয়। সেইজন্য দুই পাঠান মুসলমান এসে হঠাৎই ভোলানাথবাবুকে ছুরিকাঘাতে নিহত করে। এ ঘটনা স্বাধীনতার আগে। বাংলা দেশে তখন মুসলীম লীগ-এর শাসন চলছে।

সেন ব্রাদার্সের পর ইউ. এন. ধর এন্ড সন্সে গেলাম। সেখানে রাজেন ধর মশাই বললেন, কী খবর তোমাদের, গজেনবাবু ভালো আছেন? আর তোমার ক্লাস চলছে?

রাজেনবাবু আমাকে ওঁদের ক্যালকুলাস বই দুটি দিয়েছিলেন। ওঁদের পাশের দোকান সেন. রায় এন্ড কোম্পানিতে আর ঢুকি নি। ওঁরা নোট বই অর্থাৎ অর্থপুস্তকের প্রকাশক আগেই শুনেছিলাম। এম. সেন-এর নামে বাংলা অর্থপুস্তক কালিদাসবাবু লিখতেন।

মোড়ের মাথায় বুক স্টোর নামে একটি দোকানে গি
বড় রকম ধাক্কা খেলাম। বইটা খুলে কাউন্টারের এ
প্রবীণ সেলস্‌ম্যান বললেন, এ কী হে, সাহিত্যিকদে
প্রকাশনেই টাইট্‌ল পৃষ্ঠায় ছাপার ভুল?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, কোথায়?

তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন—এই যে *চারূপমা* ব
চারু শব্দ বরাবর হ্রস্ব উকার। দীর্ঘ ঊকার হয়?

আমি বললাম—ওটা তো *চারু* আর *উপমা* সন্ধি ক
চারূপমা হয়েছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—তুমি ছেলেমানুষ তে
বোঝো না, *চারু* কখনও দীর্ঘ ঊকার হয় না। সন্ধিই হো
আর যাই হোক। বোলো গজেনবাবুকে।

কী আর বলব। অনেক বড় আমার থেকে। তর্ক ন
করে চলে এলাম। কফি হাউসের নি
বুক হাউস-এ বই দেখিয়ে এগিয়ে গেলা
বেঙ্গল পাবলিশার্স ছাড়িয়ে।

গোলদিঘির পূর্বপ্রান্তে কতকগু
দোকান থেকে বই কিনতে যেতে
আমাদের কাউন্টারে। সান্যাল ব্রাদা
চট্টোপাধ্যায় এন্ড সনস ঘুরে বিশ্বভারতী
দোকানে ঢুকলাম। ওখানে শুকদেববা
বলে এক ভদ্রলোক বললেন—আপ
নতুন এসেছেন তাই জানেন না, আম
তো শুধু আমাদের বই বিক্রি করি। ম
ভালো আছে? বলবেন আমার কথা, শুকদেব খব
নিয়েছে।

বিশ্বভারতীর পর ঢুকলাম 'বুক কোম্পানি'তে। এ
প্রবীণ ভদ্রলোক পরে নাম জেনেছি তিনিই গিরীনবা
বললেন—গজেন সুমথ ভালো আছে? পরে কর্মচারীদে
বললেন—ওরে বইটা দেখে রাখ, এনকোয়ারি হলে
আনিয়ে নেবে।

পথে পড়ল র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব—অনুবাদ বইয়ের প্রকাশক, ছোটদের বইয়ের দোকান আশুতোষ লাইব্রেরি। ওসব দোকানে না ঢুকে শেষে এলাম এম. সি. সরকারে। শুনেছিলাম প্রাচীন ও বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মালিক সুধীরবাবু বসে, সুধীরচন্দ্র সরকার। সামনে কয়েকজন প্রবীণ মানুষ। পরে নামগুলি জেনেছিলাম—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী সম্পাদক, রামানন্দবাবুর পুত্র। মাখনলাল সেন—এক সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়—যখের ধনের লেখক। নলিনীকান্ত সরকার—দাদাঠাকুরের শিষ্য হাসির গানের লেখক। তাঁদের পাশে অপেক্ষাকৃত দুই নবীন ভদ্রলোক বসে। পরে নাম জেনেছিলাম, গেরুয়া চাদর কাঁধে ভদ্রলোক হলেন বিশু মুখোপাধ্যায়। *মৌচাক* পত্রিকা দেখাশুনো করতেন। অন্যজন কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্র। আরও একজন সিল্কের পাঞ্জাবি ধুতি, পায়ে চটি। পরে শুনি, ইনিই শিবরাম চক্রবর্তী।

শিবরাম চক্রবর্তী

আমি ওঁদের কাউন্টারে বই দেখাবার সময়েই শুনলাম নলিনীবাবু মাখনবাবুকে জিজ্ঞেস করছেন—আচ্ছা মাখনবাবু, আপনাকে যদি একটি পিস্তল ও দশটা গুলি দেওয়া হয় আপনি কাকে কাকে মারবেন?

ইতিমধ্যে বাচ্চুদা, সুধীরবাবুর ছেলে, সুপ্রিয় সরকার আমাকে ডেকে বইটা দেখতে চাইলেন। আমি বইটা দেখাচ্ছি, কিন্তু কান আছে মাখনবাবু কী উত্তর দেন সেই দিকে।

মাখনবাবু কিছুক্ষণ বাদে ঘাড় নেড়ে বললেন—উঁহু, কুলাবে না। আমার কুড়িটা গুলি চাই, দিলে তবেই তালিকা দিব।

মাখনবাবুর উত্তর শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমি ফিরে এসে মন্তুদাকে বললাম—সব দোকানে বই দেখিয়েছি। বিশ্বভারতীর শুকদেববাবু আপনার কথা বললেন। মন্তুদা দোকানের নামগুলো শুনে বললেন—তুই একটা পাগল। যারা যারা বই কেনে শুধু তাদের কাছে তো যাবি!

আমি বললাম, দোকানগুলো তো চেনা হল।

ততক্ষণে কাকাবাবু (গজেনবাবু) সুমথকাকা এসে গেছেন। আমি বুক স্টোরের ভদ্রলোকের কথা বললাম, *চারূপমা* শব্দটা ভুল বলেছেন। সুমথকাকা হেসে বললেন, বাদ দাও দিকি, ওদের যেমন বিদ্যে, তেমনি বোল-চাল।

বিমল মিত্র

একটু পরেই কৃষ্ণদয়ালবাবু ভেতরের দরজা দিয়ে ও সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন কালিদাসবাবু। কালিদাসবাবু কাউন্টারের ওপর গুছিয়ে বসতেই কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন, স্যার, আপনার ছাতা কেনা হল?

কালিদাসবাবু যখন রংপুরে উলিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণদয়ালবাবু তখন তাঁর ছাত্র ছিলেন। যদিও কালিদাসবাবু সব সময়ে বলতেন, কৃষ্ণদয়ালের ব্যাকরণ জ্ঞান ও ছন্দের কান আমার থেকে ভালো।

কালিদাসবাবু কৃষ্ণদয়ালবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, কিনলাম একটা ছাতা, বিমল কথা রেখেছে। দশ টাকাই দিয়েছে। তবে ছাতা খুব দরকার না হলে আর আনবো না। হ্যাঁরে মন্তু, জুতো যাবে না তো?

মন্তুদা বললেন, এখান থেকে কী করে দেখব? আপনি বরং জুতোটা ভেতর দিকে ঢুকিয়ে রাখুন।

কালিদাসবাবু কথায় কথায় বললেন, হ্যাঁরে গজেন, তোদের এখানে ছাতা হারিয়ে কথায় কথায় একটা কবিতা হয়ে গেল। এখানে হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে গম্ভীর আলোচনাও হয়। তা একটা পত্রিকা বার কর না, সাহিত্যের পত্রিকা। এতগুলি কথাসাহিত্যিক আড্ডা দেয়, অনায়াসে লেখা যোগাড় হয়ে যাবে। নাম দে বরং *কথাসাহিত্য*।

কৃষ্ণদয়ালবাবু তাঁর বেঞ্চি থেকে বললেন, আর প্রুফরীডারও মজুত।

কৃষ্ণদয়ালবাবু মিত্র ও ঘোষের, মিত্রালয়ের প্রায় সব বইয়েরই প্রুফ দেখতেন। বিভূতিভূষণের তারাশঙ্করের বই হলে চেয়ে নিতেন।

কৃষ্ণদয়াল তাঁর প্রিয় বেঞ্চিতে বসেই কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। আগেই বলেছি, এটি গজেনবাবু সুমথবাবুরা *যমুনা* পত্রিকার অফিস থেকে নিয়েছিলেন। সেখানে শরৎচন্দ্র এই বেঞ্চিতে বসতেন।

কালিদাসবাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল। পুজো থেকেই শুরু করা যাক সবাই বললেন। দু-তিন মাসের লেখা সংগ্রহ করে কাজে নামা যাবে। দাম ঠিক হল—চার আনা। এখনকার পঁচিশ পয়সা। কথাবার্তা চলছে, এমনই সময়ে 'সোনার বাংলা'র প্রফুল্লকুমার গুহ এসে হাজির হলেন। শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, খুব ভালো, আমি বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দেবো। মন্তুবাবু, আপনি মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে বেরোবেন। তাহলেই হবে।

গৌরীদাও (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য) খুব উৎসাহী। কাকাবাবু বললেন, সম্পাদক থাকুক, সুমথ ও গৌরী। গৌরীদা বললেন, আপনি সরে থাকবেন তা হবে না গজেনদা।

কাকাবাবু বললেন, আমি সরে থাকব না, সবই করব। সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব থাকল আমার। সম্পাদকীয়র নামও ঠিক করেছি, 'পথে ও পথের প্রান্তে'। একটা দুটো ফিচার থাকলে ভালো হয়।

ঠিক হল, *সাহিত্যের উনপঞ্চাশ* নামে একটি বিভাগে গৌরীদা রম্যরচনার ধরনে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের খবরাখবর দেবেন।

গৌরীদা কোনো ছদ্মনাম নেবেন না স্বনামে এই নিয়ে আলোচনা চলল। ঠিক হল প্রথম দুই সংখ্যায় ছদ্মনামে লিখবেন। তারপর পাঠক ও লেখকদের প্রতিক্রিয়া দেখে স্বনামে লিখবেন।

আমি এই পর্যন্ত শুনে উঠে পড়লাম। কলেজ যাবার সময় হয়ে গিয়েছে।

১২

পরের দিন অফিসে যেতেই মন্তুদা বললেন, ভানু তোমার কাজ বাড়ল কিন্তু।

আমি বললাম, কী কাজ।

এখানকার অর্থাৎ মিত্র ও ঘোষের পাবলিকেশনের কাজ-এর সঙ্গে তোমাকে কথাসাহিত্যের লেখাগুলিরও হিসেব রাখতে হবে। তিনটে ফাইল

আনিয়ে নাও কেষ্টকে দিয়ে। একটা কবিতার, একটা প্রবন্ধের আর একটা গল্পের। বিজ্ঞাপনের ফাইলটা আমি রাখব।

আমি বললাম, তাহলে তো একটা জায়গা চাই ফাইলগুলো রাখার।

মন্তুদা বললেন, নিচের এই চেস্ট ড্রয়ারটা তুমি নিয়ে নাও। এখানেই সব রাখবে। আর একটা খাতা করবে, প্রেসে যে সব লেখা ছাপার জন্যে যাবে, সেগুলো লিখে রাখবে।

আমরা কথা বলতে বলতেই সংস্কৃত কলেজ থেকে বিখ্যাত অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মশাই এসে কাউন্টারে কালিদাসবাবুর জায়গায় বসলেন। সোনালী ফ্রেমের চশমা, আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি, ফিনফিনে ধুতি, দেখলেই মনে হয় খুব শৌখিন মানুষ। 'এ পেয়ার অফ ব্লু আইজে'র লেখিকা চারুপমা বসু এঁরই ছাত্রী।

ইতিমধ্যে গজেনবাবু সুমথবাবুরা এসে পড়লেন। আসন্ন-প্রকাশ *কথাসাহিত্য* পত্রিকা নিয়ে কথা উঠল। সুশীলবাবু খুব উৎসাহী। বললেন, খুব ভালো কথা। আমি কবিতা প্রবন্ধ দুইই লিখব।

এমন সময়ে সজনীবাবু এসে পড়লেন, ভেতরের দরজা দিয়ে। সুশীলবাবুকে যেন দেখলেনই না, বললেন, গজেন, এবারের শনিবারের চিঠি দেখেছ?

সজনীকান্ত দাস
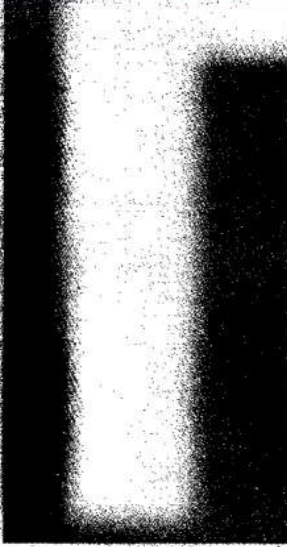
কাকাবাবু বললেন, আপনি তো একেবারে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন। সুনীতিবাবু পর্যন্ত এসে বলে গেলেন।

সজনীবাবু বললেন, এই হচ্ছে তথাকথিত আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের ফসল।

সুশীলবাবুকে সজনীবাবু দেখেও দেখছেন না। সুশীলবাবু যেন গায়ে পড়েই বললেন—সজনীবাবু একটা ভালো খবর আছে। গজেনবাবুরা একটা সাহিত্যপত্রিকা মাসে মাসে বার করবেন ঠিক করেছেন।

সজনীবাবু এবার সুশীলবাবুর দিকে তাকিয়ে কিছুটা রুক্ষ সুরে বললেন, আমার কাছে কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ভালো খবর নেই।

সুশীলবাবু একটু থতমত খেয়ে বললেন, কেন, কেন, আমি কী করলাম?

সজনীবাবু এবার একটু রাগত স্বরে বললেন, কেন, আপনি সাহিত্য পরিষদে গিয়ে বলেন নি, সজনীবাবু ব্রজেনবাবু যে সব বইয়ের ওপর কাজ করেছেন, সেগুলির এমন অবস্থা যে পরবর্তী গবেষকরা কাজ করতে পারবেন না আর। তার মানে দাঁড়ায়, আমরা গবেষণার পর বইগুলি খারাপ করে দিয়েছি, যাতে আর কেউ না ব্যবহার করতে পারে, তাই তো? আপনি কি খাতা খুলে দেখেছেন আমাদের পরে আরও কতজন ঐসব বই নিয়েছে? ব্যবহার করেছে?

মোহিতলাল মজুমদার

সুশীলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, আমি তা বোঝাতে চাই নি।

সজনীবাবু সুশীলবাবুর কথাই শুনতে চাইলেন না, বললেন, আমি যদি বলি আপনার ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা এত বেশি কেন, তাহলে কী জবাব দেবেন? আপনার চরিত্রে এতে কালি পড়ে কি না? যাই হোক্, এ নিয়ে আমার কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হয় না। চলি গজেন, তোমাদের পত্রিকা বেরোচ্ছে, আমি আগেই শুনেছি, উইশ্ ইউ গুড লাক্।

সজনীবাবু চলে যাওয়ার পর সুশীলবাবু অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন। আব্হাওয়া হাল্কা করার জন্য সুমথকাকা বললেন—সুশীলবাবু একটু চা চলবে?

সুশীলবাবু মুখ তুলে বললেন, তা চলতে পারে।

তার পর বললেন, গজেনবাবু, মোহিতবাবু—আমাদের মোহিতলাল মজুমদার তো ঠিকই বলেছিলেন, আপনি গজেনদের দোকানে গিয়ে বসেন বসুন, তবে মনে রাখবেন, ওটা সজনীকান্ত দাসের একটা den।

কাকাবাবু হেসে বললেন, না না, এটা কারও den বা দুর্গ নয়। সাহিত্যের আড্ডাখানা বলতে পারেন। এমন তর্কবিতর্ক তো হামেশাই হচ্ছে। তবে কারও মন্তব্যে বা বক্তব্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। আর আমরা তো সজনীবাবুর কোনো বই-ই ছাপি নি। গৌরী ছেপেছে বরং *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*।

১৯৪৯ এর পুজোর আগেই বেরোল কথাসাহিত্য'র প্রথম সংখ্যা। কার্তিক ১৩৫৬য়। তদবধি কথাসাহিত্যের পুজো সংখ্যা প্রত্যেক বছর হয় কার্তিকে। কার্তিক থেকেই বর্ষারম্ভ। প্রথম সংখ্যার লেখকরা ছিলেন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গল্প), প্রবোধকুমার সান্যাল (ধারাবাহিক), প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (ধারাবাহিক), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ধারাবাহিক), ত্রিশঙ্কু (রম্যরচনা), নিজস্ব সংবাদদাতা (সাহিত্য সংবাদ)। শেষের দুটি লেখা গৌরীদার। বিজ্ঞাপন ছিল কভারে হিমকল্যাণ কেশ তৈল, এম সি সরকার, ভিতরে বীণা লাইব্রেরি, বিমলারঞ্জন প্রকাশন, মিত্র ও ঘোষ, মিত্রালয়, শ্রীগুরু লাইব্রেরি ও ডি. এন. বসুর হোসিয়ারি। চার পৃষ্ঠার কভার ধরে মোট চল্লিশ পৃষ্ঠার কাগজ।

১৩
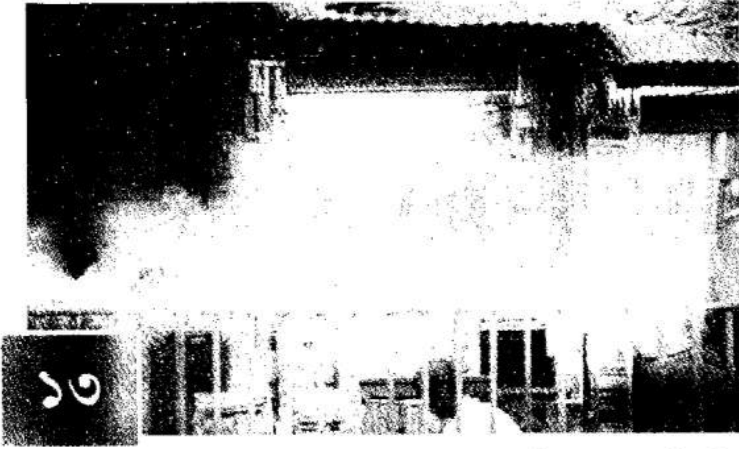
কলেজ স্ট্রীট-বইপাড়ার প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতার বিবরণ আগে দিয়েছি। উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা থেকে কিছু পুস্তক বিক্রেতা নিয়মিত বই কিনতে আসতেন কলকাতায়। উত্তরে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে অনেকগুলি নামী ও প্রাচীন পুস্তক প্রকাশক ছিলেন। এঁরা নিজেরা বই প্রকাশ করতেন আবার অপরের প্রকাশিত বইও কিনে এনে বিক্রি করতেন। অনেক পাঠাগার স্কুল কলেজ এঁদের বাঁধা খরিদ্দার ছিলেন।

এঁদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় শ্রীগুরু লাইব্রেরির। এঁদের ধর্মপুস্তক ও কিছু প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ ছিল, পুরাণ জাতীয়। পাঠ্য বই ও ছোটদের বই গল্প কাহিনী ছাপতেন। এঁদের প্রতিষ্ঠাতা ভুবনমোহন মজুমদার প্রথম জীবনে সাইকেলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ঘুরে খরিদ্দার যোগাড় করতেন। মিত্র ও ঘোষের যখন কাউন্টার হয় নি, তখন আমাদের বই এখানে জমা দেওয়া হত। বিক্রির পর দাম কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতেন, কোনোদিন ভুল বোঝাবুঝি হয় নি। আমি যখন বইপাড়ায় কাজে যোগ দিলাম, তখন ভুবনবাবু অবশ্য বেশ প্রবীণ। ভুবনবাবুদের দেশ ছিল চাঁদপুরে। বাংলাদেশ হবার পর পূর্ববঙ্গের যতগুলি জেলায় গেছি চাঁদপুর-কুমিল্লার ভাষা-বুলি আমার সব থেকে মিষ্টি লেগেছে।

শ্রীগুরু লাইব্রেরিতে ভুবনবাবুর ভাইয়েরাও কাজকর্ম দেখতেন। এঁদের এক ভাই প্রণববাবুর সঙ্গে গজেনবাবুর শ্যালিকার বিবাহ হয়।

অনুরূপা দেবী

নিরুপমা দেবী

শ্রীগুরু লাইব্রেরির কথা এত বললাম, এঁদের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক ছিল বলে। এই অঞ্চলে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকাশক হলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্‌স। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্‌স থেকে শরৎচন্দ্রের সব বই বেরোত। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ লেখকদের প্রকাশক ছিলেন এই সংস্থা। তখনকার দিনের অন্যতম মাসিক সাহিত্যপত্র *ভারতবর্ষ* এঁরাই প্রকাশ করতেন।

কবিতার বই রজনীকান্ত সেন-এর *বাণী* ও *কল্যাণী* দুটি গান/কবিতার বই এঁদের ছিল। এঁদের তালিকায় নবীন লেখকদের অন্যতম ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

আমি একবার আমাদের কাছে আসা একটি অর্ডারের তালিকার বই কিনতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্‌সে যাই। মন্তুদা হরিদাসবাবুর নামে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, যদি কিছু বেশি কমিশন হয়। তখন গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি বইয়ে কমিশন ছিল শতকরা পনেরো টাকা, একই রকম বই পাঁচ কপি নিলে শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা এবং একই রকম বই দশ কপি নিলে শতকরা কুড়ি টাকা—এই ছিল সর্বোচ্চ কমিশন।

আমি মন্তুদার চিঠি ওঁদের কাউন্টারে দিলে, কাউন্টারের ভদ্রলোক হরিদাসবাবুকে চিঠিটা দিতে বললেন। হরিদাসবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, এত কম বইয়ে বেশি কমিশন কী করে হয়? কে এনেছেন চিঠি?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি।

হরিদাসবাবু আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, আপনি নতুন এসেছেন?

বললাম, হ্যাঁ।

হরিদাসবাবু বললেন, গজেন-সুমথ ভালো আছে?

আমি উত্তরে ঘাড় নাড়লাম।

হরিদাসবাবুর এমনই কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব যে বেশি কথা বলতে সাহস হল না।

পরে শুনেছি, শরৎচন্দ্রও সমীহ করে কথা বলতেন হরিদাসবাবুকে। একবার নিজের বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে অনেক ভুল দেখে মৃদুস্বরে শুধুমাত্র বলেছিলেন, ও হরিদাস, এ যে আমার লেখাই মনে হয় না।

শোনা যায় একমাত্র অনুরূপা দেবী সমীহ করতেন না হরিদাসবাবুকে। অনুরূপা দেবী যা কাগজ পেতেন তাতেই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতেন। হ্যান্ডবিলের কাগজও বাদ যেত না। হরিদাসবাবু একবার বলেন, এই সব কাগজে পাণ্ডুলিপি তৈরি করলে লেখা ছাপতে পারবেন না। তাতে অনুরূপা দেবী জবাব দিয়েছিলেন, আমার বই ছাপতে হলে আমি যে কাগজে লিখব, তাই ছাপতে হবে, নয়তো আমার লেখা পাবেন না। অনুরূপা দেবীকে সেকালে বাংলা সাহিত্যের সম্রাজ্ঞী বলা হত।

হরিদাসবাবু কান্তকবির *বাণী ও কল্যাণী* মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনেছিলেন। *বাণী ও কল্যাণী* স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে খুব বিক্রি হয়েছিল। রজনীকান্ত যখন রোগশয্যায়, তখন কিন্তু প্রকাশক কিছু সাহায্য করেন নি। সে সময় তো কপিরাইট বিক্রির রেওয়াজ ছিল, আর কপিরাইট বিক্রি মানে সর্বস্বত্ব বিক্রি করে দেওয়া। প্রবোধকুমার সান্যাল খুব অল্পমূল্যে তিনটি গল্পের বই ও *প্রিয়বান্ধবী* উপন্যাসটি মাত্র দুশো টাকায় কপিরাইট বিক্রি করেন। পরে চলচ্চিত্র হলে যখন কিছু টাকা চাইতে যান, প্রকাশক নাকি বলেছিলেন, কোনো জমি বিক্রির পর যদি জমিতে তেলের খনি বেরোয়, তাহলে সে খনির মালিক কে হয়? বর্তমান মালিক না আগের মালিক? হরিদাসবাবুর এই অনমনীয় মনোভাবের জন্য অনেক লেখক এখান থেকে পরবর্তীকালে সরে যান।

হরিদাসবাবু কিছুক্ষণ পরে আমাকে বললেন, আপনি একটু বসুন, ওই সাড়ে সতেরো টাকার বেশী কমিশন দেওয়া যাবে না, বলে দেবেন। ক্যাশমেমো হলে আপনাকে জানাবে।

এমন সময়ে এক তরুণ রাগতভাবে হরিদাসবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি ওপরে আপনাদের *ভারতবর্ষ* পত্রিকার অফিসে এসেছিলাম, কিন্তু এটা কীরকম ব্যবহার বলতে পারেন?

কীরকম ব্যবহার বলুন? হরিদাসবাবুর শান্ত নির্বিকার জিজ্ঞাসা।

তরুণ আরও উত্তেজিত রাগত ভাবে বললেন, এই দেখুন আপনাদের সম্পাদক মশাই আমার একটা লেখা হারিয়ে ফেলেছিলেন, পরে চিঠি দিয়ে জানান, লেখাটি পেয়েছেন, মনোনীত হয় নি, আজ যেন নিয়ে যাই। এই চিঠি দিয়েছিলেন, আজ ফেরত নেবার কথা। এখন বলছেন, টেবিলে এনে রেখেছিলেন, আবার কোথায় ঢুকে গেছে, খুঁজে পাচ্ছেন না। এমন অপদার্থ লোককে আপনারা রাখেন কেন?

হরিদাসবাবু পাথরের মতো নির্বিকার ভাবে বললেন, আপনার লেখা এখান থেকে কেউ চেয়েছিল? সম্পাদক চেয়েছিলেন?

তরুণটি থতমত খেয়ে বললেন, না তা কেন? আমিই পাঠিয়েছিলাম।

হরিদাসবাবু সেইরকম পাথরের স্বরে বললেন, কেউ চায় নি, যেচে পাঠিয়েছেন, লেখা মনোনীত হয় নি, আবার তাই নিয়ে পদার্থ-অপদার্থ বিচার করছেন? আর এক মিনিট আমার সময় নষ্ট করবেন না। যান, পথ দেখুন।

কাজী নজরুল ইসলাম

অন্নদাশঙ্কর রায়
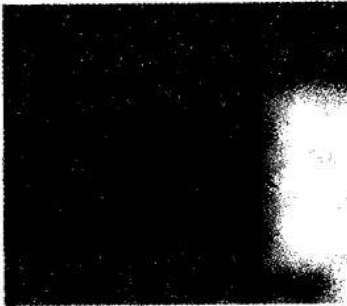
তরুণটি হতভম্ব হয়ে ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে গেলেন। হরিদাসবাবু নির্বিকার ভাবে আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্‌স ছাড়া এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সংস্থা ছিলেন। শ্রীমানী মার্কেটের কাছে বরেন্দ্র লাইব্রেরি, দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, নৃত্যলাল শীল লাইব্রেরি প্রভৃতির বেশ নাম ছিল। উল্টোদিকে ছিল বুক এম্পোরিয়াম ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এখন নাম হয়েছে বিধান সরণী। এই বিধান সরণীর উপর বিবেকানন্দ রোডের মাথায় দুটি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা এখনও বর্তমান—ডি. এম. লাইব্রেরি ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার বইয়ের প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা রূপে প্রসিদ্ধ। ডি. এম. লাইব্রেরি নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের প্রকাশক ছিলেন। এঁদের যোগাযোগ ছিল অসংখ্য পাঠাগার ও কলেজ লাইব্রেরির সঙ্গে। বিভিন্ন প্রকাশকের বই বেশি কমিশনে কিনে শতকরা

সাড়ে বারো টাকা হারে সরবরাহ করতেন। আগে এই ব্যবসাটা ছিল শুনেছি শ্রীগুরু লাইব্রেরির। তবে আমি গিয়ে দেখেছি, ডি. এম. লাইব্রেরির এই ব্যবসায়ে অনেক বেশী বিস্তৃতি।

ডি. এম. লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার গোপালদাস মজুমদার এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। গরমের দিনে কৃষ্ণকায় শরীরে খালি গায়ে কাউন্টারে বসতেন। গরম বোধ হলে ধুতির কষি আলগা করে দিতেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে র‍্যাক থেকে বই পাড়বার সময়ে সে কথা খেয়াল থাকত না। অবস্থা প্রায়ই বেসামাল হয়ে যেত। এই নিয়ে বন্ধু লেখকেরা প্রায়ই ঠাট্টা তামাশা করতেন। গোপালবাবুর কথাবার্তায় সরসতা থাকতো না বিশেষ। কোনো লাইব্রেরি বই কিনতে গিয়ে কমিশন বাড়াবার জন্য বললে, কিছুতেই বাড়াতেন না। ঝগড়ার উপক্রম হলেও নিজের জেদ বজায় রাখতেন। আবার বৃষ্টি নেমে গেলে সেই লাইব্রেরি ক্রেতাকে দশ টাকার মিষ্টি খাওয়াতেন। লাইব্রেরির লোক বলতেন, এই দশ টাকা তো কমিশনই দিতে পারতেন। গোপালবাবু অম্লানবদনে বলতেন, ওটা ব্যবসা, এটা আতিথেয়তা, দুটো আলাদা ব্যাপার।

গোপালবাবুর এই সব ব্যাপার অনেক সময় সামাল দিতে হত তাঁর ভাই অমূল্যবাবুকে। ওঁর ডাক নাম ছিল ভন্তুবাবু। একবার এক লাইব্রেরি থেকে দুইজন ব্যক্তি এসেছেন। বই দেখে বেছে কিনবেন। দুজনেরই হাতে বই বহন করার থলি। গোপালবাবু বললেন, যান ভেতরে যান। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও ভন্তু, এঁরা বই দেখে কিনবেন, যোগরঞ্জনকে (এক কর্মচারী) বলো সব নতুন বই দেখাতে, আর দেখো সাবধান, এঁদের দুটো থলে আছে।

লাইব্রেরির লোকেরা চটে উঠলেন। তার মানে? আমরা বই চুরি করব? থলে আছে সাবধান এ সব কথার মানে কি?

গোপালবাবু বললেন, আচ্ছা কি মুশকিল, আপনাদের তো কিছু বলি নি, অনেকের এই বদভ্যাস আছে তাই আমার ভাইকে সাবধান করেছি।

লাইব্রেরির লোকেরাও তেমনি, তারা আর ঢুকবে না, বইও কিনবে না। শেষে অমূল্যবাবু অর্থাৎ ভাই ভন্তুবাবু অবস্থা সামাল দেন।

বিমল কর আমায় একবার বলেছিলেন, গোপালবাবু এক অদ্ভুত চরিত্র। গিয়ে বললাম, গোপালদা, আমার পাঁচ হাজার টাকার দরকার, দেবেন?

গোপালদা অদ্ভুত শান্ত স্বরে বললেন, দেবো, ম্যানাসক্রিপ্ট দাও।

বিমলদা বলেছিলেন, সে তো দেবোই।

গোপালদা নাকি বলেছিলেন, ও হবে না, আমি টাকা দিয়ে তোমার পিছনে দৌড়ব, তা চলবে না। এক হাতে ম্যানাসক্রিপ্ট, আর এক হাতে টাকা।

বিমল করের *দেওয়াল* উপন্যাস প্রথম ছেপেছিলেন ডি. এম. লাইব্রেরি। গোপালদাস মজুমদারের এই মরুভূমি-সদৃশ আপাত-রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে একটি আশ্চর্য মরূদ্যান ছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশ বসুকে নিয়ে গোপালবাবুর কাছে আসেন। তখন সমরেশ বসু সবে খ্যাতির পথে উঠছেন, কিন্তু চটকলের চাকরি চলে যাওয়ায় নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন। সমরেশবাবু একটি উপন্যাস লিখে দেবেন এই প্রতিশ্রুতিতেই নারায়ণবাবুর কথায় গোপালদাসবাবু সমরেশকে পাঁচ শত টাকা অগ্রিম দেন। এ কথা পরে নারায়ণবাবুর কাছেই শুনেছিলাম।

ডি. এম. লাইব্রেরির আরও উত্তরে বৈকুণ্ঠ বুক হাউসও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। তবে এঁরা সাধারণত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা। এর উত্তর-পশ্চিমে বটতলার সব বইয়ের দোকান। আর এখানেই আজও অবস্থান করছে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পি. এম. বাগচী এন্ড কোং। কালি, টাইপ ফাউন্ড্রি, ছাপাখানা, পাঁজি, ধর্মপুস্তক—এত রকম কাজ-কারবার এক ছাতার নিচে।

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া এবং বিবেকানন্দ রোড-বিধান সরণী এলাকার প্রায় মধ্যস্থলে ছিলেন এবং এখনও আছেন দেব সাহিত্য কুটির। এঁদের প্রকাশনা ছোটদের বই, পূজাবার্ষিকী এবং ডিক্‌শনারী ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। বর্ণপরিচয় রিসিভার সংস্করণ এঁদের হাতেই ছিল। এর কাছেই বেনেটোলায় গুপ্তপ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন। কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যগ্রন্থও ছিল। এখন পাঁজি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

সেল্‌স্ কাউন্টার বলতে বোঝায় যে টেবিলে বই বিক্রি হয়। কিন্তু আমার এখানে কাজ করতে করতে মনে হল, এই কাউন্টারের পিছনেও একটা অদৃশ্য কাউন্টার আছে। তা না হলে এত অজানা মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে কী করে। শিলং, গৌহাটি, এলাহাবাদ, দিল্লী, লখনৌ, জামসেদপুর, কটক, বোম্বাই, মাদ্রাজ থেকে লোকে বই চেয়ে পাঠায়। পাকিস্তানের ময়মনসিং জেলার ওসমানি এন্ড কোং, চট্টগ্রামের কোহিনুর লাইব্রেরি, মিলাত লাইব্রেরি, সিলেটের চন্দ্রনাথ লাইব্রেরি, আদিল ব্রাদার্স, কটন লাইব্রেরি, ঢাকার পাঁচ-ছটি দোকান নিয়মিত অর্ডার দেয় পাকিস্তান হবার পরও। কোনো কোনো বাইরের দোকানের মালিকের সঙ্গে মন্তুদার খুব হৃদ্য সম্পর্ক দেখলাম। জামসেদপুরের সান্যাল কোম্পানির বিশ্বনাথ সান্যাল, লখনৌ-র শ্রীকৃষ্ণ বুক হাউসের সত্যব্রত করঞ্জাই এখানে এলেই মন্তুদার সঙ্গে একাধিকবার দেখা করতেন।

কথাসাহিত্য পত্রিকা বেরোবার পর আমার ওপর কিছু বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ল। লেখার হিসেব রাখা, পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া, প্রুফ দেওয়া নেওয়া সব ভার, মন্তুদা বললেন, তোর ওপর রইল। এদিকটা আমি সামলাবো।

গল্প প্রবন্ধ কাকাবাবু সুমথকাকা দেখতেন। কবিতা নির্বাচনের ভার ছিল

কৃষ্ণদয়াল বসুর ওপর। পরবর্তীকালে নাম শোনা যায় না, এমন অনেক লেখক লিখতেন। চরণদাস ঘোষের *নিরক্ষর* উপন্যাসের চারটে সংস্করণ হয়েছিল। রামপদ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল। এঁদের কথা এখন কেউ বলে না। হাসিরাশি দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এঁরাও স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। যাই হোক, এই সঙ্গে প্রুফ দেখাও আমাকে শিখতে হল। মাস্টারমশাই কৃষ্ণদয়ালবাবুই শেখালেন। আমাকে বললেন, তুমি প্রথম প্রুফটা দেখবে, আমি দ্বিতীয়টা, তৃতীয় প্রুফে তুমি সংশোধন মিলিয়ে আর একবার ফ্রী রিডিং দেবে।

কথাসাহিত্যের প্রুফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকাশনেরও কিছু কিছু বইয়ের প্রুফ দেখার ভার পড়ল আমার ওপর। এসবের জন্য মাইনে ছাড়াও আমার কিছু বাড়তি রোজগার হল। আমাদের প্রধান প্রুফরীডার ছিলেন কবি কৃষ্ণদয়াল বসু। বাইরের আরও কেউ কেউ প্রুফ দেখতেন। বিশ্বভারতীর রামেশ্বর দে তাঁদের অন্যতম। তখন তিনরকম আকার ছিল বইয়ের। ডবল ক্রাউন ১/১৬, ইম্পিরিয়াল ১/১৬, ডবল ডিমাই ১/১৬। অফসেট প্রেস তখনও আসে নি। হাতে কম্পোজ, প্রতি সংস্করণ বা মুদ্রণে নূতন কম্পোজ ও প্রুফ দেখা আবশ্যিক ছিল। ডবল ক্রাউন এক টাকা, ইম্পিরিয়াল পাঁচ সিকা, ডবল ডিমাই দেড় টাকা প্রতি ফর্মা অর্থাৎ ষোল পাতা এই ছিল প্রুফ দেখার পারিশ্রমিক। প্রেসে কম্পোজের হার ছিল ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা বাইশ থেকে আটাশ টাকা, ইম্পিরিয়াল বত্রিশ টাকা, ডবল ডিমাই ছত্রিশ টাকা। কাগজের রীম যথাক্রমে বাইশ টাকা, আটাশ টাকা, ছত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। এখন দাম শুনে মনে হয়, কত সস্তা, কিন্তু তখন টাকারও যে দাম ছিল, সেটা ভুলে যাই।

রামেশ্বরবাবু একবার ইম্পিরিয়াল বইয়ের প্রুফ দেখলেন। খাটুনির কাজ ছিল। কাকাবাবু মন্তুদাকে বললেন, মন্তু, ওটা ডবল ডিমাইয়ের রেট দিও, অর্থাৎ দেড় টাকা হারে।

রামেশ্বরবাবু কিন্তু নিলেন না, না না ওটা ইম্পিরিয়াল সাইজের বই, পাঁচ সিকে হারেই দিও, খাটুনি কোনো বইয়ে কম হবে বেশি হবে, তাতে কি।

এই সব মানুষ আজকাল হারিয়ে গেছেন। রামেশ্বরবাবু বিশ্বভারতীর প্রুফ দেখতেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও পুলিনবিহারী সেন ওঁর উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন। বিশ্বভারতীতে নিয়মিত আসার কখনও অন্যথা হয় নি। ওঁর ছেলে টাইফয়েডে ভুগছিল। তখন তাঁর হাতে জরুরী বইয়ের

প্রুফ দেখার ভার। পাশের সহকর্মী একদিন জিজ্ঞেস করলেন, রামেশ্বরদা, ছেলে কেমন আছে? রামেশ্বরবাবু কাজ করতে করতেই বললেন, কাল মারা গেল ভাই, আর বাঁচানো গেল না। শ্মশানে দাহ করেই স্নান সেরে এখানে এসেছি। এই প্রুফগুলি আজই ছাড়া দরকার তাই।

সহকর্মী আর কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারলেন না।

প্রুফ দেখায় কৃষ্ণদয়ালবাবুর খ্যাতি এমনই ছিল যে বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে একবার *সঞ্চয়িতা* গ্রন্থের ফাইনাল প্রুফ দেখার ভার দেওয়া হয়। উনি একটি কবিতায় দুই অক্ষরের একটি শব্দ বাদ পড়ে গেছে বলে পুলিনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পুলিনবাবু বললেন, তা কি করে হয়, আমাদের দু-দুবার কপি ধরে প্রুফ দেখা হয়, একজন পড়ে আর একজন মেলায়। কিন্তু কৃষ্ণদয়ালবাবু তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। বহু পুরাতন *সঞ্চয়িতা*র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল কৃষ্ণদয়ালবাবুই ঠিক। শব্দ ছাড় গেছে। এই ঘটনার অনেক পরে রাজশেখরবাবু যখন তাঁর *চলন্তিকা* অভিধানের নূতন সংস্করণ করলেন, তখন কৃষ্ণদয়ালবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন।
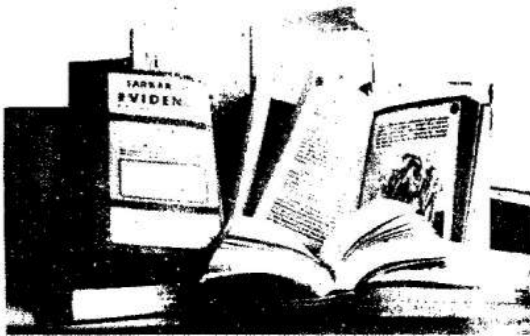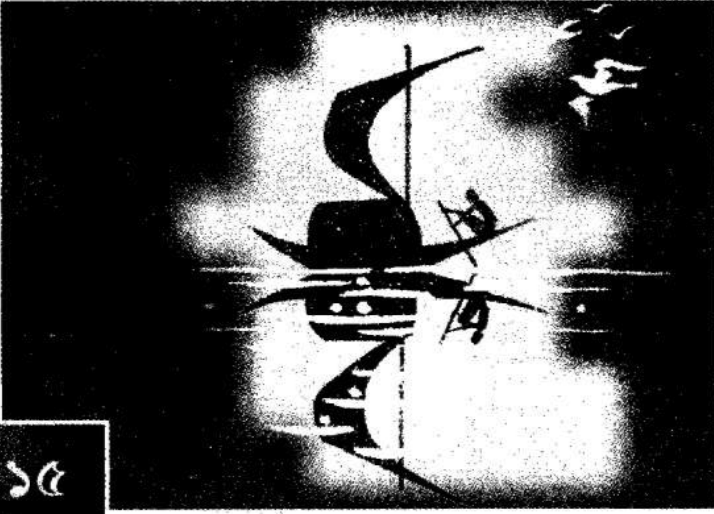
১৫

কথাসাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সমসময়ে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। সত্যযুগ। এর পরিচালক ছিলেন শিল্পপতি ডালমিয়া, এঁর বীমার ব্যবসায়ও ছিল। তখনও বীমা জাতীয়করণ হয় নি। সত্যযুগ পত্রিকায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ একাধিক কবি সাহিত্যিক যোগ দিলেন সাংবাদিক হিসেবে। সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই সত্যযুগ পত্রিকা চার বছর মতো চলেছিল। এখানকার অনেক সাংবাদিক পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। 'সত্যযুগ' পত্রিকার নাম উল্লেখের কারণ এখানকার অনেক লেখকের বই মিত্র ও ঘোষ এবং মিত্রালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গৌরকিশোর ও গৌরীশঙ্কর পরে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়েছিলেন।

আমাদের কথাসাহিত্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস *ইছামতী* ছাপা হচ্ছিল। *ইছামতী*র প্রথম অংশ 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় ছাপা হয়। 'অভ্যুদয়' বন্ধ হয়ে গেলে বাকী অংশ বিভূতিবাবু ঘাটশিলা থেকে বিভিন্ন কিস্তিতে লিখে লিখে গৌরীদার নামে পাঠাতেন। *ইছামতী* গৌরীদার মিত্রালয় থেকে ছাপা হচ্ছিল। অদ্ভুত ভাবে আসত পাণ্ডুলিপি। ভাঁজ করে সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা। কোনো বাড়তি

কাগজ নেই। পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠার উল্টো দিকে সাদা পিঠে গৌরীদার নাম, মিত্রালয়ের ঠিকানা লেখা। ডাক টিকিট থাকত না। গৌরীদাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, বেয়ারিং চিঠি ঠিক ঠিক পৌঁছয় বড়দার বিশ্বাস, ডাকবিভাগ নিজের গরজে বেয়ারিং চিঠির বেশি দাম আদায় করে। হারাবার ভয় থাকে না।

ঐভাবেই কিন্তু গোটা পাণ্ডুলিপি এল ও বই ছাপা হল। *ইছামতী*র প্রথম প্রুফ দেখতেন কাকাবাবু অর্থাৎ গজেনবাবু। উনি বিভূতিবাবুর হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আর ফাইনাল দেখতেন কৃষ্ণদয়ালবাবু।

ইছামতী বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। গ্রামবাংলার ছবি, নীলকরদের দাপটের সময়ের সমাজচিত্র এমন নিখুঁত ভাবে উপন্যাসে আগে কেউ আঁকেন নি। *ইছামতী* বেরোবার পর বিভূতিবাবু এসেছেন। আড্ডায় গজেনবাবু সুমথবাবু ছাড়া কালিদাসবাবু প্রবোধবাবুও আছেন। বিভূতিভূষণ কবিশেখরকে, গজেনবাবুকে একটি করে বই স্বাক্ষর করে উপহার দিলেন। প্রবোধবাবু বললেন, বাঃ আমাকে দেবে না? বিভূতিবাবু বললেন, অবশ্যই দেবো। তবে তোমাকে তো আমাদের থেকে সবাই বেশি চেনে। নিজের কথাকেই সমর্থন করে আবার

বললেন, কী গজেনবাবু, বোম্বের সাহিত্য সম্মেলনে দেখি নি? সবাই প্রবোধ সান্যাল প্রবোধ সান্যাল করছে, আমাদের কেউ পোঁছেই না!

অবস্থাটা সত্য সত্যই তখন এরকম ছিল। প্রবোধবাবুর *আমিরী, প্রিয়বান্ধবী* চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা প্রবোধবাবুর নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল।

প্রবোধবাবু ততক্ষণে *ইছামতী* উপন্যাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে চমকে উঠেছেন। বললেন, বিভূতি, তুমি নীলকরদের মুখের এই ইংরেজি সংলাপ কোথায় পেলে? এ তো খাস ইংরেজ বুলি!

বিভূতিবাবু বললেন, কোথায় আর পাবো? এত ইংরেজি বই পড়েছি ডিকেন্‌স, স্কট্, থ্যাচারের। সেই সব ভেবে বানিয়ে লিখেছি।

প্রবোধবাবু বললেন, এ তো অবিকল ইংরেজি বুলি, কোত্থেকে নিয়েছ সত্যি বল বিভূতি। আমি ছোটবেলায় মিশনারী স্কুলে পড়েছি। এত ভালো ইংরেজি আমিও পারতাম না লিখতে। সত্যি বলছি।

বিভূতিবাবু হেসে বললেন, ঘাটশিলায় বসে লেখা, সেখানে কোথায় বা লাইব্রেরি, কোথায় বা বই।

ততক্ষণে কালিদাসবাবু সে-সব সংলাপের জায়গা খুলেছেন। মন দিয়ে পড়ছেন, তারপর যে কথাটি বললেন, তা আজও অক্ষয় ফ্রেমে বাঁধানো আছে স্মৃতিতে।

কালিদাসবাবু বললেন, এই ইংরেজি যারা মন দিয়ে স্কুলে পড়েছে আর সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছে, তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। আমরা তখন স্কুলে ইংরেজি পড়তাম। বাড়িতে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত। তাইতেই ভালো বাংলা শিখেছি।

ইছামতী উপন্যাসের কিছু ইংরেজি সংলাপ প্রবোধবাবু ভরাট কণ্ঠে পড়ে শোনালেন।

"শিপটন সাহেব ভয়ানক রেগে বলে উঠলেন—The devil that is! I will come in with you this time. Will you like to come on a mouse-hunt to-morrow morning?

—Sure I will.

—I wonder whether I ever told you these thieving people drove off some of our horses from the village?

—My stomach! you never did.

—Well, be ready to-morrow morning. May be we would kill off the mice right away.

Sure."

এরপর কথায় কথায় বিভূতিবাবু বললেন, গজেনবাবু, কথাসাহিত্য তো ভালোই চলছে। তারাশঙ্কর প্রবোধ প্রমোদবাবু ধারাবাহিক লিখছেন, কালীদা লিখছেন।

কাকাবাবু বললেন, তা আপনি লিখুন না, *'অপরাজিত'*র পরের অংশ লিখবেন বলছিলেন, লিখুন না।

বিভূতিবাবু বললেন, একটু ভেবে নিই, সামনে পুজোর পর থেকে ধরব। গজেনবাবু একটা কাজ করুন না, আমাদের মধ্যে তারাশঙ্করের উপন্যাস ছোটগল্প সবই বেশি, নামও বেশি। ওর নামে একটা সংবর্ধনা সংখ্যা করুন।

কে যেন বললেন, বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। সংবর্ধনা পেতেই পারে।

প্রবোধবাবু বললেন, বাড়ি আমিও করেছি। তবে তারাশঙ্করের বাহাদুরি আছে। বৃহৎ সংসার নিয়ে আগাগোড়া সাহিত্য সংগ্রাম করে গেছে।

বিভূতিবাবু সোৎসাহে বললেন, আরে আমিও তো তাই বলি, আমাদেরই এক সতীর্থ সাহিত্য করে বাড়ি গাড়ি করেছে সংসার চালাচ্ছে, এ তো আমাদেরই গর্বের কথা।

তখনই স্থির হয়ে গেল আগামী শ্রাবণ সংখ্যা, তারাশঙ্করের জন্মদিন ৮ই শ্রাবণ, তারাশঙ্কর সংবর্ধনা সংখ্যা হয়ে বেরোবে। ঠিক এই সময়েই সজনীবাবু, সজনীকান্ত দাস এসে ঢুকলেন। প্রবোধবাবু সোল্লাসে বলে উঠলেন, এইবার নরক গুলজার হবে।

সজনীবাবু হেসে বললেন, কেন বাবা, তোমার বন্ধুরা তো সে কাজ অনেকদিন ধরেই করছে।

প্রবোধবাবু বললেন, এই হচ্ছে সজনী, খোঁচা ছাড়া কথা বলতে পারে না। আরে শোন, এবার ৮ই শ্রাবণে কথাসাহিত্য তারাশঙ্কর সংবর্ধনা সংখ্যা বার করছে। আমি বলেছি, এটা খুব ভালো, তবে বিভূতিরও করা দরকার।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ সেটা হবে অঘ্রাণে।

সজনীবাবু বললেন, খুব ভালো, কোনো পত্রিকা থেকে সংবর্ধনা লেখককে, অভিনব সন্দেহ নেই। তোমাদের প্রচারেও সুবিধা হবে।

১৯৪৭ এর দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অল্পবিস্তর খুচখাচ চললেও বড় রকম গোলমাল ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু স্রোত থিতিয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৪৯-এর শেষে ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে হঠাৎ আবার একটা আলোড়ন উঠল। উদ্বাস্তু আগমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল যেন। স্টেশনের প্লাটফর্ম উদ্বাস্তুদের সংসারে ভর্তি। ট্রেন থেকে নেমে কোনো রকমে গা বাঁচিয়ে বেরোই। ফেরবার সময়েও তাই। এবার কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া দপ্তরীপাড়াতেও এর ছোঁয়াচ লাগল। এত হিন্দু উদ্বাস্তু আসছে, জীবিকা চাই তো। পূর্ববঙ্গের অনেক ছোটোখাটো প্রকাশক কোনোমতে কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায় ঢুকে ব্যবসা শুরু করলেন। যাঁদের পুঁজি কম, তাঁরা কাঠের র‍্যাক করে স্টল তৈরি শুরু করলেন। সেই শুরু হল, কলেজ স্কোয়ার অর্থাৎ পুরো গোলদিঘি ছোট বড় নানা আকারের স্টলের আড়ালে ঢাকা পড়া; দক্ষিণ ও পূর্ব দিক কাপড়ের, পোশাকের দোকানে আর উত্তর ও পশ্চিম দিক নতুন পুরোনো বইয়ের স্টলে ঢাকা পড়ল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে পুরাতন মহার্ঘ বই বিক্রি করতেন আমাদের চেনা কিছু পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা— ইউসুফ, রহমান। এঁদের কোণঠাসা করে সেখানেও স্টল বসে গেল। আগের পুরাতন বইয়ের দোকানে প্রায়ই দেখা যেতো সুনীতিবাবু, সুকুমারবাবুর

মতো পণ্ডিতরা দাঁড়িয়ে বা উবু হয়ে বসে বই দেখছেন। সে সব দৃশ্য এখন দুর্লভ হয়ে উঠল।

এই জীবিকার লড়াই দপ্তরীপাড়াতেও ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়ি কারখানা ধীরে ধীরে দখল নেবার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। যে পদ্ধতিতে তাঁদের পূর্ববঙ্গ থেকে হঠানো হয়েছে, এখানে সেই পদ্ধতি হিন্দুরা নিতে লাগলেন। আমাদের হল মুশকিল। যে সব মুসলমান দপ্তরী দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাসের সঙ্গে বুক দিয়ে বই ও ছাপা ফর্মার কাগজ আগলে রেখেছেন, তাঁদের পরিবর্তে নতুন হিন্দু মালিক বা তাঁদের কর্মচারীরা কতটা যত্নপরায়ণ হবেন, সে বিষয়ে প্রকাশকদের সন্দেহ ছিল। একজন হিন্দু দপ্তরী বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছিলেন। তাছাড়া সবাই ছিলেন মুসলমান ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত। বৈঠকখানা রোডের উত্তর দিক ধরে সোজা গেলে যে বিরাট মাঠ কোঠা, সেটাই ছিল মানিক মিঞার দপ্তরীখানা ও বাসস্থান। তাঁর ছেলে সালেক আসতেন আদায়পত্র করতে। তাঁরা একদিন এসে জানালেন, আর থাকতে পারছেন না। কারখানা বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। ঐ পাড়ার কাছাকাছি থাকতেন কংগ্রেস নেতা নৌশের আলি। তাঁর বাড়ির একটা বড় গুদাম ভাড়া নিয়ে সব ছাপা কাগজ সেখানে তোলা হল।

মানিক মিঞার দুজন বিশ্বাসী কর্মচারী সামসুর রহমান ও মাজেম আলি এসে কাকাবাবুদের বললেন, আপনারা যদি সাহায্য করেন তো আমরা একটা কারখানা করি। দেশে গিয়ে কোথায় কী করব?

সুমথকাকা বললেন, ভালোই তো, খোলো না। ছাপা ফর্মা তো নৌশের আলির বাড়িতে আছে।

৭ নম্বর পাটোয়ার বাগান লেনে তাঁদের কারখানা বসল। মাজেম ও সামসুর, পুরাতন হিন্দু দপ্তরী রামবাবু, তাঁর এক কর্মচারী রবি আলাদা কারখানা খুলেছিলেন; এঁরা সবাই মিলে বই বাঁধাতে লাগলেন। বাঁধাই বই সরবরাহ মোটামুটি বজায় রইল।

মন্তুদা একদিন বললেন, ভানু, তুই একবার দপ্তরীপাড়ায় যা। আমাদের বই যারা নিল সব ঠিকঠাক বই বাঁধছে কিনা, রেখেছে কিনা দেখা দরকার। একটু সাবধানে যাস, আবার নাকি গোলমাল শুরু হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভয় আমার বিশেষ ছিল না কোনোদিনই। আর রোজই তো যাই কলেজে, ঐ পথ দিয়েই। রামবাবু, রবির কারখানা হয়ে

মাজেম-সামসুরের কারখানায় গেলাম। বললাম, এলাম খবর নিতে, কেমন আছেন সব।

ওঁরা খুব খাতির করে বসালেন। মাটিতে চাটাই পেতে কাজ। যে কাঠের ডেস্কের মতো একটা টেবিলে ছাপা কাগজ ভাঁজাই হয়, তাকে দপ্তরীদের ভাষায় তক্তা বলে। একটা তক্তা মুছে আমাকে বসতে দিলেন। বললেন, একটু চা আনি।

আমি বললাম, এই তো চা খেয়ে বেরোলাম।

—তাহলে ডাব আনি, সামসুর বললেন।

আমি বললাম, চায়ের পর কি ডাব খাওয়া যায়! অম্বল হবে। এখন তো কলেজ যাবো।

মাজেম বললেন, তাহলে একটা ভালো সিগারেট এনে দ্যাও।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, না না, ও সব এখনও অভ্যেস হয় নি।

সামসুর দুঃখিত স্বরে বললেন, আপনি আমাদের খাতির করার একটা সুযোগ তো দেবেন!

এই মিষ্টি সংলাপ এখনও আমার কানে লেগে আছে। সেদিন থেকেই মাজেম সামসুর আমার আপনার জন হয়ে উঠলেন।

ছোটোখাটো দাঙ্গার কথা বলেছিলাম। সেগুলি আবার যেন শুরু হল। খবরের কাগজে উদ্বাস্তু আগমন স্রোত এমন ভাবেই বেরোতে লাগল এখানে হিন্দুরা উত্তেজিত হতে লাগলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আবার বিপন্ন হল। দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ, ট্রামে বাসে ট্রেনে সতর্কতা, অ্যাসিড বাল্ব ছোড়া—আবার দেখা দিল। কাউন্টার সকালে খুললেও তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে হত। কখন কারফিউ হয় ঠিক কি?

বাংলার উদ্বাস্তুদের অবস্থা নিয়ে সর্বাধিক সরব হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে সংবাদপত্রগুলি তাঁকে এডমন্ড বার্কের সঙ্গে তুলনা করেছিল। নেহরু প্যাটেল সবাই বিচলিত বোধ করেছিলেন তাঁর বক্তৃতায়।

বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে মানুষ পশুর জীবন যাপন করছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। স্টেশন চত্বর থেকে কত উদ্বাস্তু তরুণী হারিয়ে গেলেন।

সব থেকে নির্মম সত্য হল, উদ্বাস্তুদের মধ্যেই দালাল ও আড়কাঠি তৈরি হয়ে গেল। মানুষ পরস্পরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল।

এরই মধ্যে একদিন দুপুর বারোটা নাগাদ দেখা করতে এলেন *ছেলেদের বিদ্যাসাগর, ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, পুঁথিপুরাণের গল্প* প্রভৃতি কিশোর সাহিত্যের লেখক যামিনীকান্ত সোম। এঁরই অনুবাদ করা মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' *নীল পাখি* নামে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। যামিনীবাবু হেসে বললেন, এই তো গজেনবাবু, সব ভালো আছেন তো? দিল্লীতে ছিলাম। দেখতে এলাম সব কেমন আছেন, দাঙ্গাতে কারুর ক্ষতি হয় নি তো? তারপর বললেন, আচ্ছা গজেনবাবু, চেনা-জানা লোক তো দেখি সবাই বেঁচে আছে, তাহলে যে এত লোক তত লোক মরেছে শুনি, তাহলে মো'লো কারা?

যামিনীবাবুর এই কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। সুমথকাকা হেসে বললেন, ভালো বলেছেন, মর্মান্তিক হলেও খুবই সত্যি, চেনা জানা সবাই যখন বেঁচে তাহলে মো'লো কারা।

১৭
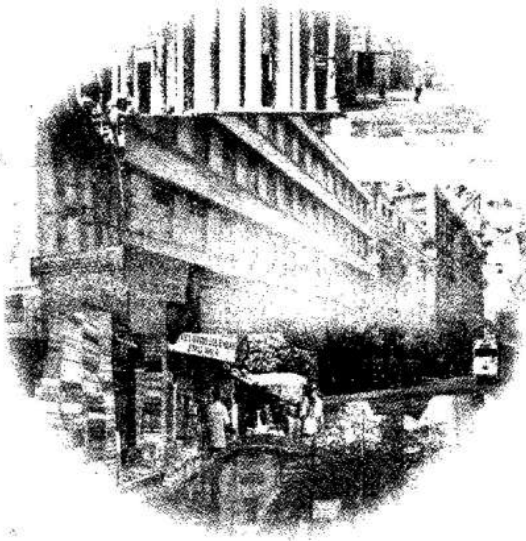
বাংলায় গান্ধী-সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, গান্ধীজীর লেখার অনুবাদ, তা এতাবৎকাল আমাদের প্রকাশনে ছিল না। *গান্ধীজীর অগ্নিপরীক্ষা* নামে একটি বই ছিল—গান্ধীজীর রাজনৈতিক সামাজিক সংগ্রাম নিয়ে। ১৯৪৯-এর শেষ দিকে জামশেদপুরের সান্যাল ব্রাদার্সের কর্ণধার বিশ্বনাথ স্যানাল ও তাঁর এক বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আমাদের অনুরোধ করলেন, গান্ধীজীর India of my Dreams-এর বাংলা অনুবাদটি আর দেরি না করে শীঘ্র ছেপে ফেলতে। আমি জানতাম না, ওখানকার ভূদান-কর্মী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটির অনুবাদ করে আগেই কাকাবাবুকে অর্থাৎ গজেনবাবুকে চিঠি নিয়েছেন। শৈলেশবাবু বাংলা অনুবাদের নাম দিয়েছিলেন *আমার ধ্যানের ভারত*।

একদিন শৈলেশবাবু এসে পাণ্ডুলিপি বুঝিয়ে দিলেন। বইয়ের নাম ঐটাই রইল—*আমার ধ্যানের ভারত*। সেই প্রথম শৈলেশবাবুকে দেখি। আমার থেকে সাত-আট বছরের বড়। দীর্ঘদেহী খাপখোলা তরোয়ালের মতো চেহারা। তখন কী জানতাম, তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠবে দীর্ঘকালের মধুর সম্পর্ক।

আমার ধ্যানের ভারত বইটির পর একে একে গান্ধী সাহিত্যের অনেকগুলি বই বেরোলো। সবই শৈলেশবাবুর অনুবাদ। শৈলেশবাবু দেশ

স্বাধীন হবার আগে কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করে গান্ধীজী ও বিনোবাজীর প্রদর্শিত সমাজকল্যাণ কর্মে যোগ দিয়েছিলেন।

এ-রাজ্যে তখন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন নিয়ে নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সরকার সংযত থাকতে বললেও সাংবাদিকরা উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থা দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না। যুগান্তর, দৈনিক বসুমতীর সাংবাদিকরা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। এই সময়ে সদ্য আগত উদ্বাস্তু মহলে যুগান্তর, বসুমতীর প্রচারসংখ্যা বহুল বেড়ে গেল। যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, আগরপাড়া, বিরাটি প্রভৃতি নবগঠিত উদ্বাস্তু কলোনিতে এই দুটি পত্রিকার চাহিদাবৃদ্ধি লক্ষণীয় হয়ে উঠল। যুগান্তর পত্রিকার দাম ছিল এক আনা। এখন দুই আনা দাম হল। অচিরে আনন্দবাজার পত্রিকার সমকক্ষ হয়ে উঠল। আনন্দবাজার পত্রিকার দাম আগে থেকেই দুই আনা হয়েছিল। দৈনিক বসুমতীর দাম অবশ্য বাড়েনি।

মণিমেলা সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ আমার ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। হাসানদা মাঝে মধ্যে যাও-বা আমাদের বাড়ি আসতেন, এই নতুন সৃষ্ট উত্তেজনায় তিনিও আসতে পারতেন না। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে নিখিল ভারত মণিমেলা সম্মেলনে যা দেখা হত। সত্যব্রতদা নিখিল ভারত মণিমেলা সম্মেলনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন, প্রথম সম্পাদিকা মালবিকাদি। তখন এই সব সম্মেলনে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই তপনের সেতার বাজনা ও তবলা সঙ্গত, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন, সুশীল দাশগুপ্তের আবৃত্তি, অমিতাভ ভট্টাচার্যের ব্রতচারী সবাইকে মাতিয়ে রাখত। নিখিলের ভাই তপন টাইফয়েডের দুরন্ত জ্বরে মারা যান অল্প বয়সে। নিখিলের তো পরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি হয়েছিল। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তনগান যে শুনেছে সে কখনো ভুলবে না। ইনি পরে আনন্দময়ী মায়ের শিষ্যা হন। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে থেকে গুণীদের সংগ্রহ করে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসার কাজে মৌমাছি বিমল ঘোষের ভূমিকা কতটা ছিল এতেই বোঝা যায়। অবশ্য মৌমাছি বিমল ঘোষ আগে আমার কাছে দূরের মানুষ ছিলেন, উনি মিত্র ও ঘোষ এবং মিত্রালয় দুই প্রতিষ্ঠানেরই লেখক, তাই এখন ওঁর কাছে আসার সুযোগ পেলাম। কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায় এসে ও নৈশ কলেজে ভর্তি হয়ে মণিমেলার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলতে বসলাম। সে

জায়গায়, লেখক, প্রেস মালিক, কাগজ-ব্যবসায়ী, দপ্তরী, বইয়ের খরিদদার আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলেন। আর ছিল নৈশ কলেজের বন্ধুরা, কিন্তু সে বন্ধুত্ব কখনই স্কুলের বন্ধুত্বের মতো ঘনিষ্ঠ বা গাঢ় হয়ে ওঠেনি, একমাত্র নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া, যিনি পরে বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল গড়ে তোলেন।

* * *

পুজোর পর থেকেই ঘাটশিলায় লেখক-সাহিত্যিকদের দল পাড়ি জমাতেন। বিভূতিভূষণের বাড়ি ছিল স্টেশন থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে রেললাইনের দক্ষিণে দাহিগোড়ায়, বাড়ির নাম "গৌরীকুঞ্জ"। প্রথমা স্ত্রীর নামে। বিভূতিভূষণের আগ্রহেই গজেনবাবু-সুমথবাবু বাড়ি কেনেন ওই পাড়াতেই, খুবই কাছে। এই বাড়ির বারান্দা থেকে সুবর্ণরেখা নদী দেখা যেতো। বর্ষাকালে নদীর জলে প্রবল স্রোত থাকত, পার হওয়া যেতো না। বিভূতিভূষণের বাড়ির কাছেই একটা কালো পাথরের ঢিবি ছিল। মাথায় তিন-চার জন বসার মতো মোটামুটি সমতল জায়গা। এই জায়গাটিতে বিভূতিভূষণ প্রায়ই বসে থাকতেন রাত্রে, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চেয়ে। রেল লাইনের উত্তরে ফুলডুংরি নামে একটি টিলাতেও তিনি রাতের অন্ধকারে বসে থাকতেন। দাহিগোড়ার বাড়ির কাছে কালো ঢিবিটার নাম দিয়েছিলেন 'কূর্মকূট'। কচ্ছপের পিঠের দিকের মতোই দেখতে ছিল ঢিবিটি। ঘাটশিলার অনেক সুন্দর স্থানের নামকরণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। রাতমোহানা, কাছিমদহ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি। স্থানীয় লোকেরা সেগুলি মুখে মুখে বলতে বলতে নামগুলি স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। প্রমথনাথ বিশী দাহিগোড়ায় ঢুকবার মুখে একটি লালবাড়ি এক-দুই মাসের জন্য ভাড়া নিতেন। কখনও বা সংলগ্ন রাস্তায় রমণীবাবুর বাড়ি। পরে বড় রাস্তার ওপর ফণিবাবুর বাংলো। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বোপদেব শর্মা) আসতেন বন্ধুসহ। একজন সোস্যালিস্ট কর্মী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থাকতেন কাছেই। এঁদের সম্মিলিত বৈঠকে নানা গল্প হত এবং সব ছাপিয়ে উঠত ভূতের গল্প।

সুমথবাবু, প্রমথবাবু, দ্বিজেনবাবু এবং সর্বোপরি বিভূতিভূষণ সবাই মিলে যখন পুজোর ছুটি জমিয়ে তুলেছেন, বলছেন, গজেনবাবুকে একবার আনান, তখন সকলের ডাকে গজেনবাবু একলাই গেলেন। সে সময়ে দুটি নাগপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ত হাওড়া থেকে। একটি সকালে, একটি রাত্রে। দুটিই থামতো ঘাটশিলায়। বোম্বে মেল কলকাতায় আসার পথে ঘাটশিলায়

থামতো। বোম্বাই যাওয়ার পথে থামতো না। গজেনবাবু সকালের ট্রেনে রওনা হলেন, পৌঁছতে রাত হয়ে গেল ট্রেন লেট হয়ে। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁতের যন্ত্রণা বাড়ল, অল্প যন্ত্রণা নিয়েই গিয়েছিলেন। অবস্থা দেখে সুমথবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, না গজেন, তোমার এভাবে আসা উচিত হয় নি, তুমি কালই ভোরে গিয়ে বঙ্কিমবাবুকে দেখাও।

বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিকদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি গজেনবাবুর দাঁতের চিকিৎসা করতেন বরাবর।

গজেনবাবু সুমথবাবুর পরামর্শ মতো পরদিনই ভোরবেলার বোম্বে মেল ধরে কলকাতা ফিরে গেলেন। বিভূতিভূষণ সকালবেলা আড্ডা দিতে এসে, গজেনবাবু বোম্বে মেলে ফিরে গেছেন শুনে হতাশ হলেন। বললেন, গজেনবাবুর কি রাত্রিবেলায় কলকাতায় শোয়ার জায়গার অভাব হয়েছিল? ঘাটশিলায় কি শুতে এসেছিলেন?

পরে সুমথবাবুর মুখে সব শুনে বললেন, তাহলে ব্যথা সারিয়ে দুদিন পরে এলেই সব দিক দিয়ে ভাল হত।

বিভূতিভূষণের বাড়ির সামনে ছিল কুমারেশ ওষুধ কোম্পানির (নাম— ও. আর. সি. এল—এঁদের 'কুমারেশ' ওষুধটি শিশুদের জন্য খুব চলত তখন) অন্যতম মালিক রমণীমোহন মিত্রর বাড়ি। এঁর ডাক নাম ছিল ভোলাবাবু।

ঘাটশিলার স্টেশন পেরিয়ে পূর্বদিকে রেল লাইন পেরিয়ে একটি পল্লীর নাম তামুকপাল। এখানে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও কর্ণধার অশোককুমার সরকারের বাড়ি ছিল। অবসর পেলে এখানে উঠতেন বিশ্বভারতীর পুলিনবিহারী সেন ও তাঁর বন্ধু কানাইলাল সরকার।

বিভূতিভূষণ, ভোলাবাবু, প্রমথবাবু, পুলিনবাবু, জিতেনবাবু, সুমথবাবু সবাই মিলে যখন আড্ডা দিতেন মনে হত গোটা কলেজ স্ট্রীটটাই এখানে উঠে এসেছে—বই আর বই-বিক্রি বাদে।

পুলিনবাবু রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্রের প্রুফ নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে। ওখানে বসে দেখবেন। প্রমথবাবু বললেন, পুলিন, তুমি তো এমনিতেই দেরি কর, তারপরে প্রুফ সঙ্গে এনেছ! প্রেস এবার ডুববে। তোমাকে প্রেসের মালিকরা আড়ালে কী বলে জান?

পুলিনবাবু বললেন—কী বলে?

—তুমি পুলিন সেন নও, ফুলিন সেন অর্থাৎ 'ফুল ইনসেন্', নয়তো এতদিন উনি প্রুফ আটকান?

১৮

এই সময়ে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে রবীন্দ্র পুরস্কার। পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসজ্ঞ অতুলচন্দ্র গুপ্ত। আর একটি হল, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন—ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ফর সেকেন্ডারি এডুকেশন। এর বাংলা বিভাগে যেসব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হলেন তাঁরা হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, কৃষ্ণদয়াল বসু, প্রমথনাথ বিশী। এক কথায় মিত্র ও ঘোষের আড্ডাধারীদেরই একটা দল। এঁরা নিজেদের নিজেদের মতে অটল থেকে বোর্ডের মিটিং-এ গিয়ে তর্ক করতেন। আবার তর্ক করতে করতে আড্ডায় ফিরতেন। কিন্তু তর্ক কখনও এমন জায়গায় যেতো না যে সম্পর্ক খারাপ হয়।

কালিদাসবাবু, কৃষ্ণদয়ালবাবুরা ছিলেন ব্যাকরণের বোঝা হাল্‌কা করার পক্ষে। সুনীতিবাবু বলতেন, ইংরেজি পড়বার সময়ে মোটা নেসফিল্ডের গ্রামার পড়তে যদি বাধা না হয়, তাহলে বাংলার বেলাতেই বা আপত্তি হবে কেন? সজনীবাবু প্রমথবাবু মাঝামাঝি একটা রফার জায়গা খুঁজতেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি নিয়ে বারবার পরিবর্তন বা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তখনও শুরু হয় নি। স্বাধীনতাপূর্ব কালে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাই চলছিল। শুধু শিক্ষার বিষয়সূচি যুগোপযোগী করার

চেষ্টা চলছিল। দশম শ্রেণির পর ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষা, তারপর ইন্টারমিডিয়েট, গ্র্যাজুয়েশন এই ধারাই চলছিল।

তখন, যতদূর মনে পড়ে বোর্ডের সভাপতি ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ। অপূর্ববাবুর ভাইদের মধ্যে অনেকেই আই. সি. এস ছিলেন। এঁদের ছোট ভাই অনিলকুমার চন্দও তাই। বাড়িতে এক ব্যক্তি ফোন করে একবার মিঃ চন্দকে ডেকেছিলেন। ওঁদের বাড়িতে যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি বললেন, কোন্ মিঃ চন্দ? ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল, মিঃ এ. কে. চন্দ। এ প্রান্ত থেকে আবার প্রশ্ন, কোন্ মিঃ এ. কে. চন্দ? ও প্রান্ত বললেন, মিঃ এ. কে. চন্দ আই সি এস। এ প্রান্তে আবার জিজ্ঞাসা, কোন্ মিঃ এ. কে. চন্দ আই. সি. এস?

ফোনের প্রশ্নকর্তা ভাবতেই পারেন নি, এক বাড়িতে এতগুলি একাধিক কৃতী আই. সি. এস থাকতে পারেন। আর সবারই নাম এমনই, সংক্ষিপ্ত করলে সবাই এ. কে. চন্দ।

তখন কৃতী মানুষ হলেও একান্নবর্তী, এক ছাদের নিচে বসবাসকারী বৃহৎ পরিবার অপ্রতুল ছিল না।

* * *

রবীন্দ্র-পুরস্কার কমিটির বৈঠক বসছে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। সুনীতিবাবু, প্রমথবাবু, সজনীবাবু এঁরা সবাই সে কমিটির সদস্য। বাংলা ভাষার দুটি করে পুরস্কার থাকবে। একটি উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের জন্য। আর একটি প্রবন্ধ বা অন্যতর গ্রন্থের জন্য। প্রমথবাবু এর আগে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তখন সবে আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে যায় নি। সপ্তাহে দুটি করে কলম লেখেন কমলাকান্ত শর্মা নামে। গৌরীদা আড্ডার মধ্যেই একদিন বললেন, স্যার, আমি প্রকাশক বলে বলছি না, *ইছামতীর* মতো উপন্যাস ইদানীং হয় নি। রবীন্দ্র পুরস্কার পাবার যোগ্য বই। প্রমথবাবু হেসে বললেন, মিটিংয়ে আমি কথাটা তুলব, তবে কেউ না আবার বলে, ছাত্রের প্রকাশনা বলে আমি ক্যানভাস করছি।

প্রমথবাবু যখন রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ নামকরণ পরে হয়েছে) পড়াতেন, গৌরীদা তখন সেখানে ছাত্র। শিল্পী রেবতীভূষণ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ক্লাসে বসেই নাকি অধ্যাপকদের মুখের কার্টুন আঁকতেন খাতায়।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রমথবাবুর ছাত্র ছিলেন এই কলেজেই, গৌরীদা রেবতীভূষণের দুই-এক বছরের জুনিয়ার।

প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার কিন্তু *ইছামতী* পেল না। সভাপতি অতুলবাবু *জাগরী* উপন্যাসটি পেশ করলেন। বললেন—সতীনাথ ভাদুড়ীর এই বইটি অসাধারণ গ্রন্থ। মনে হয় লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও আছে এই বিষয়ে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে বাস্তব চিত্র এতে আছে ইদানীংকার অন্য উপন্যাসে তা আমি পাই নি। অন্য গ্রন্থ যেটি পুরস্কার পেল; সেটি হল নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালির ইতিহাস*।

জাগরী গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ছাপা ইত্যাদি আশানুরূপ হয় নি। কে ছেপেছিলেন মনে নেই। লেখক নিজেও ছেপে থাকতে পারেন। সতীনাথ পূর্ণিয়ায় থাকতেন। সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। সাদাসিধে নির্লোভ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। *জাগরী* রবীন্দ্র পুরস্কার পেতে সকলেরই চোখ পড়ল তাঁর দিকে। মিত্র ও ঘোষ থেকে চেষ্টা হয়েছিল *জাগরীর* পুনর্মুদ্রণের প্রকাশ ভার নেবার। কিন্তু এবারও বেঙ্গল পাবলিশার্সের কাছে আমরা হেরে গেলাম। ওঁরা *জাগরী, ঢোঁড়াই চরিত মানস* প্রভৃতি বই পর পর প্রকাশ করলেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স এবং মিত্র ও ঘোষের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু কখনও খারাপ হয় নি। বেঙ্গল পাবলিশার্সের অন্যতম অংশীদার কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু মাঝে মধ্যেই আড্ডায় যোগ দিতেন। ঘরে ঢুকতে অবশ্য দেখি নি, কিন্তু কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়েই আড্ডা দিতেন। একবার বনফুল এসেছেন ভাগলপুর থেকে। ঘরের ভিতর বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। মনোজবাবু এসে দাঁড়াতেই বললেন, মনোজ, আমি তোমাদের মতো বড় পাবলিশারদের আর বই দেবো না, আমার তো ছোটগল্পেই খ্যাতি বেশি, আমার ছোট গল্পের বই হলেই তুমি গজেন বলবে, পনেরো পার্সেন্টের বেশি রয়্যালটি দেবে না।

তখন মিত্র-ঘোষ থেকে তাঁর *অদৃশ্যলোকে* গল্পগ্রন্থটি বেরিয়েছে। মনোজবাবু বললেন, কে বেশি দেবে বলেছে?

বনফুল এক প্রকাশকের নাম বললেন, সে বলেছে থার্টি পার্সেন্ট রয়্যালটি দেবে।

মনোজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কত ছাপবে বলেছে?

বনফুল বললেন, এগারোশো ছাপবে।

মনোজবাবু বললেন, ও বুঝে নিয়েছি বলাইদা। ও আপনাকে এগারোশো বলেছে তো, ছাপবে বাইশ শো। ওতে ওরও পনেরো হল আর আপনারও ত্রিশ হল।

আড্ডার সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। মনোজবাবু বনফুলের প্রস্তাবে আরও খানিক জল ঢাললেন, বলাইদা, দু-পয়সা উপার্জন করার জন্যই তো ব্যবসা, বেশি চাপ দিলে মানুষ অসাধু হবেই।

মনোজবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জমিয়ে গল্প বলতে পারতেন। একবার সর্দি-কাশি অ্যালার্জিতে ভুগছেন। স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ডাক্তার প্রতিদিন এসে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন? খুব ভালো আছেন শুনে বিমর্ষ হয়ে চলে যান। রোজই ওষুধ দেন, ভালো আছি, ডাক্তারের শুনে খুশি হওয়া উচিত। মনোজবাবু বলছেন, বিমর্ষ হয় কেন বুঝি না। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, গলায় ব্যথা, কথা বলতে কষ্ট, আয়নায় দেখলাম, চোখ মুখ ফোলা। ডাক্তার এসে দেখে উৎফুল্ল, আরে এ কি, চোখমুখ তো বেশ ফুলেছে। কষ্ট করে বললাম, কথা বলতেও কষ্ট। ডাক্তার আরও উৎফুল্ল, তাই নাকি বেশ বেশ! রাগ করেই বললাম, আমি এখানে চিকিৎসা করতে এসেছি না রোগী হতে? তখন কী বলে জানো ডাক্তার, আসলে অ্যালার্জির কারণটা তো এই শরীর খারাপ হতেই ধরা পড়ল। এবার আর ভয় নেই। এরকম চিকিৎসা শুনেছ কখনও?

এই রকম আড্ডার মধ্যেই একদিন ঢুকে পড়লেন, বিখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকার—প্রতুলচন্দ্র সরকার (বর্তমান পি. সি. সরকারের পিতা)। আমি কখনও তাঁকে দেখি নি, একটা বই ছিল আমাদের, নাম *মেসমেরিজম্*। মন্তুদা বললেন, দ্যাখ, ম্যাজিক দেখাবেন।

কাকাবাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কাউন্টারের ও-প্রান্তে বাইরের দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য—তখন আশুতোষ কলেজের বাংলার অধ্যাপক। ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষের আত্মীয় বুদ্ধ বসু হিমালয়ের নন্দনকাননের ফিল্ম তুলে এনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন, সেই সব কথা হচ্ছিল। বিজনবাবুকে বাংলার অধ্যাপক বলতে, পি. সি. সরকার বললেন, আমি কিন্তু শুনেছি আপনি অর্থনীতির অধ্যাপক। বিজনবাবু হেসে বললেন, আমি অর্থের ধারে-কাছেও হাঁটি নি। পি. সি. সরকার বললেন, কে বললে? এই তো আপনার চাদরে টাকা, ডান হাত বুলিয়ে দেখালেন একটা টাকা, বাঁ হাত বুলিয়েও গা থেকে টাকা উঠে এল। আমরা তো সবাই

হতভম্ব। এভাবে মানুষের গা থেকে টাকা বেরোতে পারে? বুঝলাম, ম্যাজিক, কিন্তু এত অল্প পরিসরে সকলের চোখের সামনে সম্ভব? বিজনবাবু তাড়াতাড়ি, রসিকতা করেই অবশ্য, ব্যাগটা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, দাঁড়ান মশাই, আজই মাইনে পেয়েছি, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে মুশকিল।

আরও ম্যাজিক দেখালেন বসে বসেই। একটি দড়ি দু-ভাঁজ করে আস্ত দিকটা পুড়িয়ে দু টুকরো করলেন। তার পর দু টুকরো দুই হাতের তালুতে ঘষে দেখালেন আবার জুড়ে গেছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পি. সি. সরকারের এত জগৎজোড়া খ্যাতি, নামডাক, তাঁর অমায়িক ব্যবহার সবাইকে আশ্চর্য করত। আমি তো অভিভূত। কাকাবাবু বললেন, তা সরকার সাহেব, নতুন খবর কি, কবে শো হচ্ছে কলকাতায়?

প্রতুলবাবু বললেন, সেই কথা বলতেই তো আসা। ছায়ায় শো-এর ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্তুদাকে বললেন, আমাকে বেশ কয়েকজনের একটা লিস্ট দেবেন। কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাঠাব। আশু আর নীহারকেও আসতে বলবো। জানেন, আশু, আপনাদের আর্টিস্ট আশু বন্দ্যোপাধ্যায় আর নীহার—নীহাররঞ্জন গুপ্ত আর

আমি—এই তিন বাঙাল অবসর পেলেই এক সঙ্গে ঘুরতাম। পকেট তো ভাঁড়ে মা ভবানী—পথঘাট দেখেই সময় কাটতো। আজ তো ভগবানের দয়ায় তিনজনেই কিছু করে খাচ্ছি।

এই আড্ডার মধ্যেই বিভূতিভূষণ এসে পড়লেন। প্রতুলবাবু তো প্রায় জড়িয়ে ধরেন বিভূতিবাবুকে, আপনাকে যেতে হবে আমার ম্যাজিক দেখতে।

বিভূতিবাবু হেসে বললেন, আমিও কাল একটা ম্যাজিক দেখাবো তোমাকে ভোরবেলায়, দেখবে পুব দিকে সূর্য উঠবে।

সবাই হেসে উঠলেন। বিভূতিবাবু বললেন, বলো! পুবে সূর্য ওঠা ও পশ্চিমে অস্ত যাওয়া—এর থেকে অলৌকিক কাণ্ড আর কী আছে? এ অবশ্য আমার কথা নয়, হজরত মহম্মদ বলেছিলেন।

একটু পরেই এলেন গিরীন্দ্র সিংহ। এঁর প্রিন্টিং হাউস নামের একটি ছাপাখানায় আমাদের বই ছাপা হত। *চলন্তিকা* নামে পত্রিকা বার করতেন বন্ধু প্রসাদ সিংহের সঙ্গে। পরে প্রসাদবাবুর সঙ্গে *উল্টোরথ* পত্রিকা এবং শেষে নিজে একাই বার করেন *প্রসাদ* পত্রিকা। গিরীনবাবু একটু পরেই বললেন, গজেনদা, মন্তুকে বলে দিন এবারে একটু বেশি টাকা দিতে, খরচা আছে।

কাকাবাবু বললেন, কীসের খরচ?

গিরীনবাবু সলজ্জ ভাবে বললেন, আমার বিয়ে।

সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। বিভূতিবাবু বললেন, আমায় নিমন্ত্রণ করবে তো!

গিরীনবাবু সলজ্জ হেসে বললেন, কি বলেন দাদা, আপনি আমার পত্রিকায় দয়া করে লেখেন। আপনাদের সবাইকে যেতে হবে। বিভূতিদার কার্ড ঘাটশিলায় পাঠাব। ঠিক।

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বিভূতিবাবু এসেছেন বারাকপুর থেকে। সন্ধ্যার দিকে। এসে দেখেন গজেনবাবু সুমথবাবু বেরোবার উদ্যোগ করছেন। বিভূতিবাবু বললেন, বাঃ, আমি এলাম, আর আপনারা চললেন কোথায় সব?

কাকাবাবু বললেন, আজ তো গিরীনের বৌভাত। আপনারও তো নিমন্ত্রণ।

বিভূতিবাবু বসে বললেন, কই, আমি তো কার্ড পাই নি!

সুমথকাকা বললেন, আপনি তো বলেছিলেন ঘাটশিলায় পাঠাতে, গিরীন তো সেই ঠিকানাই নিয়ে গেল!

বিভূতিবাবু বললেন, তাই তো! গজেনবাবু, বৌভাতে আমার যাওয়া উচিত না অনুচিত? দেখা হলে তো দুঃখ করবেই বলুন!

কাকাবাবু বললেন, তাতো করবেই।

বিভূতিবাবু বললেন, তাহলে চলুন যাই, ওহে মন্তু, একটা তৃণাঙ্কুর আর একটা আরণ্যক বেঁধে দাও তো। দাঁড়াও, আগে বইতে গিরীনের নামটা লিখে দিই।

সদলবলে আড্ডাধারীরা গিরীনদার বৌভাতে চলে গেলেন।

এর পরে যখনই গিরীনদার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বিভূতিভূষণের কথা উঠেছে, গিরীনদা বলেছেন—এটা আমি কখনও ভুলবো না, শুধুমাত্র আমার মুখের নিমন্ত্রণে কার্ড না পেয়েও বিভূতিদা আমার বউভাতে এসেছিলেন।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনে নববর্ষের একটি জমায়েত

১৯

১৯৪৯ সালেই শিল্পাচার্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওঁর বই আগে প্রকাশ করতেন—আর. এইচ. শ্রীমানী। এঁদের প্রকাশন সংস্থা ছিল বর্তমান বিধান সরণীর শ্রীমানী মার্কেটের নিচে। সেখানে সম্পর্ক খারাপ হতে প্রমোদবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গজেনবাবুর সঙ্গে পত্রালাপে যোগাযোগ করেন। *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ* ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হল মিত্র ও ঘোষ থেকে। প্রথমে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। কারণ তখনও ১ম খণ্ডের কিছু কপি শ্রীমানীদের কাছে অবিক্রীত ছিল।

একটা ব্যাপারে প্রমোদবাবুর অযৌক্তিক অনমনীয়তা ছিল। 'তন্ত্রাভিলাষী' বানানে কিছুতেই 'ষ' দেবেন না, শেষকালে বললেন, ভেতরে যা ইচ্ছা করো, মলাটে *'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ'* থাকবেই।

প্রমোদবাবু অসাধারণ গুণী শিল্পী ছিলেন। সূক্ষ্ম কলমের কাজে কী অপরূপ ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তার উদাহরণ তাঁর বই *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর* প্রভৃতি বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ* বেরোবার পর যখন *হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর* ছাপার কথা চলছে, তখন ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এলেন আমাদের অফিসে। প্রহ্লাদবাবু হঠাৎই বলে বসলেন, গজেনদা, এই বইটা প্রমোদবাবুকে বলে আমাকে

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

করিয়ে দেন না। প্রহ্লাদবাবু আমাদের আড্ডায় আসেন, প্রমথবাবু গজেনবাবু সুমথবাবু সকলেরই বই ছেপেছেন। গজেনবাবুর কথায় প্রমোদবাবু *হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর* প্রহ্লাদবাবুকে প্রকাশ করতে দিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদবাবুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সুসম্পর্ক থাকে নি।

অবশ্য প্রমোদবাবুও বেশ খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন। একটু রগচটা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা বিভাগ নিজে গড়ে তোলেন, কিন্তু সামান্য কারণে অত্যন্ত ভালো বেতনের চাকুরি—সেখানকার প্রধানের পদ অক্লেশে ছেড়ে চলে আসেন।

পত্নী-বিয়োগের পর প্রায় সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে দুর্গম স্থানে ঘোরেন। সেই পরিক্রমারই ফল তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি। এরকম স্বহস্তে অঙ্কিত সচিত্র ভ্রমণকাহিনী বাংলা সাহিত্যে বিরল। সন্ন্যাস-পরিক্রমা শেষ হলে প্রমোদবাবু পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। একাধিক সন্তানাদি হয়। আর ওঁর অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য ভালো কোনো কাজেও লেগে থাকতে পারতেন না। অথচ জলরঙ, তেল রঙের ওঁর যা কাজ ছিল, আজকের দিনে বহু সহস্রাধিক টাকায় বিক্রি হতে পারতো। একটি চন্দ্রশিখর-শোভিত শিবের মূর্তি, হর-পার্বতী, অর্ধনারীশ্বর—একদিকে পার্বতীর কমনীয় হাসি ও আর একদিকে পরুষ ওষ্ঠাধর—এসব সুদুর্লভ চিত্রে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর চিত্রশালার ভাণ্ডার। কিন্তু এত গুণী হলে কি হবে, মেজাজী এবং সেই রকম খামখেয়ালী ও

অবৈষয়িক বলে পয়সাও রাখতে পারতেন না। শেষে আমাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা হল, উনি প্রতি শুক্রবার আসবেন কুড়ি টাকা করে রয়্যালটি বাবদ নেবেন এবং বছর শেষ হলে হিসেবে যা পাওনা হবে থোক এক সঙ্গে নেবেন।

গরমের সময়ে অধিকাংশ দিন খালি গায়ে, কখনও একটা উড়ানি, শীতের দিনে গেঞ্জি ও একটা গরম চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে খালি পায়ে টালিগঞ্জ থেকে ট্রামে এসপ্ল্যানেড, সেখান থেকে কলেজ স্ট্রীটে আসতেন। আবার টাকা নিয়ে সে ভাবেই ফিরতেন। যাতায়াতে তখনকার দিনে দু আনা দু আনা চার আনা খরচ পড়ত। কাউন্টারের টেবিলের ওপর বসে বলতেন, মিত্রজা, এক কাপ চা হবে না কি?

এটা সেটা গল্পের পর ওঁর দেখা সাধুসন্ন্যাসী অলৌকিক দর্শনের কথা উঠত। অন্যান্য গল্পে কেউ অবিশ্বাস ততটা না করলেও 'মরকতরাজ্য'র কাহিনী কেউই বিশ্বাস করতে চাননি।

বিভূতিভূষণ (বন্দ্যোপাধ্যায়), তারাশঙ্কর ওঁর কথা মন দিয়ে শুনতেন, সুনীতিবাবুও, তবে কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, কৃষ্ণদয়াল বসু এঁরা বিশ্বাস করতেন কিনা বোঝা যেতো না।

তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যা বেরোচ্ছে শুনে প্রমোদবাবু বললেন, তাহলে মশাই অবনীন্দ্রনাথেরও করুন একটা, বয়স হয়েছে কবে আছেন কবে নেই। ওঁরও জন্ম শ্রাবণে।

তখনই ঠিক হয়ে গেল, পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যা অবনীন্দ্র নমস্কার সংখ্যা হবে।

আড্ডার মধ্যেই একদিন প্রমথবাবু হঠাৎই বললেন, মশাই সব কিরকম জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। একটা খেলা হোক্, কেউ ইংরেজি শব্দ বলবেন না, বললেই এক পয়সা জরিমানা। তখন এক পয়সার অনেক দাম, এক পয়সায় ছোট পেঁয়াজি, আলুর চপ কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় পাওয়া যেতো। এক আনায় গুপ্-চুপ বলে এক ঠোঙা ব্যাসম মাখানো আলুভাজা পাওয়া যেতো।

ঠিক এই সময়েই ভূপেনদা এসে পড়লেন। সুমথকাকার শ্যালক ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এঁর কথা আগে বলেছি। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসে কাজ করতেন। গজেনবাবুর ছাত্র ছিলেন, যখন স্কুলে পড়তেন। তদবধি গজেনবাবুকে মাস্টার মশাই বলতেন। ভূপেনদার কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ বলার অভ্যাস ছিল।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত রেখচিত্র

খেলা শুরু হতেই তিনি মুশকিলে পড়লেন। কিন্তু প্রথমেই জরিমানা দিতে হল মাস্টার মশাইকে, কৃষ্ণদয়াল বসুকে। উনি হঠাৎই বলে বসলেন, এক পয়সা ফাইন বড় কম।

প্রমথবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ফাইন' ইংরেজি শব্দ, জরিমানা বলা উচিত ছিল আপনার। এক পয়সা দিন।

ভূপেনদা বললেন, হোয়াই, ফাইন তো বাংলা শব্দই হয়ে গেছে।

প্রমথবাবু অমনি হিসেব করলেন, হোয়াই, ফাইন—দুটোই ইংরেজি শব্দ—দিন দুই পয়সা।

প্রমোদবাবুও দুটো শব্দ বলে ফেললেন ইংরেজিতে। বলেই জিভ কাটলেন। মন্তুদাকে বললেন, মন্তু, এই এক আনা ভাঙিয়ে দুটো দু'পয়সা দাও।

তখন দুই পয়সার একটা মুদ্রা হত। প্রমথবাবুর ইচ্ছে ছিল না প্রমোদবাবুকে জরিমানা করা। কিন্তু প্রমোদবাবুই জোর করে বললেন, না না, ওসব চলবে না, নিয়ম নিয়ম। আর আজ তো আমি বড় লোক। কুড়ি টাকা এখনই দেবেন গজেনবাবু।

এই করতে করতে সবাই জরিমানা দিলেন, গজেনবাবু, সুমথবাবু কেউ বাদ গেলেন না। সবাই চুপ করে আছেন, কথা বললেও হিসেব করে বলছেন। হঠাৎ ভূপেনদা বলে উঠলেন, না স্যার, আর পারা যাচ্ছে না, ইট ইজ গেটিং ওভার মাই নার্ভস।

প্রমথবাবু গুনতে শুরু করলেন, স্যার থেকে। সাতটা শব্দ। সাত পয়সা। দিন দু-আনাই। আজ খেলা শেষ।

দেখা গেল টেবিলে সাড়ে তিন টাকা জমে গেছে। প্রমথবাবু বললেন, নিন, এবার মুড়ি বাদাম আনুন।

কাকাবাবু বললেন, মন্তু, আরও দেড় টাকা দাও ক্যাশ থেকে। পাঁচ টাকায় একটু বেশি ডালমুট হবে।

প্রমোদবাবু ওঠার সময়ে বললেন, গজেনবাবু, এবারের কথাসাহিত্যের কিস্তিটা আমি সামনের সপ্তাহে দেবো। আজ আর শেষ করে উঠতে পারলাম না।

কথাসাহিত্যে প্রথম থেকেই তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের তৃতীয় ভাগ লিখতে শুরু করেছিলেন প্রমোদবাবু। সঙ্গে তাঁরই আঁকা ছবি।

তখন ছবি ছাপা এখনকার মতো সহজ ছিল না। হাতে কম্পোজ হত লেখা। ছবি ব্লক করে তার সঙ্গে ছাপা হত।

২০
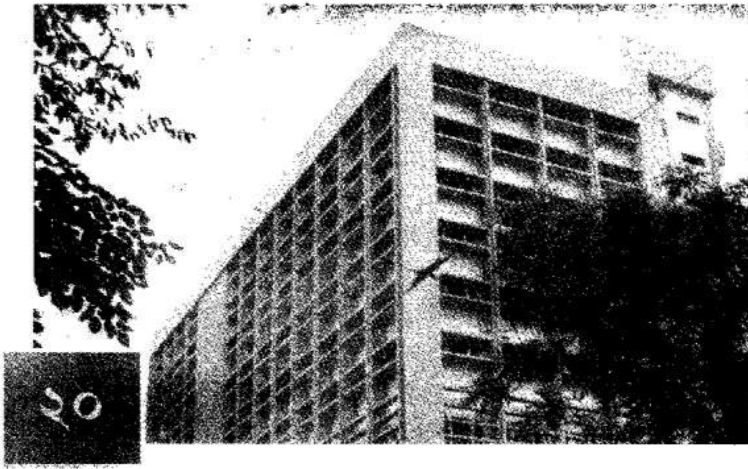
কথাসাহিত্যে সিনেমার খবর, খেলার খবর কখনও ছাপা হবে না, পুরোপুরি সাহিত্যের কাগজ হবে ঠিক হয়েছিল। এ কারণে বিজ্ঞাপন পাওয়ার দিক দিয়ে অসুবিধা ছিল ঠিকই। তবু, কথাসাহিত্য সাহিত্যিক মহলে, সাহিত্যপাঠক মহলে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিচ্ছিল। প্রমথবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় যাবার মুখে আগে আমাদের আড্ডায় নামতেন। তখন আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ছিল বর্মন স্ট্রীটে। পরে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দিলেন তখন নিজেই আড্ডাধারী হয়ে উঠলেন। সাগরময় ঘোষ তখন দেশের সহকারী সম্পাদক। সম্পাদক নামে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সেন, সাগরবাবুও মাঝে মধ্যে অফিস যাবার পথে হয়ে যেতেন। একদিন এসে বললেন, গজেনদা, আপনারা পত্রিকা বার করছেন, একটা করে পাঠাবেন বাড়িতে?

কাকাবাবু বললেন, অবশ্যই, ভানু, সাগরবাবুর ঠিকানাটা লিখে নাও।

সাগরবাবু তখন এস. আর. দাস রোডে থাকতেন।

সাগরবাবু বললেন, গজেনদা, অনেকদিন লেখা দেন নি দেশ-এ। একটা গল্প দিন।

তখন মাঝে মধ্যেই গজেনবাবুর গল্প বেরোতো দেশ-এ। দুটি গল্পের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। 'জ্যোতিষী' ও 'রাবণের চিতা'।

নতুন লেখকদের মধ্যে কারা ভালো লিখছেন জিজ্ঞেস করাতে, সাগরবাবু

বললেন, আপনারা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে লিখতে বলুন, বেশ ভাল লিখছেন ভদ্রলোক। বর্মা মুলুকের অভিজ্ঞতা আছে। এই তো ক্যালকাটা ইনসিওরেন্সের অফিসার।

হরিনারায়ণবাবু এলেন একদিন। সুদর্শন চেহারা। সেইদিন অচিন্ত্যবাবুও এসেছেন। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গজেনবাবু। অচিন্ত্যবাবু ভক্তিভরে নমস্কার করে বললেন, আপনাকে সভক্তি নমস্কার ডবল-হরিবাবু!

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সবাই বিস্মিত। অচিন্ত্যবাবু বললেন, প্রথমে হরি তারপর নারায়ণ, ডবল হরি না?

সবাই হেসে উঠলেন।

হরিনারায়ণবাবু প্রথম আলাপেই এক মজার গল্প শোনালেন। ওঁর শ্বশুরবাড়িতে হঠাৎই ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল —ওঁর চরিত্র নাকি নষ্ট হয়ে গেছে।

কি ব্যাপার? না এক ভদ্রলোক ওঁকে কদিন যাবৎই খুব তীক্ষ্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। পুলিসের ভাষায় যাকে 'ওয়াচ্‌' বলে। অফিস থেকে বেরোলে দেখেন, ঢুকলে দেখেন, এক ভদ্রলোক তাঁকে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছেন। স্বাধীন দেশে এখনও পুলিশের সি-আই-ডি আছে নাকি? একদিন থাকতে না পেরে সোজাসুজিই

জিজ্ঞেস করে বসলেন, কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন?

ভদ্রলোক অম্লান বদনে বললেন, হ্যাঁ, তা রাখছি, আপনি তো হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লেখক, এই ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিসার?

হরিনারায়ণবাবু একটু রুক্ষ ভাবেই বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাতে কি? আমি কোনো অপরাধ করেছি!

ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন। উনি চিত্র-পরিচালক নির্মল দে। একটি স্বদেশী পটভূমিতে চলচ্চিত্র করছেন। তাইতে কংগ্রেস নেতা জে. এম. সেনগুপ্তর ভূমিকায় হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে নামাতে চান। একজন খবর দিয়েছিলেন, জে. এম. সেনগুপ্তর চলাফেরার সঙ্গে হরিনারায়ণবাবুর খুব মিল আছে। উনি এতাবৎকাল তাই দেখছিলেন। এখন আলাপ যখন হয়েই গেল, ওঁকে ছুটির পর একবার জে. এম.-এর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তর কাছে যেতে হবে। যেটুকু ঘাটতি আছে সেটা উনি বুঝিয়ে দেবেন।

হরিনারায়ণবাবু বললেন, বুঝলেন, তাঁরই পীড়াপীড়িতে নেলী সেনগুপ্তের কাছে যাওয়া। তারপর টালিগঞ্জ স্টুডিও। স্ত্রী ছাড়া কাকেও বলিনি সিনেমায় নামছি। শেষ অবধি বইটা বেরোবে কিনা কে জানে! আগে বলে কি লজ্জায় পড়ব! শুধু স্ত্রীকে বলেছি। কীভাবে শ্বশুরবাড়িতে কে খবর দিল, জামাই স্টুডিও-পাড়ায় প্রায় যাতায়াত করছে। শাশুড়ি হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়ের কাছে এসে পড়লেন, হ্যাঁরে এ কি শুনছি! তারপর স্ত্রীর কাছে সব শুনে হাঁফ ছাড়েন।

সবাই ঘটনাটি বেশ উপভোগ করলেন। অচিন্ত্যবাবু বললেন, সব ঘটনার একটা মর‍্যাল থাকে, ঈশপের নীতিকথার মতো। এ ঘটনার মর‍্যাল কি জানো?

সুমথবাবু বললেন, এর আবার কী মর‍্যাল?

অচিন্ত্যবাবু বললেন, যা করবে স্ত্রীকে বলে করবে। তাইতেই তো নতুন জে. এম. সেনগুপ্ত বেঁচে গেলেন। কী বলো ডবল-হরিবাবু?

এবার সকলে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

এক দিন বেশ আড্ডা জমে উঠেছে। কবিশেখর কাউন্টারের টেবিলের ওপর আসীন। কৃষ্ণদয়ালবাবু তাঁর অভ্যস্ত বেঞ্চ-আসনে, গজেনবাবু বেতের চেয়ারে, সুমথকাকা কাঠের চেয়ারে, মন্তুদার চেয়ারের পাশে আমি টুলে। মন্তুদা আমি ক্যাশমেমো করছি। আমার কান মাঝে মাঝেই আড্ডার রসালাপের দিকে। লেখকদের সামনেই ক্রেতারা অক্লেশে বলেন, একটা বিভূতি শ্রেষ্ঠ, একটা তারাশঙ্কর, তাঁরা তো জানেন না কে তারাশঙ্কর, কে বিভূতি, আমাদের যতই অস্বস্তি লাগুক। এরই মধ্যে তারাশঙ্করবাবু হঠাৎই ঢুকে পড়লেন। তারাশঙ্করকে তখন সবাই সাহিত্যসম্রাট বলেন। এমনকি কবিশেখরও বলেন। বললেন, কী ব্যাপার, সম্রাটের কী খবর?

তারাশঙ্করবাবু বললেন, আর সম্রাট! মনটা এমনই খারাপ করে দিল, সরোজ—সরোজ রায়চৌধুরী, ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম।

কবিশেখর বললেন, এত মন-খারাপের কি হল—কী কথা বলল রে! তবে তোমাকে দেখে একটা পুরোনো প্রবাদ মনে পড়ল—তোমার সঙ্গে দেখা হলেই মনে পড়ে। টালা থেকে টালিগঞ্জ। তোমার নতুন বাড়ি টালায়, আমার তো টালিগঞ্জে। ও তোমার কালীঘাট ব্রিজ পেরোলেই টালিগঞ্জের আওতায়। তা কী বলল সরোজ?

তারাশঙ্করবাবু যখন ঢুকেছিলেন, তখন একটু বিরক্ত অথবা বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। এখন হেসে ফেললেন—আসলে ট্রামে আসতে আসতে সরোজ এমন একটা কথা বলল, মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বলল, তারাশঙ্কর তোমার যাই নাম হোক না কেন, তোমার সাহিত্য টিকবে না। কারণ তোমার লেখায় সেই একঘেয়ে বীরভূমী কাহার সাঁওতাল চাষীদের জীবন আর সবথেকে বড় কথা হল তোমার লেখায় কোনো স্টাইল নেই। স্টাইল না থাকলে কোনো লেখক বা তার লেখা বাঁচে না।

কবিশেখর বলল, ওঃ এই কথা! আমি ভাবলাম না জানি কী তত্ত্বকথা শোনাল। আসলে কী জানো—সরোজ আর তোমার লীলাক্ষেত্র একই, রাঢ়বঙ্গ। ও একটা ঈর্ষার প্রতিযোগিতা থাকবেই। দ্যাখো তারাশঙ্কর, তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলি। মানুষ সবসময়ে মানুষের বুকের কথা হৃদয়ের কথা শুনতে চায়। থ্যাকারে—উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারে আর চার্লস ডিকেন্স প্রায় সমসাময়িক কালের লেখক। আমাদের পড়ানো হত থ্যাকারের রচনাশৈলী আর ডিকেন্সের সাহিত্য। কে বেঁচে আছে, থ্যাকারে না ডিকেন্স? রবীন্দ্রনাথ বীরবল শরৎচন্দ্র—কার গল্প উপন্যাস পাঠক বেশি পড়ে? শরৎচন্দ্রের কী কোনো নিজস্ব স্টাইল আছে? আমি বলছি তোর বা বিভূতির সাহিত্যের ভিত্তিভূমি দাঁড়িয়ে আছে মানুষের হৃদয়ের উপর, যাদের সঙ্গে তোরা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিস তাদের কথাই তোরা লিখেছিস। তোদের সাহিত্য থাকবে না তো কী কল্লোল-কালিকলমের সব বাঘা বাঘা লেখকদের থাকবে? ওদের মধ্যে যারা মানুষের সঙ্গে মিশেছে তাদের থাকবে। কিন্তু ওদের কেউ কেউ তো তিনতলার জানলা দিয়ে মানুষকে দেখে। ওদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কি! বলাই কিছু মানুষ দেখেছে—ডাক্তারি করার সুবাদে, বাকিটা বই পড়ে বুঝেছে—বলাইয়ের লেখা পড়লেই তা ধরা যায়। তবে তোর আর বিভূতির জবাব নেই, তোরা যে মানুষদের দেখেছিস, ভালোবেসেছিস, তোদের সাহিত্যে সেই কথাই তোরা ফুটিয়ে তুলেছিস। তোর তুলনায় সরোজ অনেক পিছিয়ে, বরং মানিকের দেখার অভিজ্ঞতা সরোজের থেকে বেশি। যদিও ওর লেখার পটভূমি আলাদা।

তারাশঙ্করবাবু এগিয়ে এসে কবিশেখরকে প্রণাম করলেন, বাঁচালেন দাদা, সরোজ যা মন খারাপ করে দিয়েছিল।

কালিদাসবাবু বললেন, দ্যাখ দিকি কী কাণ্ড করিস, ব্রাহ্মণ হয়ে পায়ে হাত দেয়।

তারাশঙ্করবাবু বললেন, আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কালীদা, রসো বৈ সঃ। যিনি রসজ্ঞ তিনিই ভগবান।

কাকাবাবু বললেন, সরোজবাবুর কথা কী বলছেন। বিভূতিবাবু প্রায় বিনাপয়সায় গল্পভারতীতে লেখা দেন। *সিঁদুরচরণ* গল্পটা ওদের দিলেন। সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এসে অম্লানবদনে বলে গেলেন,—বিভূতি এবার ফাঁকি দিয়েছে, ওটা কি গল্প হল? অথচ কালীদা আপনিই বললেন, বিভূতির দশটা সেরা গল্পের মধ্যে *সিঁদুরচরণ* একটা! আমি বড়দাকে বললাম, দ্যান কেন ওদের লেখা, যারা আপনার লেখার মর্ম বোঝে না। তা বড়দা বললেন, চ্যান করুক গে যাক্, আমি কি আর সম্পাদকের জন্য লিখি? আমি তো লিখি পাঠকের জন্য, একালের আগামী কালের পাঠকদের জন্য।

কালিদাসবাবু বলেন, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। পাঠকই শেষপর্যন্ত আসল বিচারক। আজ ছাপার ব্যাপার হয়েছে, বই হয়েছে। কিন্তু যখন হাতে লেখা পুথিতে শ্রুতিতে চলত ধরে রাখার ব্যাপার, ভেবে দ্যাখ কারা টিকে আছে—ত্রিকালের সীমা ঐ দ্যাখো নিরূপিয়া, দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
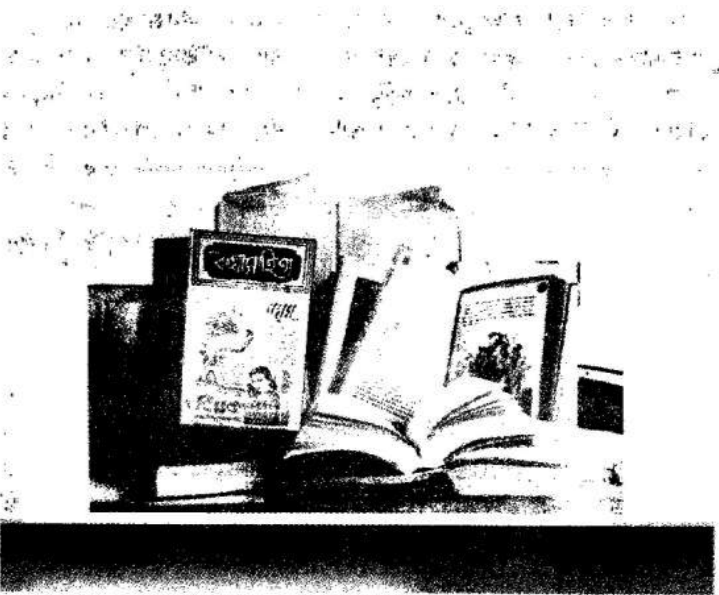
২২

এই আড্ডাতেই প্রথম দেখেছিলাম জসীমউদ্‌দীনকে, এবার দেখলাম গোলাম মোস্তাফা ও বন্দে আলি মিয়াকে। আমাদের তখন চারটে কবিতার বই— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শতনরী,* যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *অনুপূর্বা,* কালিদাস রায়ের *আহরণ,* আর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর *কাব্যমালঞ্চ*। গোলাম মোস্তাফার কবিতা পাঠ্যপুস্তকে পড়ি—সম্ভবত কিশলয় নাম কবিতাটির— এইরকম একটি পংক্তি আজও মনে পড়ে—শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে।—গোলাম মোস্তাফা বললেন, আমার একটা কবিতার বই ছাপেন না গজেনবাবু।

কাকাবাবু বললেন—একটা সংকলন হলে হতে পারে। তবে আপনাকে বসে তৈরী করতে হয়। তা আপনি তো আবার পাকিস্তানে চলে গেলেন।

গোলাম মোস্তাফা বললেন—আসলে ওখানে একটা ভালো চাকরি দিল আর মাইনে ভালো। লোভ সামলাতে পারলাম না।

কথা বিশেষ এগোল না।

বন্দে আলি মিয়ার লেখা আনন্দমেলায় পড়তাম। মানুষটিকে সামনাসামনি দেখেই ভালো লাগল। খুবই সাদাসিধে মানুষ। একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিলেন—শাহনামার গল্প। ফেরদৌসি রচিত শাহনামার গল্প আজকাল অনেক ছেলেমেয়েই জানে না। তহ্‌মিনাকে বিয়ে করেন অন্য এক দেশের বীর সেনাপতি রুস্তম, তহমিনার ছেলে সোহ্‌রাবও বড় হয়ে খুব বীর

যোদ্ধা হন। কিন্তু পিতা-পুত্রে কোনোদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হল না। এমন সময়ে ঐ দুই দেশের মধ্যে লড়াই বাধল। এদেশের বীর সেনাপতি তরুণ সোহ্‌রাব, ওদেশের রুস্তম। কেউই সোহ্‌রাবকে এঁটে উঠতে পারে না, রুস্তমও না। শেষ পর্যন্ত রুস্তমের অস্ত্রে সোহ্‌রাব ঘায়েল হলেন। মরার সময়ে বললেন, আমায় হারালে বটে, আমার বাবা রুস্তম এলে পারতে না। রুস্তম চেঁচিয়ে বললেন, তুমি কে? তুমি কি তহমিনার ছেলে? রুস্তমের কোলে তখন পরম নিশ্চিন্তে শেষ ঘুমে ঢলে পড়লেন সোহ্‌রাব। কাঁদতে কাঁদতে এলেন তহ্‌মিনা। ঠিক যেন হরিশচন্দ্রের শৈব্যা। এ গল্পটি যতবার পড়েছি, চোখে জল এসে যায়।

বন্দে আলি মিয়া চলে যাবার সময়ে কাকাবাবুদের এক বন্ধু বললেন—ইনিই বন্দে আলি মিয়া, আশ্চর্য!

কাকাবাবু বললেন—কী আশ্চর্য।

বন্ধুটি বললেন—একেবারে টিপিক্যাল বাঙালি। মুসলমান মনেই হয় না।

কাকাবাবু বললেন—টিপিক্যাল বাঙালি না! তোমাদের এই মনোভাবের জন্যই দেশটা ভাগ হয়ে গেল। বাঙালি মানেই হিন্দু, যারা বাংলা বলে বাংলাদেশে বাস করে—বৌদ্ধ ক্রীশ্চান মুসলমান এরা কেউ বাঙালি নয়? তোমরা কবে যে মানুষ হবে বুঝি না। তুমি একটা ছোটো বাক্যে ইংরেজি শব্দ টিপিক্যাল বললে। উনি একটাও ইংরেজি শব্দ বলেছেন? মানুষের সঙ্গে মেশো, দেখবে অনেক অহিন্দু তোমার থেকে বেশি বাঙালি।

সুমথকাকা বললেন—ভাগ্যিস প্রমথবাবুর ক্লাস শুরু হয়নি। টিপিক্যাল-এর জন্য জরিমানা হতো। এখন এক পয়সা থেকে এক আনা হয়েছে।

বাক্যালাপে একটাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখলাম কবি অমিয় চক্রবর্তী যেদিন এলেন। ওঁকে অনেকদিন আগে পাঁচশ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের উপর একটি গ্রন্থ লিখবেন বলে। তখনও আমি কাজে যোগ দিই নি। উনি এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে বেশ কিছুদিন কাছে থেকে দেখেছেন। সেই অগ্রিম টাকা ফেরত দিলেন। বললেন, আর লেখা হয়ে উঠবে না গজেনবাবু, শরীরের যা অবস্থা।

এক ঘণ্টা ছিলেন। নানা কথা বললেন, শান্তিনিকেতনের, বস্টন শহরের, যেখানে এতদিন ছিলেন। একটাও ইংরেজি শব্দ বেরোল না কথায়।

২৩
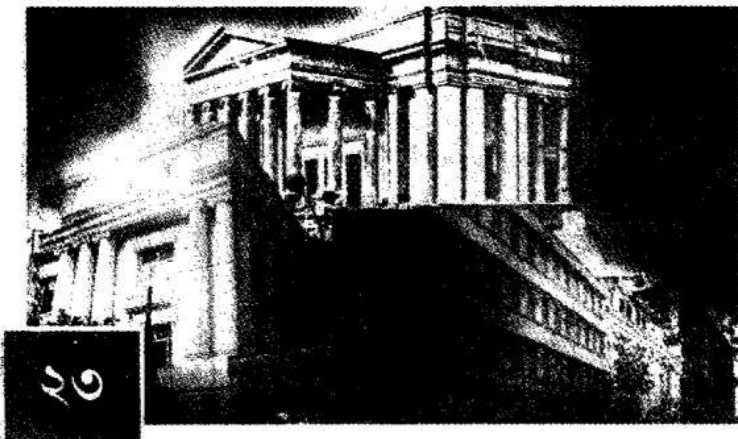
তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যা বেরোল যথাসময়ে। তারাশঙ্কর বাবুর জন্মদিনে, ৮ই শ্রাবণ ১৩৫৭র ভোরবেলা কাকাবাবু (গজেন্দ্রকুমার), সুমথকাকা, গৌরীদা, মন্তুদার সঙ্গে গেলাম টালায়। ভোরবেলা পুজো করে ইষ্টমন্ত্র জপ করে তারাশঙ্করবাবু লেখার আসনে বসলেন। যতদূর মনে পড়ে, পরনে তসরের ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষ, খালি গা, কাকাবাবু মালা পরালেন, আমরা সবাই প্রণাম করার পর লেখার ডেস্কের সামনে বসলেন। মাটিতে বসে লিখতেন, ডেস্কে প্যাড কলম রেখে। তিনবার প্যাডে কিছু লিখলেন। মা-শব্দ বা ইষ্টমন্ত্র, আমরা দেখতে পেলাম না। তারাশঙ্করবাবু নিজের মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। একটু পরে সনৎদা, সঙ্গে বৌদি (সনৎদার স্ত্রী) থালা নিয়ে এলেন। অন্য মিষ্টি ছিল, সঙ্গে বালুসাই। কাকাবাবু বললেন, বালুসাই কি লাভপুরের?

তারাশঙ্করবাবু বললেন, হ্যাঁ তোমাদের জন্যই আনিয়েছি, কাল নিয়ে এল লাভপুর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, তাহলে ওসব সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে কী হবে, ও সনৎ, আমাদের বালুসাই দাও আগে।

সবাই নিলে তারাশঙ্করবাবু বললেন, মন্তু তোমরাও নাও, হাত গুটিয়ে কেন।

একটু পরে সজনীবাবু এলেন, সজনীকান্ত দাস, বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন, কই, বড়বাবু কোথায়?

তারাশঙ্করবাবু বললেন, ঐ সজনী এল, উঠে বেরিয়ে আহ্বান জানালেন, এসো, এসো, আরে পাটুদাও যে, আসুন আসুন।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যা [শ্রাবণ, ১৩৫৭

সজনীবাবুর সঙ্গের ভদ্রলোকের নাম জানলাম—পাটুদা (পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারি ছিলেন), সজনীবাবু তারাশঙ্করবাবুর প্রতিবেশী। সজনীবাবুর হাতে কাপড়ের ছোট একটা পুঁটুলি। তারাশঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এটাতে আবার কি?

সজনীবাবু বললেন, টাটকা পুঁটি পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বড়বাবুর জন্যে নিই। মাছ তো শুভ জিনিস। কী বল গজেন সুমথ?

সুমথকাকা বললেন, হ্যাঁ, তা শুভ বই কি? তবে একটা দেড় সের দু' সের রুই বা কাতলা হলে শুভ বেশি হতো।

সবাই হো হো করে হাসলেন। সজনীবাবুও।

সজনীবাবু তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যাটি উল্টেপাল্টে দেখলেন। বললেন, বেশ হয়েছে গজেন। খুব ভালো কাজ করলে তোমরা। একটা দৃষ্টান্ত রাখলে।

গৌরীদা বললেন, এর পরেরটা অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা।

তারাশঙ্করবাবু বললেন, অবনীন্দ্রনাথের কুটুম-কাটুম আমারও খুব ভালো লাগে। যদি জীবনে কখনও সময় আসে ছবি আঁকা কুটুম কাটুম করার আমার বড় ইচ্ছে আছে।

তারাশঙ্কর অভিনন্দন সংখ্যায় তারাশঙ্করের যে ছবি ছাপা হয়েছিল, তা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। অনেকের লেখা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ওঁর আগ্রহেই এই সংখ্যাটি তৈরী হয়) এবং কালিদাস রায়ের লেখাটি উদ্ধৃত করলাম।

*　　*　　*

বিভূতিভূষণের লেখাটির নাম—**বন্ধু তারাশঙ্কর।**

তারাশঙ্কর ও আমি দুজনে কানপুর থেকে ফিরছিলাম একই ট্রেনের একই কামরায়। সঙ্গে ছিলেন হরেকৃষ্ণদা, তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ।

তারাশঙ্করকে ভালো করে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম সেবার। এমন সরল, বন্ধুবৎসল, উদার একটি ভদ্রলোকের ছবি মনের মধ্যে দৃঢ়, ঋজুরেখায় অঙ্কিত হয়ে গেল! অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে সে ছবি আজও।

হরেকৃষ্ণদা'র জন্যে তার সে কি উদ্বেগ! স্টেশনে স্টেশনে কমলালেবু কিনচে, মাঝে মাঝে তাঁর মাথা ধোয়ার ব্যবস্থা করচে। রাত্রে অসুস্থ সহযাত্রীকে একটু আরামে রাখবার জন্যে তারাশঙ্করের কত আকুল আগ্রহ!

অণ্ডাল স্টেশনে হরেকৃষ্ণদা নেমে দেশে চলে গেলেন। তারাশঙ্কর প্ল্যাটফর্মে নেমে কি সব ব্যবস্থা করে এল। গাড়ির মধ্যে ঢুকে বল্লে, আমাদের জন্যে চা বলে এলাম, বিভূতি—এবার আরাম করে চা খাওয়া যাক।

চা খেতে খেতে তারাশঙ্করের মুখে ওদের দেশের গল্প শুনি। গল্প বলবার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ওর, যখনই ও গল্প সুরু করে তখন শ্রোতার মানসচক্ষের সম্মুখে একটা ছবি ফুটে ওঠে; ছবির সেই কল্পলোকের অধিবাসী হয়ে পড়তে হবে শ্রোতাকে ততক্ষণের জন্যে, যতক্ষণ তারাশঙ্কর গল্প শেষ না করবে।

হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তারাশঙ্করের সঙ্গে কাটলো ওর মুখের নানা গল্প

গুলো। কামরায় আর কোনো লোক ছিল না। সত্যিকার তারাশঙ্করকে সেদিন পেয়েছিলাম নিভৃতে সেই গাড়ির কোণে। সভা সমিতির পোশাকী মানুষ সে নয় তখন, তার মধ্যেকার খাঁটি মানুষটিকে সেদিন আবিষ্কার করবার সুযোগ ঘটেছিল আমার।

সেবার সাহিত্য সম্মেলনে বম্বে যাওয়ার সময় আবার পেলাম বন্ধু তারাশঙ্করকে। আমি দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলাম, তারাশঙ্কর সে খবর রেখেছে দেখলাম। বল্লে—আমার সঙ্গে তোমার আমার দুজনের খাবার আছে। বাড়িতে বল্লাম, বিভূতি আসবে দেশ থেকে, ওর খাবারও করে দিও। দুজনের লুচি মাংস রয়েচে টিফিন ক্যারিয়ারে। সে রাত্রে প্রায় আমাদের সারারাত জাগতে হয়েছিল গল্প-গুজবে। শ্যামবাজারের একটা নামকরা দোকানের ভালো সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে নিয়েছিল তারাশঙ্কর, কিন্তু বোধ হয় তার একখানাও সে মুখে দেয় নি, আমাকে কেবল বলেচে—কেমন হে, চলবে নাকি আর একখানা?

রাত দশটার মধ্যে সন্দেশের চ্যাঙারি কাবার হয়ে গিয়েছিল তার উদার বিরক্তিলেশশূন্য দৃষ্টির সহাস্য উৎসাহে। অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টির রাত ছিল সেটা, চক্রধরপুর যখন ছাড়িয়েচে বম্বে মেল, তখনো আমি, তারাশঙ্কর ও বিমল (মৌমাছি)—আমরা পুরো উৎসাহে গল্প করচি!

বম্বেতে তারাশঙ্কর ও আমি পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। সে সকালে উঠে নিচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকতো—বিভূতি, ও বিভূতি—

আমি জানালা খুলে ওকে দেখে নিয়ে বলতাম—যাচ্ছি, দাঁড়াও—তারপর দুজনে মালাবার হিলের ওপরকার বাগানে বেড়াতে যেতাম, ওর জীবনের অনেক অজানা কাহিনী শুনতাম নাজ্ রেস্তোরাঁর ছাদে বসে বসে। সন্ধ্যায় এসেও আলোকোজ্জ্বল মেরিন ড্রাইভের দিকে চোখ রেখে বসে ওর গল্প শুনতাম।

সে সব কাহিনী শুনে বুঝেছিলাম তারাশঙ্কর সাহিত্যকে কতখানি ভালোবাসে এবং তার জন্যে জীবনে সে কত ত্যাগ স্বীকার করেচে, কত কঠিন প্রলোভনকে তুচ্ছ করেচে।

অনেকদিন তারাশঙ্করকে আর এমন করে পাইনে।

আমি থাকি দেশের বাড়িতে, সে থাকে কলকাতায়।

হঠাৎ গতমাসে সজনীর সঙ্গে ওর নতুন বাড়িতে গেলাম সকালবেলা

ওর সঙ্গে দেখা করতে। মর্নিং গ্লোরি ফুলের পুষ্পিতা লতা উঠেচে ওর বাড়ির রেলিংএর গায়ে। সাধারণ নীল রংএর ফুল নয়, অন্য একটা রং ফুলের, ভারি সুন্দর দেখতে। আমি বল্লাম—এ ধরনের রং কখনো দেখিনি এ ফুলের। কোথায় পেলে?

তারাশঙ্কর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লে—তুমি বীচি নেবে? দাঁড়াও, দাঁড়াও—এসো আমার সঙ্গে—

তারপরে সে বেড়ার ধারে ঘুরে ঘুরে ফুলের লতা থেকে বীচি সংগ্রহ করতে লাগলো পরম যত্নে। আমার হাতে দিয়ে বলে—নাও, ভাল করে রেখে দাও, বাড়ি গিয়ে প্রথম বর্ষার সময় পুঁতে দিও।

আবার সহজ মানুষ তারাশঙ্করকে পেলাম এতদিন পরে।

কবিশেখর **কালিদাস** রায় **লিখেছিলেন—কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর**।

তারাশঙ্কর যুগসন্ধির রসশিল্পী। প্রাচীন যুগ ও নবীন যুগের দ্বন্দ্ব যে সমস্যাগুলির সৃষ্টি করেছে—তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেগুলিকে বাণীরূপ দিয়েছেন। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বই তাঁর রচনার উপজীব্য হয়েছে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, কর্মজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কোন জীবনই বাদ যায়নি—ভূস্বামী-প্রজা, মূলধনী-শ্রমিক ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বর্তমান যুগে প্রবল হয়ে উঠেছে—জাতীয় জীবনের এই সাহিত্য-প্রতিনিধির চিত্তকে তা রীতিমত বিচলিত করেছে।

এই সব দ্বন্দ্বের মধ্যে আর একটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে,—তা হচ্ছে—সর্বসংস্কারমুক্ত মানবসমাজের সঙ্গে সংস্কারান্ধ সমাজের সংঘর্ষ। সর্বসংস্কারমুক্ত যাযাবর মানবসমাজের জীবন-চিত্র তাঁর রচনায় অপূর্ব রোমান্সের সৃষ্টি করেছে।

একজন অসম্যক্‌দর্শী সমালোচক বলেছিল—'যে Feudal System মানব-সমাজের কলঙ্ক—সেই Feudal System দেশ হতে চলে যাচ্ছে বলে তারাশঙ্করের দুঃখের অবধি নেই।' এই সমালোচকটি বিজাতীয় মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত, সাহিত্যরসজ্ঞ নয়। তারাশঙ্কর যুগধর্মের আঘাতে ভূস্বামীদের ইমারতগুলো ধ্বসে পড়ছে এ চিত্র একাধিক পুস্তকে এঁকেছেন, এজন্য দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছেন। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয়নি নবযুগধর্মকে

তিনি বরণ করছেন না। নবযুগধর্মকে তিনি তাঁর গ্রন্থে গভীর শঙ্খধ্বনির দ্বারাই বরণ করেছেন উল্লাসের সঙ্গে। এই উল্লাস যেমন সত্য, প্রয়াতের জন্য দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য—এই-ই সাহিত্যের সত্য। ভালো হোক মন্দ হোক একটা বিরাট, একটা রাজসিক, একটা সমারোহ, একটা উৎসব যখন চলে যায়—তখন তার বিদায়-পথের পানে চেয়ে যার হৃদয় বিগলিত হয় না—সে সাহিত্যিক নয়। একটা অজগর সাপ কি একটা বিরাট বাঘও যদি রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাকে তো তা দেখে যার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে না—সে সাহিত্যিক নয়। যে বিরাট বটগাছের তলায় ডাকাতেরা আশ্রয় নিয়ে লুটের ধন ভাগ করেছে—যার তলায় একদিন সন্ন্যাসীরা ধুনী জ্বেলে সাধন-ভজন করেছে,—যার কোটরে কত বিষধর সর্প বাস করেছে, শাখায় শাখায় হাজার হাজার পাখি আশ্রয় নিয়ে বটফল খেয়েছে, কালবৈশাখীর ঝড়ে যদি সেই বটগাছ উপড়ে পড়ে থাকে—তবে তা দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না কোন্ শিল্পীর?

বনফুলের মতো তারাশঙ্কর নতুন নতুন টেকনিক নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট করেন না, এক *অভিযান* ছাড়া নতুন টেকনিক তিনি নভেলে প্রয়োগ করেছেন বলে মনে হয় না—তবে ছোট গল্পে তিনি অনেক নতুন টেকনিক প্রবর্তন করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অতি উদাসীন পাঠককেও চমকিত ও চমৎকৃত করবে বলে মনে হয়। *অভিযানে* তারাশঙ্কর স্মৃতি ও স্বপ্নের সাহায্যে জীবনের উত্তরাংশে পূর্বাঙ্গের কাহিনী গড়ে তোলবার যে টেকনিক প্রবর্তন করেছেন—তা বাংলা কথাসাহিত্যে অনুসৃত হচ্ছে।

সকলদেশেই কতকগুলো জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকে যেগুলোর সঙ্গে জাতীয় জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই কথাসাহিত্যিকের। রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবের আখড়া, গানবাজনার আসর, চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশ, জমিদারি কাছারি, উৎসব পার্বণ উপলক্ষে গ্রাম্য মেলা ইত্যাদি আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এইগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে অল্প সহায়তা করেনি।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হতে হলে বাংলা দেশকে ভালো করে জানা দরকার। বাংলার মাটির খাঁটি মালিকদের জীবনযাত্রার কথা, তাদের প্রাণের

বার্তা জানা চাই। কেবল কলকাতার ইংরাজি-শিক্ষিত লোকদের খবর জানলেই চলে না। এরা বাঙালি জাতের প্রতিনিধি নয়। এরা অন্যদেশের সমাজের আচার-আচরণের অনুকারক মাত্র।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক হতে হলে বাঙালির ভাষা জানা দরকার। বাঙালির ভাষার অর্থ শহুরে লোকদের ভাষা নয়, বাংলার মাটির খাঁটি মালিকদের ভাষা। শহরে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে যে ভাষা চলে, তা ইংরাজি অনুবাদ করা ভাষা কিংবা ইংরাজিমিশ্রিত বাংলা ভাষা। সে ভাষায় প্রবন্ধ লেখা চলে, কিন্তু আপামর সাধারণের মুখের ও বুকের ভাষা না জানলে বর্তমান যুগের কথাসাহিত্য লেখা চলে না।

ইংরাজিতে ভেবে যারা মনে মনে তর্জমা করে বাংলা লেখে তারা পরগাছার সৃষ্টি করে—বাংলার মাটির রসে পুষ্ট কোন জীবন্ত রসতরুর সৃষ্টি করতে পারে না।

সকল জাতিরই আত্মপ্রকাশের একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। বিলাতী-নভেল পড়ে কাঁটায় কাঁটায় তার ভঙ্গি অনুসরণ করলে জাতীয় সাহিত্য হয় না। অবশ্য একথা স্বীকার করি, কৌশলী শিল্পী বিলাতী নভেলের ঢঙের সাহায্যে দেশী ঢঙের নভেলও সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু বিলাতী নভেলের ঢঙটাকেই চালাবার জন্য দেশী চরিত্রগুলোকে বিদেশী ভাবাপন্ন করলে উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্য হতে পারে না।

একথাটাও একটু চিন্তা করে দেখলেই হয় কেন তারাশঙ্কর কথাসাহিত্যিকদের জনতা ঠেলে উপরের ধাপে উঠে গেলেন—বাঙালি জাতি কেন এঁকে বরণ করে নিল।

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর বাঙালিদের নিয়ে Romance লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্যন্ত নেমেছিলেন, শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু ভাসন্ত তুষার-স্তূপের যেমন ১/১১ ভাগ জলের উপরে থাকে, আর ১০/১১ ভাগ জলের নীচে থাকে—বাংলার ভদ্রশ্রেণীর লোকরা তেমনি বাঙালিজাতির এগারো ভাগের একভাগ—এগারো ভাগের দশ ভাগ হল খাঁটি মূর্খ কুসংস্কারান্ধ বাঙালি। তাদের কথা নিয়ে তাদের 'জন্য' কোন সাহিত্য রচনা করা যায় না বটে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর জন্য—নগরবাসী সাহিত্যরসিকদের জন্য সৎসাহিত্য রচনা করা যায়। বাঙালির এ রাজ্যটা ছিল অনাবিষ্কৃত। তারাশঙ্কর ও তাঁর দু-একজন সহযোগী সে রাজ্যের আবিষ্কারক।

তারাশঙ্করের *কবি, ইমারত, তামস তপস্যা, গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* ইত্যাদি বাংলার মাটির আসল মালিকদের নিয়ে রচিত উপন্যাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে ঐ রাজ্যের নরনারীদের বুকের বার্তা ও মুখের ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে। এই সঙ্গে তারাশঙ্করের অকুতোভয়তা ও সাহসেও স্তম্ভিত হতে হয়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের আভিজাত্য-দৃপ্ত মঞ্চ ছেড়ে বেশীদূর নামতে পারেন নি—সর্ববিধ মালিন্যের ছোঁয়াচ এড়াবার উৎকণ্ঠায়।

শরৎচন্দ্র নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রজাতির গণ্ডী পর্যন্ত নেমেছিলেন। অবশ্য তিনি মাঝে মাঝে এক-আধবার ছোটগল্পে গণ্ডীলঙ্ঘন করে সসঙ্কোচে সরেই গিয়েছেন। তারাশঙ্করের সাহসের সীমা নেই। তারাশঙ্করের বাস্তবদৃষ্টি ও কল্পদৃষ্টি দুইই নেমেছে অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ পথে মানবজীবনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত। কেবল নামা নয়—তাদের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটেছে তাঁর, তাদের জীবনের সহভাগী হয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র যে সকল বেপরোয়া চরিত্র অঙ্কন করে রসসৃষ্টি করেছেন—সে সকল চরিত্র জীবনসংগ্রামে চিরদিন পরাজয় স্বীকার করেছে, তারা অর্থ সামর্থ্য কখনও অর্জন করেনি, দুহাতে উড়িয়ে দিতেই পেরেছে। কাজেই এই অর্থসামর্থ্য তাদের পেতে হয়েছে বংশধারাক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে। বাংলাদেশে এদের সন্ধান পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। তারাশঙ্কর বাংলার জমিদারদের উপেক্ষা করতে পারেন নি—তাঁর রচনাতেও জমিদারদের প্রয়োজন হয়েছে। এরা করেছে চুটিয়ে জমিদারি, এরা বিপদেও জমিদারি উড়োয়নি, প্রজাপীড়ন করে বাড়িয়েছে। কিন্তু যুগধর্মের আঘাতে এদের ভূস্বামিত্ব ভূস্যাৎ হয়েছে। তারাশঙ্করের জমিদার চরিত্রের প্রয়োজনটা শরৎচন্দ্রের মতো মুখ্য নয়, গৌণ। তারাশঙ্করের দরদ উচ্ছৃঙ্খল ভাববিলাস জমিদার-পুত্রদের প্রতি নয়, দেশের মাটির খাঁটি মালিকদের প্রতিই তাঁর দরদ। তাদের টানেই, কান টানলে যেমন মাথা আসে, ডাল ধরে টানলে যেমন গাছটা নোওয়ায়, সেইরূপ টানেই এসেছে জোর-জবরদস্তি ও বংশধারাক্রমে অন্যায়রূপে দখলদার জমিদাররা।

একটা শরবিদ্ধ পাখি, একটা বজ্রাহত বৃক্ষ বা আশ্রয়চ্যুত লতা এমন কি একটা পথহারা ঝরনার প্রতি দরদেও সাহিত্য হয়। কোন বিলাসিনী সোহাগিনীর প্রিয়বিরহেও কবির দরদ সাহিত্যরূপ ধরতে পারে, রাবণ মেঘনাদের ন্যায় অত্যাচারী রাক্ষসদের প্রতি দরদও উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়েছে।

যে কোন কাল্পনিক জীবমানবের প্রতি দরদই সাহিত্যে বাণীরূপ ধারণ করতে পারে। আসল দরদের পাত্রের সাহিত্যে রূপলাভ করবার দাবিই কিন্তু সবচেয়ে বেশি। এই আসল দরদের পাত্র কারা? যারা মানুষ, অথচ কোনদিন মনুষ্যত্বের অধিকার পায়নি—যারা কাল্পনিক জীবন নয়, পুরাদস্তুর বাস্তব, যারা হীনদুঃস্থ, পার্থিব সৌভাগ্যের সর্ব অধিকার হতে বঞ্চিত, চির উপেক্ষিত, দেহে গেহে মনে প্রাণে ভাষায় ভূষায় সর্ববিষয়ে দীন দুর্বল মানুষ, এই দেশেরই মানুষ, আমাদের চারিপাশের মানুষ, আমাদের প্রতিবেশী, চিরদিন আমাদের সেবা করেছে, চিরদিন আমাদেরই মুখ চেয়ে আছে দুমুঠা অন্ন ও হাঁটুঢাকা একখণ্ড বস্ত্রের জন্য, চিরদিন আমাদের দ্বারা নিপীড়িত পদদলিত। আসল দরদের পাত্রই তো এরা।

নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবনচিত্র দিতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। ১। তাদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই ব্যাপারে কল্পনার সবলতা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় খুব বেশি। ২। তাদের মুখের ভাষা সাহিত্যে অপাংক্তেয় মনে করলে চলবে না। তাদের মুখের ভাষা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই সে ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ৩। কোন চিত্রই যথাযথ পটভূমিকা ও আবেষ্টনী ছাড়া ঠিকমত ফোটে না বা আর্টের অঙ্গীভূত হয় না। এই আবেষ্টনীর কতকটা প্রাকৃতিক, কতকটা গার্হস্থ্য জীবন গত। চারিপাশের ভৌগোলিক প্রকৃতির যথাযথ রূপও যেমন ফোটাতে হয় তাদের গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটিও তেমনি প্রত্যক্ষবৎ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এছাড়া তাদের জীবনের দোষত্রুটি, ভ্রমপ্রমাদ, দৈন্যদুর্বলতা, দুর্নীতি, সুমতি, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্তকেই ফুটিয়ে তুললে, তবে তাদের জীবনচিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে। এবিষয়ে লেখকের লেখনী হবে অকুণ্ঠ, অকম্পিত ও তটস্থ। সর্বোপরি চাই এই দুঃস্থ দুর্গত, দেহে মনে মলিন, সভ্যতার নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, অথচ জীবন্ত জ্বলন্ত মানুষগুলোর প্রতি গভীর দরদ। এই দরদটুকু না থাকলে খুব জোর হলে photography হতে পারে, রসে রঙে প্রাণবন্ত চিত্র হয়ে ওঠে না। এই দরদ না থাকলে কেবল রসচিত্র হয় না তা নয়, রসচিত্রের যে উপাদান উপকরণগুলির কথা আগে বললাম—সেগুলিও অধিগত হয় না, সেগুলির আহরণে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাও জন্মে না।

এই শ্রেণীর মূর্খ অশিক্ষিত, দীনদরিদ্রদের নিয়ে কথাসাহিত্য রচনার বিবিধ দিক হতে সার্থকতা আছে। প্রথম সার্থকতা, এদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ

অধিকার স্বীকার ও প্রকৃত দরদের পাত্রদের প্রতি দরদবোধ। বর্তমান যুগধর্মের অনুশাসনে মনুষ্যমাত্রকেই মনুষ্যত্বের গৌরবদানই সাহিত্যিকের হৃদয়ধর্ম। সেই হৃদয়ধর্মের প্রতি উপেক্ষা চলতে পারত সেকালের কৌলীন্যদৃপ্ত সাহিত্যে, একালে আর চলে না। দ্বিতীয় সার্থকতা—রসসৃষ্টির দিক হতে। কেবলমাত্র Realistic representation of life-মাত্রই সাহিত্য হতে পারে না, তাতেও একটা Romance সৃষ্টি করতে হয়। এই Romance একটা দূরত্বের ব্যবধান ছাড়া সৃষ্ট হতে পারে না। কারণ, Distance lends enchantment to the view, এই দূরত্ব দেশগত (spatial) কালগত (temporal) হতে পারে। এদুটো ছাড়া আরও ব্যবধান আছে। সাহিত্য সৃষ্ট হয় সাধারণত সভ্যশিক্ষিত পৌরজনের জন্য। সামাজিক আর্থনীতিক ও সংস্কৃতিগত দূরত্বও একটা মস্ত ব্যবধান। নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র পল্লীবাসী ও শিক্ষিত সভ্য নগরবাসীর মধ্যে এই ব্যবধান বর্তমান। এই ব্যবধান Romance সৃষ্টির যতটা সহায়তা করে দেশগত বা কালগত দূরত্ব ততটা করতে পারে না। সে হিসাবে তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাসে অদ্ভুত একটা Romance-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই Romanceই বাগ্দী, চামার, বেদিয়া, সাপুড়ে, মুদ্দফরাস, কাহার, বাউরিদের অতি সাধারণ জীবনকথাও উপাদেয় সাহিত্যে পরিণত করেছে।

এদের বাদ দিয়েও কথাসাহিত্য হয়, কিন্তু এদের বাদ দিলে সাহিত্যের হৃদয়ধর্ম প্রত্যবায়ভাগী হয়। প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য রচিত হয় না। সাহিত্যিক যদি মনেপ্রাণে স্বকীয় সাহিত্যধর্ম পালন করতে চান তবে আসল দরদের পাত্রদের উপেক্ষা করে কল্পনার জীবদের জন্য অশ্রুপাত করে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারেন না। এই সত্য এ যুগে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন—তারাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অগ্রণী।

যুগধর্মের অনুশাসনে আজ সাহিত্যের ক্ষেত্র আর সীমাবদ্ধ নয়। Conventional নয়, অসভ্য বর্বর হতে আরম্ভ করে সভ্যতম ব্যক্তি পর্যন্ত এ ক্ষেত্রের অঙ্গীভূত। যুগধর্ম যে উদার দৃষ্টি উন্মুক্ত করেছে—তাতে সাহিত্যের জগতে কেউ উপেক্ষণীয় নয়। এই দৃষ্টির ফলে মানবজীবনের যা কিছু অনাবিষ্কৃত বা অনীক্ষিত ছিল তার সবই আজ আমাদের অধিগত। মানব সমাজের যে অংশ আজ নব-আবিষ্কৃত তা, Virgin soil যেমন প্রচুর ফসল দেয়, তেমনি প্রচুর রসসম্পদ দান করে। এ সত্য এদেশের সাহিত্যিকরাও উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধিকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক

করেছেন তারাশঙ্কর। চোখের বালির আগে যেমন নষ্টনীড়, তারাশঙ্করের আগে তেমনি শৈলজানন্দ। আজ তারাশঙ্করের কথা লিখতে গিয়ে আমার পরম স্নেহাস্পদ শৈলজানন্দকেও প্রীতিভরে স্মরণ করছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা যায় লেখকের জবানী সংস্কৃতানুগ ভাষায় রচিত,—পাত্রপাত্রীর মুখের কথা, এমনকি ঝি-চাকরের মুখের কথাও মার্জিত ভাষায়। তাঁর রচিত রোমান্সগুলিতে এটা বেমানান হয় নি, তাঁর উপন্যাস দুখানিতেও সেকালের পাঠকের চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আমরাও যখন বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ি তখন নিজেদের সেকালের লোক বলেই কল্পনা করে নিই। রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে বঙ্কিমেরই অনুসরণ করেছিলেন—পরে তিনি পাত্রপাত্রীর মুখের জবানী চলতি ভাষাতেই ব্যক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আগাগোড়া চলতি ভাষাতেই লিখতেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের শিষ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের পদ্ধতিই আমরণ অনুসরণ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়বয়সে আগাগোড়া চলতি ভাষায় লিখতে সুরু করলেও শরৎচন্দ্র তাঁর পদ্ধতির আর বদল করেন নি।

কি বঙ্কিম, কি রবীন্দ্রনাথ, কি শরৎচন্দ্র কেউই নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে তাদের মুখের যথাযথ ভাষা ব্যবহার করেন নি। চলতিভাষা হলেই তো নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা হলো না। ভাগীরথীতীরের চলতি ভাষা ভদ্রশ্রেণীর লোকদেরই মুখের মার্জিত ভাষা। সে ভাষায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কথাবার্তা বলে না।

চলতি ভাষা হলেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নিজেদের ভাষাই নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে বসিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের পাত্রপাত্রী সাহিত্যের ভাষাতেই কথা বলেছেন, অর্থাৎ এঁদের শুধু মুখের ভাষা নয় বুকের ভাষাও পাত্রপাত্রীদের মুখে স্থান পেয়েছে। এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকরাও অনেক সময় সাহিত্যের ভাষাতেই কথা বলেছেন। ভাষাপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাদের স্বকীয় সত্তার কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের সত্তাকেই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। বরং আমরা দেখতে পাই বাংলা নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা যথাযথ রূপেই তাদের মুখে বসানোর প্রথা ছিল। যে মাইকেল সংস্কৃত অভিধানের অপ্রচলিত শব্দসকল আহরণ করে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা লিখেছিলেন তিনি তাঁর প্রহসন রচনায় যার মুখে যে কথাটি সাজে সেই কথাটিই বসিয়েছিলেন। নিম্নশ্রেণীর

পল্লীবাসী ও পল্লীবাসিনীদের ভাষা সম্বন্ধে সাহেব মাইকেলের অভিজ্ঞতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। নীলদর্পণে দীনবন্ধু ভদ্রশ্রেণীর লোকদের মুখে অস্বাভাবিক সংস্কৃতানুগ ভাষা বসিয়েছেন বটে, কিন্তু যশোহর জেলার চাষা-চাষানীদের মুখে তাদের যথাযথ ভাষাই দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে শহরের নিম্নশ্রেণীর নরনারী অনেকটা ঠাঁই দখল করে আছে। তাদের ভাষার সঙ্গে গিরিশের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তারা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলেছে। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাসের আসল ভাষার সন্ধান পেয়েছেন। এ যুগের কথাসাহিত্য চলতি ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। পাত্রপাত্রীর মুখের কথার সঙ্গে বুকের কথার মিল থাকা চাই এবং মুখের কথা যথাযথ হওয়া উচিত—এ সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের এঁরা কথাসাহিত্যে স্থান দিচ্ছেন—কিন্তু মুশকিল হয়েছে এঁদের মধ্যে ২।৪ জন ছাড়া কারো নিম্নশ্রেণীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। একথা তাঁরা স্বীকারও করেন। তারাশঙ্কর নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিয়েই কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। তাদের অবজ্ঞাত জীবন সম্বন্ধে তাঁর যেমন অভিজ্ঞতা তাদের ভাষা সম্বন্ধে তেমনি তাঁর অগাধ প্রাজ্ঞতা। জীবনের সঙ্গে তার অভিব্যক্তির ভাষার সামঞ্জস্য সাধনে এঁর দক্ষতা অসাধারণ। *ইমারত, কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা* ইত্যাদি পুস্তকে তারাশঙ্কর নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথায় কাঁটায় কাঁটায় যথাযথতা রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের কথা কোথাও তাদের মুখে বসাননি। যে কথা তাদের মুখ হতে কোথাও কস্মিন্ কালে বেরুতে পারে না, সেকথা তিনি তাদের মুখে বসাননি।

নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথার সঙ্গে লেখকের জবানী মার্জিত ভাষার সামঞ্জস্য হয় না, দূর ব্যবধান ঘটে যায়। কাজেই অন্যান্য উপন্যাসে নিজের জবানী কথাগুলি পৌরজনের মার্জিত ভাষায় ব্যক্ত করলেও তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসে তিনি পল্লীগ্রামের চলতি ভাষারই ব্যবহার করেছেন। লেখকের মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্যবোধের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। আসল Realistic Novel-এর Technique তিনি এমন ভাবে আয়ত্ত করেছেন যে খুঁত ধরার ছিদ্রই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথাসাহিত্য ও গীতিকবিতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল এই—অবিমিশ্র কথাসাহিত্য চিত্রাত্মক—আর কবিতা সঙ্গীতাত্মক বা সুরাত্মক। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে চিত্র ও সঙ্গীত দু-ই মিশিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসে দুই অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশিয়ে শুধু নেই, সঙ্গীতধর্মই

প্রাধান্য লাভ করেছে। অবিমিশ্র চিত্রাত্মক কথাসাহিত্য খুব কমই তিনি রচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা রবীন্দ্রনাথের রচনা *নষ্টনীড়, চোখের বালির* অনুসৃতি। চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ ঘটেছে তাঁরও রচনাতে। এই সঙ্গীতের সুর (আবেগাত্মক বা গীতিকবিতার সুর) রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শুধু নিজের জবানী কথাগুলিতেই রক্ষা করে চলেননি—সে সুর তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখের কথাতেও স্বতই সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে এঁদের পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা অনেকটা সাহিত্যেরই পুষ্পিত ভাষা।

প্রভাতকুমারের রচনায় আবেগের সুর একেবারে বর্জিত হয়েছে। পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের অধিকাংশের রচনাতেই চিত্র ও সঙ্গীত-ধর্মের মিশ্রণ দেখা যায়। আসল কথাসাহিত্য চিত্র-প্রধান, সুর-প্রধান নয়। এদেশে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের গুরু ও প্রবর্তক বলে অনেকের ধারণা, যে রচনায় সঙ্গীতের প্রাধান্য কেবল তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য আর যা চিত্র-প্রধান বা কেবলই চিত্রাত্মক তা বুঝি অপকৃষ্ট শ্রেণীর। এ ধারণা ভ্রান্ত। সুর-প্রধান কথাসাহিত্য যেমন উচ্চশ্রেণীর হতে পারে, Impersonal চিত্রধর্মী কথাসাহিত্যও তেমনি উচ্চশ্রেণীর হতে পারে। কেবল সুযোগ্য লেখকের অভাবে চিত্রধর্মী কথাসাহিত্য এদেশে উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। শৈলজানন্দ এই শ্রেণীর কথাসাহিত্য রচনা করতে সুরু করেন—তারাশঙ্কর তার চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন। সুরের সূতা বর্জন করে বিনিসূতার মালা গাঁথার মতো তারাশঙ্কর চিত্রপরম্পরার দ্বারা যে অদ্ভুত কথামালা গাঁথছেন এদেশের আর কোন সাহিত্য-মালী সে শিল্পকে উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করেন নি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রসচিত্রগুলিও চিত্রাত্মক কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বাংলাদেশে এক একজন কথাসাহিত্যিকের লেখনীতে এক এক অংশের নরনারীর জীবন ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ফুটেছে। হুগলী হাওড়া জেলার অন্তরটা ফুটেছে শরৎচন্দ্রের রচনায়—কোন কবি এ অঞ্চলের অন্তরকে বাণীরূপ দেননি। দেবার কথা ছিল কবিবর মোহিতলালের—আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন। নদীয়া মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ, যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণার (আগেকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ) অন্তরটা ফুটেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসুর রচনায়। এ অঞ্চলের কবি যতীন্দ্রমোহন। ভাগীরথীতীরের বর্ণহিন্দু সমাজের জীবন বাণীরূপ লাভ

করেছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। এই অঞ্চলের কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

এ হিসাবে পূর্ববঙ্গের কথা-সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ও অঞ্চলের কবি জসীমউদ্‌দীন। আর রাঢ়দেশের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত নিঃশেষভাবে রূপ গ্রহণ করেছে তারাশঙ্করের রচনায় এবং কতকটা সরোজকুমারের রচনায়। এ অঞ্চলের কবি কুমুদরঞ্জন।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে কম পড়েছে তারাশঙ্করের উপর। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকটে বাস করেছেন ইনিই। কৃষ্টির তফাতে নয়, দৃষ্টির তফাতে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘটেছে মস্তবড় ব্যবধান।

* * *

কথাসাহিত্য ভাদ্র সংখ্যা অবনীন্দ্রনাথ নমস্কার সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। সংখ্যাটি হাতে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাতে কাকাবাবু, সুমথকাকা, গৌরীদা, মন্তুদা গেলেন—এক বিকেলে। আমার যাওয়া হল না, কলেজের সময় হয়ে গেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

২৮শে ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মদিন পালিত হল যথারীতি কাকাবাবুর বাড়িতে। মন্তুদা বাজার করে দিয়ে গেছেন। কাকীমা রান্নায় ব্যস্ত। আমি সেদিন থাকতে পারিনি। সেদিন মণিমেলার একটা অনুষ্ঠান ছিল। মণিমেলার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক উঠে গেছে। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ। পড়াশোনার চাপও বেড়েছে। নিয়মিত রবিবারেও যাওয়া তো হয়ই না। সেজন্যই এবারের অনুষ্ঠানে যাব না বলতে পারি নি। লাইন পেরিয়ে বাস স্টপের দিকে যেতে এক সুদর্শন ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন—আরে আপনি তো মিত্র-ঘোষে আছেন?

দেখেই চিনলাম, বক্তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তখন ওঁর একটা গল্পের বই আমরা ছেপেছি—*জন্মান্তর*।

আমি বললাম—হ্যাঁ। আপনি কি গজেনবাবুর বাড়ি যাবেন?

নারায়ণবাবু বললেন—হ্যাঁ তাই তো যাব, ওখানেই তো বিভূতিবাবুর জন্মদিন অনুষ্ঠান?

আমি বললাম—হ্যাঁ, চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে কাকাবাবুর বাড়ি ফিরে এলাম। দাঁড়িয়ে শুনলাম, তখন সজনীবাবু আবৃত্তি করছেন—যাবার আগে শেষ কথাটি বলে যেন যাই, যা পেয়েছি যা দেখেছি তুলনা তার নাই।

বিভূতিবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবৃত্তি করলেন—যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

নারায়ণবাবু বললেন—জন্মদিনে এসব কবিতা ভালো লাগছে না। তার থেকে শুনুন—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

নারায়ণবাবুর পর প্রবোধবাবু—প্রবোধকুমার সান্যাল। তারপর বাণী রায়। সবাই দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ সব আবৃত্তি করে যাচ্ছেন—একের পর এক।

বিভূতিভূষণ বললেন অনুষ্ঠানের মধ্যেই—এই, আজকে যারা এসেছ, তোমাদের সবারই কিন্তু পুজোর ছুটিতে ঘাটশিলায় যাওয়া চাই। জমাট আড্ডা হবে। গজেনবাবু, সবাইকে নিয়ে যাবেন। আপনাদের বাড়ি, বাণীর বাড়ি, আমার বাড়ি, ভোলাবাবুর বাড়ি, কারও থাকার অসুবিধে হবে না।

বিভূতিভূষণের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমি আটকে গেলাম। মণিমেলার অনুষ্ঠানে আর যাওয়া হল না, সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫

কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায় দোকান খোলার সময়ে দৃশ্যটা একরকম। বিশেষ করে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে—আমাদের দোকানের সামনে। পাঠ্যপুস্তক ও দীনেশরঞ্জন সেন সম্পাদিত *রামায়ণ-মহাভারত* গ্রন্থের প্রকাশক ভট্টাচার্য এন্ড সন্‌স দোকান খুলছেন, আমাদের পরে। আমাদের ডান পাশে দর্জির দোকান—সেন্‌টা (মালিক অসিত সেন—তাই সেন্‌টা নাম), ভট্টাচার্য এন্ড সন্‌সের পাশেও দর্জির দোকান—ব্যানার্জি এন্ড কোং—বীরেশ্বর ব্যানার্জি—এঁরা শৌখিন মানুষ, ধীরে সুস্থে খোলেন। অসিতবাবু তো এবাড়ির ওপরেই থাকেন। আমাদের বাঁ পাশে ইস্টার্ন ল-হাউস, তাঁরাও দেরিতে খোলেন। একমাত্র সি. ও. বুক স্টলে (ক্যালকাটা ওল্‌ড বুক স্টল) দেখতাম সত্যেনবাবু, সত্যেন কর টাইপ করে যাচ্ছেন। যত সময় যায়, চলচ্চিত্রের মতো পথের দৃশ্য পালটায়। লোক চলাচল বাড়ে, ক্রেতা-দোকানীদের ফর্দ জমা পড়ে কাউন্টারে। ডি. এম.

লাইব্রেরির ম্যানেজার যোগরঞ্জনবাবু বইয়ের ফর্দ দিয়ে বলেন, মন্তুবাবু দেখুন, সব বই আছে তো?

সিগনেট প্রেসের অজিত ছিলেন ওঁদের বিশ্বস্ত কর্মী। সাইকেলে পিছনের ক্যারিয়ারে বই নিয়ে এসে মন্তুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, মন্তুবাবু কী বই লাগবে?

তখন সিগনেট প্রেস, নিউ এজ পাবলিশার্সের কতকগুলি বই ভালো বিক্রি হত। সিগনেটের *আবোল-তাবোল, ক্ষীরের পুতুল, আম আঁটির ভেঁপু,* নিউ এজ-এর *দেশে-বিদেশে, দৃষ্টিপাত*। এই দুটি প্রকাশকের কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় কাউন্টার ছিল না। এঁদের বই অন্যান্য বইয়ের দোকানের মতো কিছু কিছু মিত্র-ঘোষেও রাখা হত।

বারোটা নাগাদ শ্যামাচরণ দের (যাঁর নামে এই রাস্তা) পৌত্র জগৎ দে মশাই বাজার করে বাড়ি ফিরতেন। ইনি ছিলেন রাজশেখরবাবুর শ্যালক।

জগৎবাবু যখন বাড়ি ফিরছেন, তখনই গজেনবাবু সুমথবাবু এসে ঢুকলেন। গজেনবাবু বললেন, আজ কটায় মধ্যাহ্নভোজন?

জগৎবাবু যেতে যেতেই উত্তর দিলেন, সাড়ে তিনটে তো হবেই।

এই অবেলায় খাওয়ার জন্য একবার কঠিন ডিস্‌পেপসিয়ায় পড়েন জগৎবাবু। রাজশেখরবাবু জোর করে ওঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখেন। নিয়মে খাওয়াদাওয়া করিয়ে ভালো করে তোলেন। ফিরে এসে জগৎবাবু বলেন, হাঁফিয়ে উঠেছিলাম মশাই, এত নিয়ম কি সহ্য হয়?

কাকাবাবুরা বসতে না বসতেই বিভূতিভূষণ এলেন। কাকাবাবু বললেন, আরে বড়দা যে, কোত্থেকে? ঘাটশিলা না বনগাঁ-বারাকপুর।

বড়দা বললেন, না বারাকপুর থেকেই। আপাতত সজনীর বাড়ি থেকে।

কাকাবাবু বললেন, মুখ দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া হয় নি!

বিভূতিবাবু বললেন, In fact হয় নি। সজনী বলছিল বটে খেয়ে যাও, তা ওর আবার বোর্ডের কি সব মিটিং-ফিটিং আছে শুনলাম। কি দরকার তাড়াহুড়োর মধ্যে আবার বিব্রত করা।

কাকাবাবু বললেন, তা কি বললেন সজনীবাবুকে? পিসিমার বাড়ি যেতে হবে?

বিভূতিবাবু একগাল হেসে বললেন, In fact তাই বলেছি, সত্যি এই পিসিমা না থাকলে যে কি হত?

বিভূতিভূষণ এই পিসিমার কথা বলে বহু জায়গায় নিমন্ত্রণ, সভার

আমন্ত্রণ এড়াতেন। পিসিমা এক কালে হয়তো অবশ্যই ছিলেন, এখন অবর্তমান পিসিমা কিন্তু তাঁর অন্যতম রক্ষাকর্ত্রী।

বড়দা বললেন, আসলে আমি দুটো দরকারী কাজে এসেছি গজেনবাবু। নাথ ব্যাঙ্ক* ফেল হয়েছে শুনে অনেকেই বলছে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে লোকে টাকা তুলে নিচ্ছে। ওখানে তো আমার বেশ কিছু টাকা পড়ে আছে। নুটু চিঠি দিয়েছে, ওখানকার টাকা তুলে লয়েড্‌স বা কোন ভালো ব্যাঙ্কে রাখতে। সেজন্যই আসা।

কাকাবাবু বললেন, চলুন তাহলে এখনই ব্যাঙ্ক সেরে আসি। আমাদেরও অ্যাকাউন্ট তো ওখানে। মন্তু, সন্তোষ মিষ্টির দোকান থেকে বড়দার জন্য লুচি তরকারি দই মিষ্টি একটু আনিয়ে রাখো। আমরা ঘুরে আসি। আমায় বললেন, তুমিও চল ভানু, দেখে আসবে কি করতে হয়।

ব্যাঙ্কে যেতেই ম্যানেজারবাবু ওঁদের খাতির করে বসালেন। কাকাবাবুকে তো চিনতেনই। বিভূতিভূষণের সঙ্গে আলাপ করাতেই হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, দেখুন আপনাদের আশঙ্কা আমি বুঝতে পারছি। তবে টাকা আমরা যথেষ্ট এনে রেখেছি। ব্যাঙ্ক ফেল হবার ভয় নেই। কিন্তু আপনাদের মতো মানুষ যদি অ্যাকাউন্ট তুলে নেন একটা প্যানিক তো হবেই। সেজন্য আমার অনুরোধ, আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমি বলছি কোন ভয় নেই।

বিভূতিবাবু গজেনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, তাহলে গজেনবাবু আপনার আমার ভয়ের কি আছে! উনি তো ভরসাই দিচ্ছেন। ঠিক আছে, আমরা অ্যাকাউন্ট তুলব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

দোকানে এসে কাকাবাবু বললেন, আপনি বেশ লোক বড়দা, নিজে

---

*এই ঘটনার কিছু কালের মধ্যে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ও হুগলি ব্যাঙ্ক—সব মিলে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হয়।

বললেন, নুটুদা বলেছেন, এখানকার টাকা তুলে নিতে, আর ওখানে গিয়ে আপনি ব্যাঙ্কের হয়ে ওদের সামনে আমাকেই ভরসা রাখতে বলছেন।

বিভূতিভূষণ হেসে ফেললেন, বুঝলেন না, ভদ্রলোক এমন ভাবেই ধরে বসলেন, ওটা না বললে ভদ্রতা হয় না। ওহো, এই দেখুন, আর একটা দরকারী কথা, সিগনেট প্রেস *আম আঁটির ভেঁপু*র ফার্স্ট এডিশন শেষ করেছে। একটা হিসেবও দিয়েছে খরচের। বলেছে, আমি যা বলব তাই রয়্যালটি দেবে।

বিভূতিভূষণ সিগনেটের হিসেব ও চিঠিটা দিলেন। মন্তুদা কেষ্টকে দিয়ে ততক্ষণে লুচি তরকারি দই মিষ্টি এনে থালা সাজিয়ে দিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, বড়দা আপনি খেতে থাকুন, আমি এই সময়ে হিসেবটা দেখি।

হিসেব দেখে কাকাবাবু বললেন, বড়দা এ হিসেব ঠিকই আছে, কিন্তু এ কী রকম ব্যবসায়ী! সমস্ত বই বিক্রি করে সাড়ে পাঁচশ টাকা লোক্‌সান। অথচ খরচ কোথাও ভুল ধরেন নি। আসলে বইয়ের দামই ফেলেছেন কম।

বিভূতিভূষণ বললেন, এর ওপর আর রয়্যালটি চাওয়া যায় না, বলুন? লিখে দিই, পরের এডিশনে না হয় দেবেন, তখন তো আর ব্লক ডিজাইনের খরচ লাগবে না।

সিগনেটের পরিচালক ছিলেন দিলীপবাবু, দিলীপকুমার গুপ্ত। এক সময়ে ডি. জে কীমার বিজ্ঞাপন কোম্পানির অন্যতম কর্তা ছিলেন। সেই সুবাদেই সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে ওঁদের অনেক বইয়ের কাজ করিয়েছিলেন। বইয়ের ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ সবেতেই সৌকর্যের একটা আদর্শ এনেছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির দিকটা তলিয়ে দেখেন নি বলে সিগনেট প্রেসকে দাঁড় করাতে পারেন নি।

এরই মধ্যে সুমথকাকা বললেন, বড়দা, আপনি তো বেশ প্ল্যান প্রোগ্রাম দেন, কথাসাহিত্যের তারাশঙ্কর সংখ্যা হয়ে বেশ নাম হয়েছে। পূজায় কি করা যায় বলুন তো, কথাসাহিত্যের পুজো সংখ্যা হবে এবার।

সুমথকাকা কাকাবাবুকে বললেন, হ্যাঁ হে, পুজো আশ্বিনেই হবে তো?

আগে বলেছি, এঁদের দুজনের পরস্পরকে 'হ্যাঁ হে' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন কখনও করতে শুনি নি। কাকাবাবু বললেন, দ্যাখো, কার্তিকে

আমাদের প্রথম বর্ষ শুরু হয়েছে, সে দিক থেকে কার্তিক সংখ্যাই পুজো সংখ্যা হওয়া ভালো। পুজোর পর একটু সময়ও পাওয়া যাবে।

গৌরীদা বললেন, আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে গজেনদা, পুজো সংখ্যায় আমরা আমাদের লেখকদের ফোটো ছেপে দিই। অনেককেই পাঠকরা চেনে না। আর বড়দা, আপনি তো বলেছিলেন কাজল ধরবেন, তা পুজো সংখ্যা থেকেই ধরুন না, বেশ জোরালো আকর্ষণ হবে পুজো সংখ্যার।

বিভূতিভূষণ বললেন, না আমি পৌষ থেকে ধরব ঠিক। ঐ দ্যাখো, পুজো সংখ্যার জন্য তো একটা গল্পই এনেছি। কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি।

বিভূতিবাবুর তখনও খাওয়া শেষ হয় নি, বললেন, বাবা মন্তু, আমার কাঁধঝোলা থেকে বার কর তো গল্পটা।

মন্তুদা গল্পটির পাণ্ডুলিপি বার করলেন, গল্পটির নাম কুশল পাহাড়ী।

এই সময়েই সদলবলে এসে পড়লেন—কবিশেখর কালিদাস রায়, সুনীতিবাবু, কৃষ্ণদয়াল বসু, প্রমথনাথ বিশী, সজনীবাবু—সেকেন্ডারি বোর্ড অফিস থেকে। সজনীবাবু বিভূতিবাবুকে ভোজনরত দেখেই সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কি ভূতু, তুমি এইসব খাচ্ছ, আমায় বললে যে পিসিমার বাড়ি নেমন্তন্ন!

বিভূতিবাবু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, এই কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল, ব্যাঙ্কে গেলাম।

সজনীবাবু অনেক সময়ে বিভূতিবাবুকে সস্নেহে ভূতু বলতেন। দুজনের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা। বিভূতিবাবু প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যই বললেন, তা বোর্ডে তোমাদের কী রাজকার্য হল সজনী?

কালিদাসবাবু বললেন, বোর্ডের কথা আমার কাছ থেকে শোন বিভূতি। এতদিন ইংরেজ যা করেছে তার সব পালটানো দরকার, তা না হলে আর কী স্বাধীন হলাম। সারা বিশ্বে সিলেবাস নাকি পালটাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তাল রাখতে হবে, আধুনিকীকরণ করতে হবে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু ইংরেজের সব ব্যবস্থা খারাপ, এই ধারণা যদি জন্মায় তাহলে তো আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই বিফল বল্।

সজনীবাবু বললেন, আসলে এদের মাথায় ঢুকে গেছে, নতুন কিছু না করলে বোর্ডের দাম বাড়বে না, মান বাড়বে না।

প্রমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কালীদা, আপনি ছোট বেলায় কী ভাবে পড়াশুনো করেছেন?

কালিদাসবাবু বললেন, আমি তো আগেই একদিন বলেছি গজেনদের। ছোটবেলায় স্কুলে ইংরেজি পড়তাম, বাড়িতে সংস্কৃত পড়তাম, তাতেই ভালো বাংলা শিখেছি।

সুনীতিবাবু বললেন, আমি তো মশাই শীলেদের ফ্রী প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া শুরু করি। তাতেই তো এইখানে পৌঁছেছি। একটা কথা বলি, গর্ব করছি ভাববেন না, প্রতি অক্ষর উচ্চারণের সময়ে আমার বাংলা ভাষা বইয়ে আমি জিভের নড়ন-চড়নের যে ছবি এঁকে দিয়েছি, সেদিন এক যন্ত্রে দেখলাম, প্রতি অক্ষর উচ্চারণের সময়ে জিভের সেই ছবি ফুটে উঠছে।

কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন, আসলে সব নির্ভর করে, যাঁরা পড়াবেন তাঁরা কতটা আন্তরিক ভাবে পড়াবেন, ছাত্রদের বোঝাবেন।

কালিদাসবাবু বললেন, কৃষ্ণদয়াল, আর একটা কথা আছে, অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। তাঁরা ছেলেমেয়েদের সত্যি সত্যি শিক্ষিত করাতে চান না শুধুই পরীক্ষা-বৈতরণী পাশ করাতে চান।

মাস্টারমশাই বললেন, আরে, এই নিয়ে তো গত বছরই এক গার্জেনের সঙ্গে আমার তর্কাতর্কি হয়ে গেল। পাশ করে নি প্রমোশন পায় নি। গার্জেনের এসে ধরাধরি, বলে, আমার ছেলে আমি জানি আসছে বছর ভাল করবেই। যত তাঁকে বলি, ও তো আমাদেরও ছেলে, এক বছর এক ক্লাসে থাকাটা অসন্মান ভাবছেন কেন? ওর ভিতটা ভালো হবে। শেষে তিনি বললেন, রাগ করেই, গরু পড়িয়ে পড়িয়ে আপনাদের বুদ্ধিও ওইরকম হয়ে গেছে।

সজনীবাবু বললেন, তা আপনি জবাব দিলেন না?

মাস্টারমশাই বললেন, ছাড়ব কেন, আমিও বললাম, আমরা গরু পড়াই না বাছুর পড়াই, গরুগুলো বাড়িতে থাকে।

সবশেষে বিভূতিবাবু বললেন, আমিও মাস্টারি করি। কালীদা, বোর্ডের এইসব পাঠ্যবিষয় কারিকুলাম পাল্টাতে পাল্টাতে ছাত্রছাত্রীরা না বলির পাঁঠা হয়ে যায়। ঐ দেখুন, আমার ফেরার সময় হল। সজনী, রাগ কোরো না ভাই, পরে এলে সুধার কাছে ভাত খাবো। পুজোয় এসো কিন্তু ঘাটশিলায়। গজেনবাবু, সবাইকে নিয়ে আসবেন। ঐ কথা রইল। সুনীতিবাবু চলি, আমার প্রিয় স্তোত্রটা একবার শোনাবেন?

সুনীতিবাবু দরাজ গলায় আবৃত্তি করলেন—

"ভো গেস্ ওখেমা; কাপি গেস্ এখোন্ হেদ্‌রান্..."

এর অর্থ হল—

"তুমি পৃথিবীকে বহন করে আছো, আর পৃথিবীতে
তোমার সত্র বা আসন পেতে আছো;
তুমি যেই হও, তোমায় জানা কঠিন;
তুমি যেউস (দ্যৌষ্পিতা, পৃথক দেবতা) হতে পারো,
তুমি প্রকৃতির বিধান হতে পারো,
তুমি মানুষের চিৎশক্তিও হতে পারো;
তোমাকে প্রণাম করি; তুমি নিঃশব্দ পদক্ষেপে
মরণধর্মী প্রত্যেক প্রাণীকে তার যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছে দিচ্ছ।"

এই স্তোত্রটি বিভূতিবাবুর বড় প্রিয়।

বিভূতিবাবু চলে যাবার পর সজনীবাবুও উঠব উঠব করছেন। সুনীতিবাবু বললেন, গজেনবাবু, আপনাদের মুড়ি ক্লাব কি উঠে গেল?

কাকাবাবু বললেন, বালাই ষাট্, উঠবে কেন? ও মন্তু, কেষ্টকে দিয়ে মুড়ি ডালমুট আনাও।

কালিদাসবাবু বললেন, আর ডালমুটে বাদাম বেশি দিতে বলবি, যেন predominate করে।

এটি কালিদাসবাবুর বড় প্রিয় ইংরেজি শব্দ। সজনীবাবু উঠতে চাইছেন। প্রমথবাবু বললেন—সজনীবাবু, একটু চা খেয়ে যান।

আমাকে প্রমথবাবু সব সময়েই 'আপনি' করে কথা বলেন। ভানুবাবু, আপনি পান্থপেয়াবাসে আমাদের জন্য চা বলে দিন। পান্থপেয়াবাস নামটা যত ভালো, চা-টা তত ভালো না, তবে গরম থাকে এই যা।

সুমথকাকা বলে উঠলেন—আর বিবেচনা করুন, চা যেমন অমৃত নয়, বিষও তো নয়।

কালিদাসবাবু বললেন—হ্যাঁরে, এ ডায়ালগটা যেন চেনা চেনা।

সজনীবাবু বললেন—তারাশঙ্করের দুই পুরুষ নাটকের সংলাপ, মহাভারত নামে একটা চরিত্র আছে, তারই কথা এটা। কালীদা, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান কালের ইতিহাস লেখা হলে এটা মানতেই হবে—বিভূতি আর তারাশঙ্কর—এই দুই মহারথীর উত্থানে আমার কিছু সহায়তা আছে।

কালিদাসবাবু বললেন, বুঝলে সজনী, সে তো ভবিষ্যতের কথা, তোমার

সাহিত্যিক দূরদৃষ্টির কথা লোকে অবশ্যই বলবে, তবে একটা কথা বলি, কারও কোনো সাহিত্যের, উপন্যাসের, বা কবিতার কোনো সংলাপ বা পংক্তি যখন মানুষের মুখে প্রবাদের মতো ব্যবহার হয়, তখন বুঝতে হবে সে সাহিত্য বা কবিতা স্থায়ী হতে এসেছে। যেমন শরৎ সাহিত্যের অনেক কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

গজেনবাবু বললেন, তবে সবাই যে এসব কথা ব্যবহার করে তা নয়, সাহিত্য-সচেতন না হলে তাদের কাছে এসব কথা অচল।

কালিদাসবাবু বললেন, সে তো বটেই, এমন কি পাঠকদের মধ্যেও আমি লক্ষ্য করেছি, তিনরকম পাঠক আছে—এক একেবারে গোলা পাঠক, সময় কাটানোর জন্য যে কোনো একটা বই পেলেই হল। আর এক ধরনের পাঠক, বইটা ভালো লাগলে তবেই উল্টে দেখল লেখক কে, নামটা মনে রাখার চেষ্টা করে। আর সব থেকে ভালো পাঠক নিজের পছন্দের লেখকের বই বেছে বেছে পড়ে, কোথাও ভালো লাগলে বা খারাপ লাগলে বইয়ের মার্জিনে মন্তব্য লেখে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। আর আজকাল তো অধ্যাপক শিক্ষক গবেষকরাও সব বই পড়ে না, যেটুকু দরকার তাই পড়ে।

সজনীবাবু বললেন, তাহলে এত বই ছাপাচ্ছে কেন পাবলিশাররা, আর সে বই যাচ্ছেই বা কোথায়?

কালিদাসবাবু বললেন, আরে লাইব্রেরি আছে না, সে সবের তাক ভরাতে হবে তো। বিধান রায় নাকি বলেছেন, প্রতি গ্রামে একটা করে লাইব্রেরি করতে হবে। সরকার তার ব্যবস্থা করবে। আরে, তবু তো তোদের বই গজেন বিক্রি হয়, লোকে কেনে, আমাদের কবিদের অবস্থা কি বল তো?

প্রমথবাবু বললেন, কেন কালীদা, আপনার কবিতা তো কতজনের মুখস্থ।

কালিদাসবাবু বললেন, দূর, শুধু ঐ পাঠ্য বইয়ে পড়া ছাত্রধারা কবিতাটা জানে—'বর্ষে বর্ষে দলে দলে' ঐ একটা লাইনই বলে। যখন সভায় ডাকার জন্য আসে, আমি জানলা থেকেই বলি, *ছাত্রধারা* ছাড়া অন্য কবিতা জানো তো বল, তবে যাবো। দেখেছি, শতকরা ৯৯জনই জানে না। তখন বলি হালে কী বই পড়েছ? উত্তর পাই, প্রবোধ সান্যালের *আঁকাবাঁকা*। আমি বলি, তাকেই নিয়ে যাও সভায়।

বলতে বলতেই প্রবোধবাবু ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কী কালীদা, আমার নাম কেন উঠল?

কালিদাসবাবু বললেন, বলছিলাম তোর বই যত লোকে পড়ে আমার তার এক শতাংশও পড়ে না।

প্রমথবাবু বললেন, ভানুবাবু, আজ যে এতক্ষণ আছেন? কলেজ নেই।

বললাম, না, আজ ছুটি।

প্রমথবাবু বললেন, আমার সহকর্মীদের মধ্যে কলেজে কারা কারা আছেন? বাংলা কে কে পড়ান।

আমি বললাম, বিভূতিবাবু—বিভূতিভূষণ কাঁঠাল আর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রমথবাবু বললেন, বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমি পড়িয়েছি। আর অসিত তো আমার ছাত্র।

আমি বললাম, অসিতবাবু খুব ভালো পড়ান। পড়াবার সময়ে আমাদের এই সব বইয়ের নাম করেন। সব যেন মুখস্থ।

প্রমথবাবু বললেন, হ্যাঁ, অসিত খুব ভাল ছাত্র, পড়াশুনো করে এখনও। কালীদা, আপনার দেখা না-পড়ুয়া শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে অসিত কিন্তু পড়ে না।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, আগেও বলেছি, তখন এখনকার মতো ঘিঞ্জি হয় নি। একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল, চকচকে সোনালী ফ্রেমের রোদ-চশমা, মাথার চুল সামান্য বড়, তবে ঠিক বাব্‌রি নয়, উজ্জ্বল কান্তি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, জরি পাড় ধুতি প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছে, ঘরে এসে ঢুকলেন এক ব্যক্তি!

সুমথকাকা বলে উঠলেন, আরে শৈলজা-দা যে, কদ্দিন পরে এলেন! এ পাড়া তো ভুলেই গেছেন!

ইনি যে শৈলজানন্দ এঁদের কথায় পরে বুঝলাম।

শৈলজাবাবু বললেন, হ্যাঁ আসলে আমাদের সময়টাই যে বড় কম। স্টুডিও পাড়াতেই সময়ের বেশির ভাগ কেটে যায়। প্রবোধ, তোর খবর কী? কালীদা ভালো আছেন? হ্যাঁ গজেন, যে জন্যে এলাম, তোমরা পাঁচজনের উপন্যাস নিয়ে একটা অমনিবাস করেছিলে, আমার প্রভাবতী দেবীর আর কার যেন উপন্যাস ছিল। ওই বই একটা পাওয়া যাবে?

কাকাবাবু বললেন, না শৈলজাদা, সে তো অনেকদিন ছাপা নেই।

প্রবোধবাবু বললেন, শৈলজা, তুমি কি আর সাহিত্যে ফিরবে না? এর পর কিন্তু খুব দেরি হবে যাবে। প্রেমেনও ফিল্ম নিয়ে পড়ে আছে, ও তবু এক-আধটা কবিতা লেখে। তুমি একেবারেই সম্পর্ক তুলে দিলে। এর পর দেখবে পাঠক ভুলে গেছে।

শৈলজানন্দ বললেন, না না ঠিক বলেছ, এবার লেখা ধরব। উঠি তাহলে।

সেই ভাবেই ধুতির কোঁচা লুটোতে লুটোতে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন শৈলজানন্দ।

শৈলজানন্দের *শহর থেকে দূরে, মানে না মানা* প্রভৃতি ছবি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমার এই প্রথম চাক্ষুষ দেখা শৈলজানন্দকে। কালিদাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে প্রবোধ, শৈলজানন্দের উপার্জন বেশ ভালোই বল্, দেখে তো তাই মনে হয়।

প্রবোধবাবু বললেন, আগে তো ভালোই ছিল। এখন শুনছি তত ভালো নেই। নিজের ছবি কয়েকটা পর পর ফ্লপ করল। এখন চিত্রনাট্যই বেশি লেখে। কালীদা, ও ফিল্মের টাকা যে পথ দিয়ে আসে, সেই পথ দিয়েই অদৃশ্য হয়। তারপর শুনছি, শৈলজার এখন কোনো নেশাই বাকি নেই। সাপের ছোবলও নাকি নেয়।

কৃষ্ণদয়ালবাবু বললেন, সাপের ছোবলের নেশা! বলেন কি মশাই? সে তো বিষ নেওয়ার নেশা!

গৌরীদা বললেন, মাস্টারমশাই, ও সাপের ছোবলের বিষ থেকে আফিমের বিষ আরও জোরালো। বহরমপুরে আমার ঠাকুর্দা রোজ রাত্রে এক বাটি দুধের সঙ্গে এক ডেলা আফিম খেতেন। বাথরুম করতে রাত্রে

নেমেছেন উঠানে, সাপে কামড়ালো। ঠাকুর্দা বললেন, গেল রে কেষ্টর জীবটা। তখন বুঝি নি কথাটা। সকালে উঠে দেখি উঠোনে একটা বিষাক্ত সাপ মরে পড়ে আছে। ঠাকুর্দার রক্তে আফিমের মাত্রা এত বেশি যে সাপ সহ্য করতে পারে নি। ঠাকুর্দা বহাল তবিয়তে দেখি তামাক খাচ্ছেন।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যাওয়ায় কাকাবাবু বললেন, ও গৌরী, মন্টুদা গান গাইবেন বালিগঞ্জ প্লেসে, আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শনিবার, ভুলো না।

কালিদাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মন্টুদা কে রে?

আমিও এই নাম প্রথম শুনলাম। কাকাবাবু বললেন, দিলীপদা, দিলীপকুমার রায়।

মনে পড়ল, ওঁর একটি বই আছে আমাদের, *উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল*। গৌরীদার মিত্রালয়ে আছে—*আবার ভ্রাম্যমাণ, আমার বন্ধু সুভাষ*।

সুনীতিবাবু এতক্ষণ সব শুনছিলেন বা দেখছিলেন। এবার মুখ খুললেন, দিলীপবাবু গান করেন বেশ ভালো, তবে ওঁর কবিতা তত জমে না। আমার সঙ্গে একবার তর্কই বেধে গেল। 'পেতে' শব্দের সঙ্গে 'গেতে' মিল দিয়েছেন। বললাম, 'গেতে' শব্দের মানে কি? তা দিলীপবাবু বললেন, বুঝলেন না? 'পাইতে' থেকে যেমন 'পেতে', তেমনি 'গাইতে' থেকে 'গেতে'। আমি বললাম, বাংলা ক্রিয়াপদ ওভাবে দুবার বদলানো যায় না। 'পাইতে'র থেকে 'পেতে' হতে পারে, 'গাহিতে'র থেকে একবার 'গাইতে' হয়েছে, আবার 'গেতে' তা থেকে হয় না। উনি এটা আমার বৈয়াকরণিক একগুঁয়েমি বলে উড়িয়ে দিলেন।

কালিদাসবাবু বললেন, এ তো রীতিমতো গায়ের জোরে কবিতা লেখা সুনীতি।

আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে সাতটা। সকলের সঙ্গে বেরোলেন গৌরীদা। তাঁদের পরে কাকাবাবু, সুমথকাকা। আমাদের কাজ সেরে দোকান বন্ধ করতে করতে আরও এক ঘণ্টা লাগল।

কথাসাহিত্যর পুজো সংখ্যা বেরোল, লেখকদের ছবি দিয়ে। সাড়া পড়ে গেল পত্রিকার বাজারে। পুজোর মধ্যেই সব কপি নিঃশেষিত।

পুজোর আগে সাধারণত মহালয়ার দিন বইপাড়া বন্ধ থাকে। তারপর দুর্গা ষষ্ঠী পর্যন্ত কাজ-কারবার চালু থাকে। সপ্তমী থেকে লক্ষ্মীপুজোর ভাসানের দিন পর্যন্ত বইপাড়া বন্ধ। যবে থেকে বইপাড়ায় কাজে ঢুকেছি, তখন থেকেই দেখেছি এই নিয়ম, এখনও তা চালু আছে।

এই পুজোর ছুটিতেই সাহিত্যিকদের দল বেঁধে ঘাটশিলায় যাবার কথা। কিন্তু দল বাঁধার কাজে প্রথমেই বাধা এল। মহালয়ার পর দোকানপাট খুলে বসতেই হরিদ্বার-কনখল্‌ থেকে গজেনবাবুর মায়ের পাণ্ডার চিঠি এল, গজেনবাবুর মা খুব অসুস্থ, ওঁর এখনই যাওয়া দরকার। গজেনবাবু অগত্যা হরিদ্বার রওনা হলেন। আর সব সাহিত্যিকও ঘাটশিলা যেতে পারলেন না। কেবল প্রমথবাবু ঘাটশিলায় ফণিবাবুর বাংলো ভাড়া নিয়েছিলেন, প্রমথবাবু আর সুমথবাবু দুজন সপরিবারে ঘাটশিলা রওনা হলেন পুজোর ছুটি পড়বার আগেই।

পুজোয় ঘাটশিলার শোভা হয় মনোরম। অল্প ঠাণ্ডার আমেজ, গরম নেই। কিন্তু সুমথবাবুর ঠাণ্ডার ভয় না থাকলেও, প্রমথবাবুর ছিল। ঠাণ্ডা সহজেই ওঁকে কাবু করত। পুজোর পর বিজয়া সম্মিলনীতে ঘাটশিলা

গালুডি শিমুলতলা মধুপুর জায়গাগুলিতে সাহিত্যিকরা গেলেই আমন্ত্রণ পড়ত। ঘাটশিলায় বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে হবে বিজয়া সম্মিলনী, সেখানে প্রমথবাবু, সুমথবাবুর আমন্ত্রণ এল। বিভূতিবাবু তো আছেনই। বিজয়া সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা বিভূতিবাবুকে ধরলেন, যাতে এই সভায় প্রমথবাবু, সুমথবাবুকে নিয়ে যাওয়া যায়। সুমথবাবুকে রাজী করাতে অসুবিধা হল না। কিন্তু প্রমথবাবু কিছুতেই রাজী হন না, বললেন, অক্টোবরের শেষ, নতুন ঠাণ্ডা, আমার এখনই সর্দি-কাশি শুরু হয়েছে।

প্রমথবাবু পরে বলেছিলেন, বিভূতিবাবু সেদিন বলেছিলেন, বাংলোর সামনে মাঠের মধ্যে একটা বড় পাথরের ওপর বসে, এত ভয় করলে চলে না প্রমথ, দ্যাখো তো আমায়, পাথরের শরীর।

সেই পাথরের শরীরই কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ল, বিভূতিভূষণ বিজয়া সম্মিলনী থেকে ফিরলেন গাড়িতে বমি করতে করতেই। ইতিমধ্যে পুজোর পর গজেনবাবু ফিরে এসেছেন হরিদ্বার থেকে। বিভূতিভূষণের অসুস্থতার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন ঘাটশিলা, রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে। ঘাটশিলায় নেমে রিকশায় যেতে যেতেই শুনলেন, বিভূতিভূষণ এই মরজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। বিভূতিভূষণ শেষযাত্রার পর গজেনবাবু কলকাতা রওনা হলেন। (১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর সেদিনটি।)

পরে রোগলক্ষণ শুনে মনে হয়, ব্যাধিটা হয়তো করোনারি হার্ট অ্যাটাকই ছিল।

কলেজ স্ট্রীটে এই দুঃসংবাদ প্রথম দিলেন কানুমামা, বিভূতিভূষণের মামাশ্বশুর নিরঞ্জনবাবু। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

গজেনবাবু তখনও ঘাটশিলা থেকে ফেরার পথে, ট্রেনে। মৃত্যুসংবাদ আসতেই সুমথকাকা, মন্তুদা, গৌরীদা, আমি চলে এলাম তারাশঙ্কর-বাবুর বাড়ি। তখন তো জেরক্স মেশিন আসে নি। জীবনী একটা দাঁড় করিয়ে কপি করতে বসে গেলেন সবাই। তারাশঙ্কর বললেন, ভানু, তুমি আমার ডেস্কের এধারে বসে কিছু কপি কর। সমীহভরে তাঁর থেকে একটু দূরেই থাকতাম। সেই প্রথম তারাশঙ্করের অতি কাছে যাওয়া। বিভূতিভূষণই যেন নিয়ে গেলেন হাত ধরে। বিভূতিভূষণের ছবি ছিল কিছু, কথাসাহিত্যের পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। গৌরীদার ফোটো তোলার শখ ছিল। সেই কপি করা জীবনী ও ছবি পৌঁছনো হল সব সংবাদপত্রের অফিসে।

ঘরে ডাক্তার ছোটভাই। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দাদাকে বাঁচাতে পারলেন না।

এই ব্যর্থতা তাঁকে অত্যন্ত মনোবেদনা দিয়েছিল। ছোটভাই নুটুবিহারী যখন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে আসেন কলকাতায় দাদার বন্ধুবান্ধবদের, তখন কোথাও হয়তো তাঁর চিকিৎসার সমালোচনা হয়েছিল। অথবা এমনও হতে পারে, সাহিত্যিক সমাজ যে তাঁর দাদাকে এত ভালোবাসত তা তিনি হয়তো আগে বুঝতে পারেন নি। কাকীমা তো তাঁর অশৌচ দশা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। নুটুবিহারী দাদার শ্রাদ্ধের আগেই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে চাইলেন। কদিনের মধ্যেই ঘাটশিলার 'গৌরীকুঞ্জে'র আনন্দময় সংসারে শোকের স্তব্ধতা নেমে এল। তারাদাস তখন মাত্র সাড়ে তিন বছরের শিশু।

বিভূতিভূষণের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কাজকর্মের আগেই গজেনবাবুরা আবার ঘাটশিলায় গেলেন। যে চৌকিতে বিভূতিভূষণের শয্যা হত, শ্রাদ্ধের সময়ে সেই চৌকিতে বিভূতিভূষণের ছবি রাখার আগে পুরনো তোশক তুলতে দেখা গেল, কিছু হিসেবের কাগজ ও টাকা প্রায় বারোশ-তেরোশর মতো। রমা দেবী গজেনবাবুকে কাগজ টাকা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী ব্যাপার ঠাকুরপো?

কাকাবাবু দেখেই বুঝলেন, ভাগ্নী উমার বিবাহের জিনিসপত্র কেনাকাটার হিসেব ও বাকী টাকা।

গজেনবাবু বললেন বৌদিকে, বড়দা ভালো করে দেখবেন বলে সব আমাকে এখানেই রাখতে বলেন। দেখেনও নি খুলে।

টাকা পয়সা সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহ, এমন বিষয়-বিবিক্ত মানুষ কজন আছে!!

দুই সদ্য পতিহারা রমণী ঘাটশিলার পাট উঠিয়ে চলে এলেন। এখানে রইল, তাঁদের আনন্দময় জগৎ-এর কিছু স্মৃতি, ব্যবহৃত কিছু আসবাবপত্র।

বিভূতিভূষণ যেদিন মারা যান, সেদিনই বার্নার্ড শ'রও তিরোধান ঘটে। বার্নার্ড শ বেশ কিছুদিন যাবৎই ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের মন তৈরি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণের মৃত্যুসংবাদ এল তাঁর বন্ধুদের কাছে—নীলাকাশে বজ্রপাতের মতো। সকলের ভালোবাসার মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বিভূতিভূষণ এভাবে চলে যাবেন কেউ ভাবতেই পারেননি।

বিভূতিভূষণের অনুরাগী বন্ধুরা—গজেনবাবু, সজনীবাবু সবাই মিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল-এ বিভূতিভূষণের স্মরণসভার

আয়োজন করলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি হলেন। এত জনসমাগম হবে ধারণা ছিল না। হলের বাইরে সিঁড়িতে পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুনেছে। কোনও সাহিত্যিক বাকি ছিলেন না তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে।

কথাসাহিত্যের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বেরোল বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংখ্যা রূপে, যেখানে সংবর্ধনা সংখ্যা বেরোবার কথা ছিল। এই সংখ্যায় বিভূতি-সুহৃদদের আন্তরিক দুঃখ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হয় তাঁদের বিভিন্ন লেখায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনার নাম দিয়েছিলেন *বিভূতি বন্দ্য*। কবিশেখর তাঁর *মানুষ বিভূতি-ভূষণ*-এ লিখেছিলেন—

দুরু দুরু ছোট বুক ছোট সুখ ছোট দুখ
তাই নিয়ে মেতে আছ সারাটি জীবন।
বড় বড় দেশ ভরা ক্ষুধা, শোক, রোগ, জরা
তার কথা লিখিতেছে আরো কতজন।
এতটুকু সোনা নিয়ে হাতুড়ি ও ছেনি দিয়ে
গড়িছ কানের দুল করি ঠুক ঠুক,
নিয়ে লোহা ইঁটকাঠ বাড়িঘর, ফিটফাট
গড়িছে কতই তারা, তাহাই গড়ুক।
তাহাদের সেই কথা স্মরিয়া পেয়ো না ব্যথা,
হল ঘরে সভা হবে ঘন জনতার,
বাংলার ঘরে ঘরে বধূদের শ্রুতি 'পরে
শোভিবে তোমার দুল তুমি মণিকার।

এই কবিতাটি অবশ্য আগেই লিখেছিলেন কবিশেখর। বিভূতিভূষণের জন্মদিনে পড়েছিলেন।

প্রমথনাথ বিশী একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছিলেন—*অর্ধনারীশ্বর*।

তারাশঙ্কর *বিভূতিভূষণ* নিবন্ধে লিখেছিলেন—ট্রেনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিভূতি তাঁর উচ্ছিষ্ট হাত দুখানি স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—দে না ভাই হাত দুটো ধুয়ে। বড্ড খেয়েছি। উঠতে কষ্ট হচ্ছে।

তারাশঙ্কর আরও লিখেছিলেন ওই নিবন্ধে—আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলাম তারপর ধুয়ে দিলাম তাঁর হাত। মনে মনে বললাম—'মানুষের মধ্যে যাকে খুঁজি তিনিই যদি বলে থাকেন এ কথা তবে এরপর তাঁকে স্বরূপেই দেখা দিতে হবে।'

গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর *অনাসক্ত বিভূতিভূষণে* লিখেছিলেন—প্রবাসী

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশন থেকে ফিরে এসে তারাশঙ্করবাবু বললেন,—ওহে কানপুরে গিয়ে আমার লাভ কি হয়েছে জানো? বিভূতিকে পেয়েছি আমি। একদিন ওকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাশা করেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি ওকে। এবার এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ওকে বিশেষ করে আবিষ্কার করলাম যেন। ওর সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

বিভূতিভূষণের তিরোধানের পর প্রকাশিত *কুশল পাহাড়ী* গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছিলেন—তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি নিশ্চিত রূপে মহৎ ছিলেন। সে পরিচয় আমি জানি। সে কথা আজ এইক্ষণে নয়। বেদনায় অনেক কথা বলিতে মন রাজী হয় না। আজ সাশ্রুনেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবি। বাংলা সাহিত্যমন্দিরের ঘৃত দীপ নিভিয়া গেল। নূতন কালে বৈদ্যুতিক আলোকে মন্দির দীপ্ত হয়তো হইবে, কিন্তু ঘৃতদীপ?

হে অমৃতপথযাত্রী—হে অমৃতময় আনন্দের তপস্বী সাধক—আমার প্রণাম গ্রহণ কর। হে বন্ধু—হে প্রিয়বর,—আমার—তোমার অনুরাগী পাঠকবৃন্দের অঞ্জলি গ্রহণ কর।

দুর্যোধন বলেছিলেন—দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে ব্যবধান। আরও বলেছিলেন—এক পূর্ব উদয়শিখরে দুই ভ্রাতৃ-সূর্যলোক কিছুতে না ধরে। কিন্তু আমরা দেখলাম স্বচক্ষে বাংলা সাহিত্যের বনস্পতি-সদৃশ দুই বন্দ্যোপাধ্যায় মহারথী কীভাবে ঐকান্তিক সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ ছিলেন।

২৭
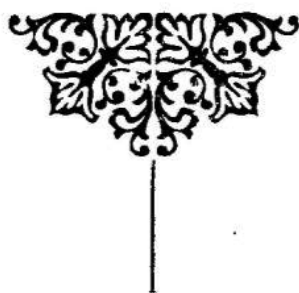
১৯৫০-৫১ সালের রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত হল বিভূতিভূষণের *ইছামতী* উপন্যাসটি। এই মরণোত্তর সম্মান যাতে বিভূতিভূষণের গ্রন্থকে দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে সজনীকান্ত দাসের প্রচেষ্টা ছিল সর্বাধিক।

পরের বছর ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের বন্ধু সাহিত্যিকরা বিভূতি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন। সকালের নাগপুর প্যাসেঞ্জারের প্রায় একটা কামরা ভর্তি সাহিত্যিকরা গিয়েছিলেন ঘাটশিলায়। ঘাটশিলা প্ল্যাটফর্মেই তাঁদের জমায়েত দেখে হঠাৎই এক বাউল গায়ক এসে নেচে নেচে গান ধরল। তার গানের মধ্যে একটা ধুয়া বার বার আসছিল—সজনী, আর কি খাবি? ও সজনী, আর কি খাবি।

সজনীবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—আচ্ছা এ বার বার আমার নাম করছে কেন?

সুমথকাকা বললেন—ও কি আর আপনার নাম বলছে, সজনী বলতে যা বোঝায় তাই বলছে।

সজনীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম, তা এই সময়ে এই গানই ওকে গাইতে হবে কে বলেছিল? বিভূতি বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে খেয়ে অসুখ ধরাল, আর গান বাঁধল আমার নামে!

গজেনবাবু হেসে বললেন—সজনীদা, আপনার অতীত রেকর্ডও ভালো না। মালদায় সভা করতে গিয়ে দুদিনে তেইশটা মিল খেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে যথেচ্ছ আম আর আইসক্রিম। কলেরিন ডায়রিয়া হল। বলাইদা আপনাকে এক কুঁজো জল আর একটা গেলাস দিয়ে একটা ঘরে আটকে রেখেছিলেন, মনে আছে?

সজনীবাবু বললেন—আরে, সে সব কবেকার প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। সুধা, ও সুধা, আমার খাওয়া-দাওয়া এখন অনেক ধরা-কাঠ হয়েছে না?

প্রমথবাবু সরস টিপ্পনি কাটলেন—সজনীবাবু, আপনি এতবার বৌদিকে ডাকছেন, আমাদের বাজার খারাপ করছেন। এরপর আপনার নাম পালটে আমরা সুধাকান্তবাবু বলব।

সজনীবাবুর দুরবস্থা দেখে মজা পেয়ে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বিভূতিভূষণের বড় ইচ্ছে ছিল সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে ঘাটশিলায় একটা সাহিত্য মজলিশের আড্ডা বসান। তিরোধানের ঠিক আগের জন্মদিনে সেরকম একটি প্রবল আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয় নি। এই দিনে তাঁর 'গৌরীকুঞ্জে'র প্রাঙ্গণে তাঁর সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় বিভূতিভূষণের নানা প্রসঙ্গ ও তাঁর বিষয়ের স্মৃতিচারণে অপরাহ্ণবেলাটি মুখর হয়ে উঠেছিল।

বিভূতিভূষণ তো পরলোকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর স্বর্গত আত্মার কি এই সাহিত্যিক মজলিশ দেখে তৃপ্তি হয়েছিল? কে জানে!

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

১

জীবনপথিক বিভূতিভূষণ

(১৮৯৪-১৯৫০)

বিভূতিভূষণের জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয়ে। গ্রামটির নাম মুরাতিপুর। এটি কাঁচড়াপাড়ার কাছে। অনেকে এটিকে আবার ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামও বলেন। বিভূতিভূষণের জন্ম বাংলা ১৩০১ বঙ্গাব্দে, ২৮ ভাদ্র তারিখে, ইংরেজি ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। বিভূতিভূষণের পৈতৃক বাসস্থান উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁর কাছে চালকি বারাকপুর গ্রামে। গ্রামটি ইছামতীর ধারে। এটি বনগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। আগে বনগাঁ মহকুমা যশোর জেলার অন্তর্গত ছিল। দেশভাগের পর এই অংশটি চব্বিশ পরগনা জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। চব্বিশ পরগনা জেলা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভাগ হবার পর এটি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্যতম মহকুমা।

বিভূতিভূষণের পিতার নাম মহানন্দ, মাতা মৃণালিনী দেবী। বিভূতি-ভূষণেরা পাঁচ ভাই-বোন ছিলেন। বিভূতিভূষণ সর্বজ্যেষ্ঠ। বিভূতিভূষণের কোনও বোনকে আমরা দেখিনি। তবে ছোট ভাই নুটুবিহারীকে দেখেছি। ঘাটশিলায় ডাক্তারি করতেন। সেখানে ভালো পসার ছিল।

বিভূতিভূষণের পিতা কথকতা করতেন, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বিভূতিভূষণের পিতৃবিয়োগ হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেই বিভূতিভূষণকে পড়াশোনা চালাতে হয়। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা করে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯১৬ সালে রিপন কলেজ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯১৮ সালে ওই কলেজ থেকেই ডিসটিংশন নিয়ে বি এ পাশ করেন। এরপর এম এ ও ল ক্লাসে ভর্তি হন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে প্রথামাফিক পড়া এগোয়নি। কিন্তু

অধ্যয়নে প্রবল ঝোঁক থাকায় সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।

তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়েই বিভূতিভূষণের প্রথম বিবাহ হয় ১৯১৭ সালে গৌরী দেবীর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের এক বৎসর পরেই গৌরী দেবীর অকালমৃত্যু হয়। প্রথম স্ত্রীর অকালমৃত্যু বিভূতিভূষণকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিল।

বি এ পাশ করার পর পড়াশোনা না এগোনোর কারণ খানিকটা প্রথমা স্ত্রীর অকালমৃত্যু। ছোট গল্প রচনা প্রভৃতি সাহিত্যচর্চার মধ্যে থাকলেও এই পত্নী-শোক তিনি ভুলতে পারছিলেন না। পরলোকতত্ত্ব ও আত্মা বিষয়ে চর্চা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চলে নিয়ে পড়াশোনা করতে করতে তাঁর মনে অরণ্যবাসের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়ে নাইরোবি থেকে আসা পরিচয়ের আড্ডার অন্যতম সদস্য শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই পরিচয়ের একটি অন্যতম সুফল হল বিভূতিভূষণের *চাঁদের পাহাড়* গ্রন্থের ছবিগুলি শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ এঁকে দেন। আর তিনিই বিভূতিভূষণকে বলেন, অরণ্যবাসের জন্য অতদূরে যেতে হবে না। আপনি তো ঘোষেদের জমিদারি দেখাশোনা করেন, ওঁদেরই ভাগলপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে লবটুলিয়া ফুলকিয়া বৈহারে যথেষ্ট জঙ্গল মহাল আছে। মহালিখা-রূপ পাহাড় আছে। এখানে যা নির্জনতা ও ভয়াল সৌন্দর্য তা আফ্রিকা অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়।

সেই পরামর্শ মতো বিভূতিভূষণ ভাগলপুর যান। এখানেই *পথের পাঁচালী* রচনা শুরু করেন। তারপর লবটুলিয়া-ফুলকিয়া বৈহারে বাস ও *আরণ্যক* গ্রন্থের রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *আরণ্যক* গ্রন্থখানি তাঁর প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীকে উৎসর্গিত।

পথের পাঁচালী রচনার পর *অপরাজিত* গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। এর আগে ও পরে তিনি হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া মাইনর স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনাভি গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। খেলাতচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু অটুট ছিল। শোনা যায়, তাঁরই পরামর্শে খেলাতচন্দ্র ঘোষ ৬৪ এ ধর্মতলা স্ট্রিট-এ একটি স্কুল খোলেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন ক্ল্যারিজ সাহেব। এই স্কুলটিরই ছবি পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের *অনুবর্তন* উপন্যাসে। ক্ল্যারিজ সাহেব হয়েছেন ক্লার্কওয়েল সাহেব। স্কুলটির নাম ছিল খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন। এখানে

বিভূতিভূষণ শিক্ষক ছিলেন—ইংরেজি ও বাংলা পড়াতেন। এই স্কুলে বিভূতিভূষণের অন্যতম ছাত্র ছিলেন বর্তমানকালের বিখ্যাত ই এন টি চিকিৎসক আবিরলাল মুখোপাধ্যায়।

আবিরলালের একটি ছোট কিন্তু মনোরম স্মৃতিকাহিনি আছে, সেটির নাম *আমার শিক্ষক বিভূতিভূষণ*। এখানে বিধৃত আছে শিক্ষক বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আবিরলালের সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ—তাঁকে সরাসরি শিক্ষক হিসেবে পাই ক্লাস থ্রি'তে উঠে। আমরা ক্লাসে সব সুদ্ধ ৩০ জনের মতো ছাত্র ছিলাম। উনি শুধু আমাদের বাংলাই পড়াতেন না, সেই সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাসের ক্লাস নিতেন। ক্লাসে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতেন, পরনে থাকত সাদা ধুতি আর ফিকে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। যখনই ক্লাসে আসতেন হাতে থাকত একটি চাঁপা ফুল। বগলে প্রায়ই ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন নামে একটি ছবিওয়ালা পত্রিকা থাকত।

লবটুলিয়া-ফুলকিয়া অরণ্যবাসের পর ঘাটশিলা-গালুডির আরণ্য সৌন্দর্যের প্রতি বিভূতিভূষণ আকৃষ্ট হন। অবশেষে ঘাটশিলায় একটি বাড়ি কেনেন। প্রথমা স্ত্রীর নামে এই বাড়িটির নামকরণ করেন "গৌরীকুঞ্জ"।

বিভূতিভূষণের ঘাটশিলার বাড়ি—গৌরীকুঞ্জ

যুদ্ধের সময়ে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেলে বিভূতিভূষণ মধ্যে 'গোরক্ষণী' সভার প্রচারকের কাজ নিয়ে পূর্ববঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, আরাকানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি স্বগ্রাম বারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতা করে গেছেন শেষ পর্যন্ত।

১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় বিবাহ হয় রমা দেবীর সঙ্গে। তাঁদের একমাত্র সন্তান বাবলু—একালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রমা দেবীর অনুজ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিবাহের আগেই বিভূতিভূষণের অনুরক্ত ও ঘনিষ্ঠজন হয়ে উঠেছিলেন। রমা দেবীর পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বনগাঁ অঞ্চলে সরকারি অফিসার ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে সাহিত্যচর্চার আবহাওয়া ছিল। বিবাহের আগে রমা দেবীর বহু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্যচর্চাই দুই পরিবারের সেতু হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিবাহের কিছু আগে বিভূতিভূষণের এক ভগ্নী ইছামতীর জলে ডুবে যান। তাঁর পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বিভূতিভূষণ বড়ই বিপাকে পড়েন। ষোড়শীবাবুর পরিবার সে সময় পাশে না দাঁড়ালে বিভূতিভূষণ আরও অসহায় হয়ে পড়তেন। বিভূতিভূষণের এই ভাগ্নীটি পরবর্তীকালের উমা দেবী—কথাসাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের শুধু ঘনিষ্ঠ অনুরাগী মাত্র ছিলেন না। তিনি বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী ছিলেন। তন্নিষ্ঠ আগ্রহে তিনি নানা তথ্য দিয়ে গেছেন রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থ-পরিচয়ের মাধ্যমে। তা বর্তমান ও অনাগতকালের গবেষকদের কাছে মূল্যবান আকর বিশেষ। এই জীবনী তথ্যটিও চণ্ডীদাসবাবুর লেখা থেকে সংগৃহীত।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া পত্নী রমা দেবীর দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র দশ বছরের মতো। ১৯৪০ সালে বিবাহ হয় আর ১৯৫০-এর ১ নভেম্বর বিভূতিভূষণের আকস্মিক তিরোধানে রমা দেবীর দাম্পত্য জীবনের অবসান। ১৯৫০-এর জানুয়ারিতেই বিভূতিভূষণের সর্বশেষ উপন্যাস *ইছামতী* প্রকাশিত হয়। এই বইটি পত্নী রমা দেবীকে উৎসর্গ করেন বিভূতিভূষণ। উৎসর্গপত্র এই রকম—কল্যাণী / রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। রমা দেবীকে বিভূতিভূষণ 'কল্যাণী' বলে ডাকতেন।

বিভূতিভূষণের বিবাহপূর্ব জীবনে, বিশেষ করে কলেজ জীবনের বন্ধুদের মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। *আজি হতে শতবর্ষ আগে* গ্রন্থে নীরদবাবু লিখছেন, "আমি রিপন কলেজে আই এ ক্লাসে ভর্তি হইলাম.. কলেজে এই সময়ে আমার সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার সহিত আমার পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। ... (আমার) বিবাহের পরে আমার পরিবারের সহিত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। ... বিবাহের পূর্বে আমি যখন ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে থাকিতাম, তিনিও তখন ওইখানে থাকিতেন। ... তখনই আমি তাঁহার প্রথম উপন্যাস "পথের পাঁচালী"র কয়েক পৃষ্ঠা দেখিবার সুযোগ পাই।"

Thy Hand, Great Anarch! ১৯২১-৫২ গ্রন্থে দেখতে পাই— বিভূতিভূষণ-প্রসঙ্গ বেশ কিছু জায়গা জুড়ে আছে। নীরদবাবু লিখছেন— "৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকি। একদিন আমি ওপরে উঠছি, দেখি এক তরুণ নামছেন। তরুণটি আমাকে দেখেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—নীরদ! আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বিভূতিভূষণকে চিনতে বিন্দুমাত্র দেরি হল না। ১৯১৪-১৬ দুই বছর আমরা সহপাঠী ছিলাম। বিভূতিভূষণের পড়াশোনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে তখনই বেশ খ্যাতি ছিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনি আমার পাশের ঘরেই থাকেন। বললেন, তিনি বিকেলে আসবেন।

"বিভূতিভূষণের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতায় জানতে পারি, তিনি অর্থের অভাবে এম এ পড়তে পারেননি। তাঁর পত্নী বিয়োগের কথাও জানতে পারি। প্রবাসীতে তাঁর একটি গল্প তখনই বেরিয়েছে, তিনি জানালেন। তাঁর তখন পথের পাঁচালী উপন্যাসটি, এইটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখা ও মাজাঘষা চলছে। আমি পাণ্ডুলিপিটি পড়লাম। বইটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ রইল না। আমি তাগাদা দিয়ে বইটা শেষ করালাম। প্রথমে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থাও হল। এর দশ বছরের মধ্যেই বিভূতিভূষণ একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক বলে গণ্য হলেন।

"তাঁর নির্বান্ধব জীবনে আমার সঙ্গ তাঁর খুব ভালো লাগত।

"এই মেসে প্রথম দেখা হওয়ার দিন বিকেলে তিনি আমার ঘরে এলেন। আমার টেবিলের বইপত্র দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁর এই জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে আমার খুব ভালো লাগত। বিভূতিভূষণ জানালেন, বছর দুই আগে তিনি আমাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে স্তূপীকৃত বই সামনে নিয়ে পড়াশোনা

করতে দেখেছিলেন। তাঁরই এক কলেজ-বন্ধুর এই জ্ঞান চর্চার আগ্রহ তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। তাঁর কাছেই শুনি, তিনি তখন কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দক্ষিণে একটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

"তাঁর ছাত্রজীবনের আর্থিক কষ্ট, তার পারিবারিক জীবনের ওঠা-পড়া নিয়ে *অপরাজিত* উপন্যাসটি তিনি লেখেন। প্রথমা পত্নীর অকাল বিয়োগ তাঁকে মানসিকভাবে খুব আঘাত দেয়। তাঁকে পরলোক, আত্মা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। তবে এই বিষয়ে আমার কোনও আগ্রহ না থাকায় এই নিয়ে আলোচনা এগোত না। ৪৭ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন।"

নীরদবাবুর কাছে তাঁর অক্সফোর্ডের বাড়িতে সাতদিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সময়ে নীরদবাবু ও বৌদি অমিয়া চৌধুরানী দুজনেই বিভূতিভূষণের নানা স্মৃতি আলোচনা করতেন। বৌদি বলেছিলেন, "অত বড় সাহিত্যিক কিন্তু কী অমায়িক ব্যবহার, কোনও অহঙ্কার নেই, না পোশাকে-আশাকে না ব্যবহারে-আচরণে।" নীরদবাবু বলছিলেন, "ওয়ার অ্যান্ড পিস উপন্যাস বিভূতির খুব প্রিয় ছিল। সে বলত, নিজেকে সে কল্পনায় পিটার বেজুখভ ভাবতে ভালোবাসে। ভানু, বোঝো, ভাবনা চিন্তা কত গভীর হলে মানুষ এরকম কল্পনা করতে পারে। আমি দিল্লি চলে গেলে আমাদের নিত্য দেখাশোনায় ছেদ পড়ে। তবে দিল্লিতে সে এসেছিল, গজেনবাবু-সুমথবাবুর সঙ্গে। দেখা হতেই সেই উষ্ণ আদর—নীরদ! নীরদ! আমাদের কতদিনের আলাপ। আমি যখন আমার প্রথম ইংরেজি বইয়ের প্রুফ দেখছি, তখনই তার আকস্মিক তিরোধান সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত আঘাত পাই।"

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হয় ১৯৩৬ সাল নাগাদ। তখন ওঁরা সবে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন সংস্থা খুলেছেন। প্রথম অবস্থায় কে ভালো বই দেবে। সকলেরই কিছু কিছু অল্পখ্যাত বই নিয়ে প্রকাশ করছেন। বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* অপেক্ষা *আরণ্যক* পড়ে গজেনবাবু অভিভূত হন।

তাঁর স্মৃতিকথা বলছে, "বিভূতিভূষণ বললেন, ঠিক সেরকম উপন্যাস তো নেই, তবে এই ডায়েরিটা আছে, কিছু স্মৃতিকথা জাতীয় কিছু ভ্রমণ, দেখুন চলবে কিনা। পড়ে তো চমকে গেলাম, এই যদি ডায়েরি হয় তো,

মূল গ্রন্থ হলে কী হত! সেই বিভূতিভূষণের ডায়েরি *অভিযাত্রিক* নামে বেরল মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে।"

বিভূতিভূষণের সঙ্গে গজেন্দ্রকুমার, সুমথনাথ এবং তাঁদের স্নেহাস্পদ গৌরীশঙ্করের এমনই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা বা বারাকপুর থেকে এসে অনেক সময়ে মেসের পরিবর্তে এঁদের কারও বাড়িতে উঠতেন। এঁরা বিভূতিভূষণকে বড়দা বলতেন। বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় বিবাহ ১৯৪০-এ হয়। গজেনবাবুর বিবাহ হয় ১৯৪৩-এ, সুমথবাবুর ১৯৪৪-এ। সুমথবাবু বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র তুলে দিচ্ছেন বিভূতিভূষণকে। বিভূতিভূষণ একটু গম্ভীরভাবে গজেনবাবুকে বললেন, গজেনবাবু, সুমথবাবুর কি কোনও সুহৃদ বা উপকারী বন্ধু নেই? সুমথবাবু একটু হতচকিত হয়ে বললেন, কেন, কী হয়েছে বলুন তো? বিভূতিবাবু বললেন, না তাই ভাবছিলুম, এই যুদ্ধের বাজারে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, কেউ বারণ করছে না, যা বাজার আক্রা! বিভূতিবাবুর রসিকতায় এবার সবাই হেসে উঠলেন।

মিত্র ও ঘোষের আড্ডার তখন দুর্দান্ত আকর্ষণ। বিভূতিবাবু কলকাতায় থাকলে রোজ আসবেন। সজনীবাবু, কবিশেখর কালিদাস রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—এঁরা সবাই বিভূতিভূষণকে ভালোবাসেন তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য। সজনীকান্ত দাস তো পথের পাঁচালীর প্রথম প্রকাশক।

এঁরা দল বেঁধে বেড়াতে যাচ্ছেন, বিভূতিভূষণও তাঁদের সঙ্গে। তুফান এক্সপ্রেসে দিল্লি গেলেন। পথে পাটনা, আগ্রা, মথুরা হয়ে দিল্লী পৌঁছলেন। বিভূতিভূষণ পত্নী রমা দেবীকে চিঠি দিলেন, আমরা পাটনা, মোগলসরাই, কানপুর, আগ্রা, মথুরা হইয়া দিল্লি পৌঁছিয়াছি। বিভূতিভূষণ বললেন, গজেনবাবু এটা মিথ্যে নয় বলুন, ইনফ্যাক্ট আমরা তো ট্রেনে এই সব জায়গা দিয়েই এলাম।

রাত্রিবেলায় নিমন্ত্রণ দিল্লিবাসী সাহিত্যামোদী অপূর্বমণি দত্তের বাড়ি। গজেনবাবু বললেন, বড়দা, ঠিকানা আছে তো অপূর্ববাবুর? বিভূতিবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে আছে, ৩৯ টেগোর টাউন। টাঙা নিয়ে ৩৯নং বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন এক অবাঙালি থাকেন। ৩৯, ৪০, ৪১ কোথাও বাঙালি নেই। এক বাঙালি পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল কাছাকাছি। দুই কামরার ফ্ল্যাট। তিনিও অপূর্বমণি দত্তর নাম শোনেননি। সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণের নাম শুনে বললেন, এত রাত্রে কোথায় খুঁজবেন, আজ এই ঘরে থাকুন, আমরা পাশের ঘরে একটা রাত কাটিয়ে দেব। গজেনবাবু লিখছেন, সেই ঘরে দেখলাম তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর যুগল ছবি মাল্যশোভিত। হয়তো সেদিন বিবাহবার্ষিকী বা ওইরকম কোনও শুভরাত্রি ছিল তাঁদের।

পরের দিন সকালে আরও খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, অপূর্ববাবুর বাড়ি ৩৯ নয়, ১৩৯ টেগোর টাউনে। এই নিয়ে কী হাসি-ঠাট্টা সকলের।

পুরী গেছেন। বিভূতিবাবু সপরিবারে। সঙ্গে গজেন্দ্রকুমার, সুমথনাথ, গৌরীশঙ্কর। ওখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ বীরেন রায় মশাই ছিলেন। জমাট আড্ডা বসত তাঁদের। পুরীর স্মৃতি পরবর্তীকালে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

এঁরা একটা জমিদারবাড়ির সামনের অংশে তিনটি ঘরভাড়া নিয়েছিলেন। সামনে বারান্দা। জগন্নাথে গজেনবাবু, সুমথবাবুর দুজনেরই গভীর বিশ্বাস। রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্প-গুজব হচ্ছে। বিভূতিবাবু বললেন, গজেনবাবু আপনার জগন্নাথের যদি এত ক্ষমতা, আমি যদি এখন গরম মালপোয়া খেতে চাই, জগন্নাথ খাওয়াবেন? গজেনবাবু বললেন, সে আমি কী বলব, জগন্নাথের যা ইচ্ছে তাই হবে।—শুয়ে পড়েছেন সবাই। রাত্রি বারোটায় গজেনবাবুর পাণ্ডার ছড়িদার এসে কড়া নাড়ছে, গজেনবাবু, জগন্নাথদেবের শৃঙ্গার ভোগ নেমেছে, মালপোয়া, পাণ্ডাজি পাঠিয়ে দিলেন।

গজেনবাবু বললেন, বাবা তুমি ওই বিভূতিবাবুর ঘরে গিয়ে কড়া নাড়ো, উনি খেতে চেয়েছিলেন, ওঁর জন্যেই জগন্নাথ পাঠিয়েছেন।

পরের দিন সকালে বারান্দায় বসে মালপোয়ার গল্প হচ্ছে। বিভূতিবাবু বলছেন, এ তো অবাক কাণ্ড গজেনবাবু, মালপোয়া খেতে চাইলাম, আর এসে গেল। এখন যদি কড়াপাকের সন্দেশ আর ল্যাংড়া আম খেতে চাই, তাও জগন্নাথ পাঠিয়ে দেবেন?

বিভূতিবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই, সেই জমিদারবাড়ির গিন্নি এক পরিচারিকার হাতে বারকোশসহ হাজির হলেন। বললেন, বাবা, আমি তো এসেছি আমার এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে, তা আমার কর্তার এমনই বুদ্ধি দেখুন, প্যাকিং বাক্স ভর্তি বাগানের ল্যাংড়া আম আর বিরাট প্যাকেটে এতগুলো সন্দেশ পাঠিয়েছেন। দুজনের জন্য, কে এত খায় বলুন তো! তা আপনারা সাহিত্যিক মানুষ সব এসেছেন, যদি একটু খান তাই নিয়ে এলাম।

জমিদার গিন্নি ও পরিচারিকা চলে যেতে বারকোশের দিকে তাকিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, না মশাই, আর আপনার জগন্নাথের কাছে কিছু চাইব

না, যা মুখের কথা খসাই, তাই এসে যায়। শেষকালে ঘোড়া চেয়ে বসব, জগন্নাথ কাঁধে ঘোড়া চাপিয়ে দেবেন।

বিভূতিভূষণের আতিশয্যে গজেনবাবু ও সুমথবাবু তাঁর বাড়ির কাছে দাহিগোড়ায় প্রায় এক বিঘে জমিসহ একটি বাড়ি কেনেন। বাড়ির সামনের বারান্দা থেকে সুবর্ণরেখা নদী দেখা যেত। বারান্দায় বসে আড্ডা জমে উঠত, কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই বিভূতিভূষণ। পুজোর সময় প্রমথনাথ বিশীও যেতেন সপরিবারে। উঠতেন রমণীবাবুর বাড়ি, কখনও বা ফণীবাবুর বাংলোয়। বিভূতিবাবু বলতেন, দেখুন না, এখানে একটা সাহিত্যিক কলোনি তৈরি করে ফেলব।

বিভূতিভূষণ সব সময়ে ঘাটশিলায় থাকতেন না। কখনও বারাকপুরে, কখনও কলকাতায়। তখনও তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়নি। তাই নুটুবিহারীর বিয়ে দেন যমুনা দেবীর সঙ্গে। ঘাটশিলায় সব সময় থাকতেন নুটুবিহারী, তাঁর স্ত্রী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের ভাগ্নে ও ভাগ্নী উমা। নুটুবিহারী ঘাটশিলায় ডাক্তারি করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল কলকাতায় ডাক্তারি করার। দাদাকে বলেছিলেন, কলকাতায় পসার বেশি হবে। বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, পসার মানে তো টাকা। আর টাকা মানে সম্পত্তি, জমি, ভোগ। দ্যাখ নুটু, তুই এখানে দাঁড়িয়ে ভেবে নে না, এই বাড়ি থেকে ওই সুবর্ণরেখা নদী, নদী পেরিয়ে ওই মুসাবনি পাহাড় পর্যন্ত সব তোর। তাহলে তোর তো সম্পত্তি হয়ে গেল, আর দ্যাখ যতই টাকাপয়সা হোক টাটা-বিড়লাদের কি দশ থালা ভাত বা সন্দেশ খাবার ক্ষমতা আছে? খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, সব রোগভোগে কাহিল। অথচ তুই যদি এই সব ভেবে নিয়ে এখানে ডাক্তারি করিস, তাহলে এখানকার গরিব-গুর্বো আদিবাসী মানুষগুলো বিনা চিকিৎসায় মরে না, অল্প খরচে রোগ সারাতে পারে, ভেবে দ্যাখ কত উপকার হবে এদের।

একবার গজেনবাবুর সঙ্গে ঘাটশিলা যাই। আমাদের দুইবেলাই নিমন্ত্রণ থাকতো যমুনাবৌদির কাছে। তখনই এইসব কথাগুলি বলেছিলেন নুটুবিহারীবাবু। তখন বাবলু জন্মেছে। বাবা-মা, কাকা-কাকীমা সকলেরই নয়নের মণি বাবলু। একথা সে কথার পর ঘুরে ঘুরে আসছে তার কথা। যমুনা বৌদি—নুটুবিহারীবাবুর বাবলু ছাড়া কথা নেই।

ভাগ্নী উমার বিয়ে এখানেই হয়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের বাজার করার ভার ছিল গজেন্দ্রকুমারের ওপর। তখনকার দিনে প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকার বাজার, তার হিসেব ও বাকি টাকা

নুটুবিহারী, কোলে তারাদাস, বিভূতিভূষণ

বিভূতিবাবুকে দিতে গেলেন গজেন্দ্রকুমার। বিভূতিভূষণ বললেন, ওই আমার তোশকের নীচে রেখে দিন, অনেক টাকার হিসেব, পরে দেখব। বিভূতিভূষণ তখন স্নানে যাচ্ছিলেন। বিয়ের দিন। উপবাস করে আছেন। উনিই সম্প্রদান করবেন।

বিকেলবেলা হঠাৎ বললেন, চলুন গজেনবাবু, একটু এঁদেলবেড়ের জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি। গজেনবাবু বললেন, সেকি একটু পরেই তো অনুষ্ঠান। বিভূতিবাবু বললেন, দেখুন বর এসে গেছে, কনে সাজানো হচ্ছে, সব কিছু রেডি, গোধূলি বেলায় বিয়ে, আমরা এই সময়টা কেন নষ্ট করি! এই সময়টা এঁদেলবেড়ের জঙ্গলে শোভা বড় সুন্দর দেখায়, সূর্য অস্ত যাবার আগে।

গজেনবাবু তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন, এই হলেন বিভূতিভূষণ, সমস্ত পার্থিব কিছুর ওপরে হল প্রকৃতির এই প্রবল আকর্ষণ। পিছনে আছে বিবাহ ও সম্প্রদান, খরচের হিসাবপত্র। সম্প্রদান অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু হিসাবপত্র কিছু দেখেননি। তাঁর তিরোধানের পর তোশকের নীচে পাওয়া গেল, সেই হিসেবপত্রের কাগজ ও বাকি টাকা, অবিকৃত, স্পর্শ করেননি বিভূতিভূষণ। টাকা-পয়সা, অর্থ, পার্থিব সুখভোগ—এ সবের প্রতি ঘোর

অনীহা ছিল, রয়্যালটির হিসেবপত্র কত পাওনা হল বুঝে তারপর বলতেন, আমায় এখন কুড়ি, তিরিশ টাকা দিন। বাকি টাকা পরে নেব।

বিভূতিভূষণদের সংসারে যমুনা বৌদি ভ্রাতৃবধূ হয়ে প্রবেশ করেন বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় বিবাহের আগেই। একটি তথ্যবহুল সুপাঠ্য জীবনী লেখেন বিভূতিভূষণের—*উপল-ব্যথিত গতি*। সেই বইয়ে বিভূতিভূষণের এবং তাঁদের পরিবারের এক অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া পত্নী রমা দেবীর পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় আবগারি বিভাগের অফিসার ছিলেন। কর্মস্থল দুই বছর তিন বছর অন্তর পরিবর্তন হত। এইভাবে তিনি একসময়ে যশোর জেলার বনগাঁ মহকুমায় এসে পড়েন।

তাঁদের বনগাঁয়ের বাসার পাশে ছিল তারক চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। তাঁর স্ত্রীকে রমা দেবীরা মাসীমা বলতেন। এই মাসীমার বাড়ির উঠানে মেয়েদের মজলিশ বসত। নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব হত। এই আড্ডাটির প্রতি রমা দেবীর খুব আকর্ষণ ছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেন দুপুরবেলায়। পড়িয়ে চলে গেলেই রমা দেবী ছুটতেন ওই মেয়েদের মজলিশে।

একদিন ওই মজলিশে গিয়ে শুনলেন, তাঁরা সবাই, অর্থাৎ মজলিশের মহিলারা একটি বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত ও বিষণ্ণ। ওঁদের পাড়ার কাছে চালকি গাঁয়ের এক মহিলা জলে ডুবে মারা গেছেন। ভদ্রমহিলার নাম জাহ্নবী। জাহ্নবীর দাদা ওঁদের চালকি থেকে নিয়ে আসেন এখানে বাসা করে। ভাগ্নে-ভাগ্নীকে পড়াবেন বলে। ওদের বাবা মারা গেছেন আগেই। ওরা ম্যালেরিয়ায় ভুগত খুব। ওদের শরীর ওখানে টিকত না। আহা, কী সর্বনাশই না হল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি। বাপ ছিল না, মাও গেল।

এই সব কথা আমার মুখ থেকে না শুনে—রমা দেবীর *কাছে থেকে দেখা* গ্রন্থটি পড়ে নেওয়া ভালো। যে মানুষটি দশ বছর বিভূতিভূষণকে বড় কাছে পেয়েছিলেন, তাঁর কথাই সব থেকে নির্ভরযোগ্য।

রমা দেবী লিখছেন—

ভাই পাগল হয়ে যাবে। বোন-অন্ত প্রাণ ছিল। সে বেচারি কিছু জানে না গো, কি কষ্টটাই না পাবে। বোন রোজই তো নাইতে যায়। আজ কি হল! চাবির থোলো, কিছু জিনিসপত্র নাকি পড়ে ছিল পাড়ে। শাড়ি আর ঘড়া নিয়ে ডুবে গেছে।

পিসিমা বললেন, 'তাই তো বৌদি! তুমি ভালো জানো। তোমার গাঁয়ের লোক।' মাসীমা বললেন, 'জানিই তো রে। জাহ্নবীর দাদাকে দেখিছি কোথায় বাঁশবনে, ঘেঁটুবনে বসে লিখছে। কতদিন দেখেছি বাঁশবনের ঝরাপাতার ওপরে বসে থাকতে। আহা, কত ভালো ভাই গো। জাহ্নবীকে বড় ভালোবাসত, ভাগ্নে-ভাগ্নীকেও। কি যে কখন হয় কার। অমন ভাই বড় একটা দেখা যায় না। তেমন বোনও। দাদার একটা পয়সা, একটু কিছু অপচয় হতে দেবে না, সব বুকে করে গুছিয়ে রাখত।'

রমা দেবী
এবং
যমুনা দেবী

গিন্নিরা মিলে ওই ছোট্ট ছেলে-মেয়ে দুটি এবং আপন ভোলা ভগ্নী-অন্ত প্রাণ ভাইটির জন্য হা-হুতাশ করতে লাগল। ওদের কথায় জানলাম মানুষটি লেখক, তিনি বই লেখেন।

চিরদিনই মানুষের বেদনা, মানুষের বিপদ আমাকে বেদনাচ্ছন্ন করে। অচেনা দুটি বালক-বালিকা, অচেনা একটি আপন ভোলা ভগ্নী-অন্ত প্রাণ মানুষের ছবি কল্পনায় আমার মনের পাতায় মুদ্রিত হয়ে গেল। একটু বিচলিত হয়ে উঠলাম ওদের জন্য।

মাসীমাকে দেখেছি, উনি চিরদিনই স্নেহশীলা। তিনিই আবার বললেন, বড় মন কেমন করছে ঠাকুরঝি। আমার এক গাঁয়ের

চেনা লোক এভাবে চলে গেল। ছেলে-মেয়ে দুটি নাবালক। কি যে হবে।

পিসিমাও বড় ভালোমানুষ ছিলেন। এ মাসী-পিসি দুটি আমার জীবনের একটি পরম মধুর ক্ষণের সঙ্গী। তাই আজকের এই অবসরে তাঁদের আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

মাসীমার কথায় যে লেখক, আত্মভোলা মানুষটির কথা ছিল, তাইতেই আটকে গেল আমার কান। বই পড়তে ভালোবাসতাম খুব। আমাদের বাড়ির সকলেই ভালোবাসত। কত সুন্দর সুন্দর বই পড়ি। নিজের লিখতে ইচ্ছে করে অমনি করে। কিন্তু পারি না। এত যে দেশ ঘুরেছি, কিন্তু লেখক দেখিনি একজনও। দেখবার আগ্রহ ছিল প্রচুর। আজ বলতে একটুও দ্বিধা নেই, লেখক-লেখিকা কিংবা স্বনামধন্য বিশেষ কাউকেই আমি কখনও চোখে দেখিনি। শুধু দেশ-বিদেশে ঘুরেছি বাবার সঙ্গে। তাতে যা দেখা যায়, দেখেছি। যা শেখা যায়, শিখেছি। কিন্তু লেখক কিংবা খুব স্বনামধন্য কারোরই সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়নি।...

পরদিন বেলা এগারোটার সময় ছোটমামা বাইরে ঘুরে ফিরে বাড়িতে এসে অধীর হয়ে বললেন, দেখে এলাম সাহিত্যিককে। পটলের দোকানে চুপচাপ বসে আছেন।

অন্তিম শয্যায় বিভূতিভূষণ

আমি বললাম, খুব কি দুঃখিত দেখলে ছোটমামা? খুব কি ভেঙে পড়েছেন বোনের মৃত্যুতে?

ছোটমামা উত্তর দিলেন, চুপ করে নিজের মনে বসে আছেন, কেমন যেন বিমর্ষ দেখলাম। কান্নাকাটি নেই, মুখ বুঁজে বসে আছেন।

আমি বললাম, সাহিত্যিকের নামটা জেনেছ কিনা বল। ছোটমামা লজ্জিত স্বরে বললেন, এখানে যে, 'পথের পাঁচালী'র লেখক থাকেন তা কে জানতো? উনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পথের পাঁচালী, আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপ-এর লেখক।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। অনেকদিন হল আমরা এখানে এসেছি। প্রায় বছর ঘুরল। কই, কেউ তো বলেনি এখানে এমন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক আছেন। তাঁর নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অপরাজিত-র লেখক। এখানকার লোকদের ওপর আমার খুব রাগ হল। তারা কি কোনও কিছুরই খোঁজ রাখতে চায় না?...

সত্যি আজ বলতে কোনও দ্বিধা নেই। ওই আত্মভোলা পরম পণ্ডিত, জীবনের বহু ঝড়ে ঝঞ্ঝায় অটল, পরম মায়াময় মুখশ্রী মণ্ডিত মানুষটির জন্য মায়া জমে উঠেছিল আমার মনের তলায়। ওরই নাম হয়তো প্রেম, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। ওঁর জন্য বুকের তলায় বেদনার ভাবই অনুভব করেছি। সেই বেদনার ভারে নুয়েই আমি এসেছিলাম ওঁর কাছে। ওঁকে সুখী করব আমি, ওঁর যত না-মেটা সাধ মেটাব।...

বিভূতিভূষণ যখন অক্টোবরের শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সেখানে সুমথনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি সাহিত্যিকরা ছিলেন। কিন্তু গজেন্দ্রকুমার মিত্র সে বছর পুজোয় তাঁর মাতৃদেবীর অসুস্থতার কারণে ঘাটশিলা যেতে পারেন নি। এর পরের কথা আগেই বলেছি।

২

পথের পাঁচালী : পঁচাত্তর বনাম পঞ্চাশ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* গ্রন্থ প্রকাশের পর পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রেরও পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। দুঃখের বিষয়, চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর নিয়ে যে মাতামাতি হচ্ছে, গ্রন্থপ্রকাশের পঁচাত্তর বছর নিয়ে তার এক চতুর্থাংশও হয়নি।

অবশ্য 'প্যারফর্মিং আর্ট' বরাবরই কবি-সাহিত্যিকদের রচনার মাথার ওপর দিয়ে হাঁটে। সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক কবি ও কবির কবিতা আবৃত্তিকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। কবি পেলেন গলায় উত্তরীয় এবং এক বাক্স মিষ্টান্ন। আর বোধহয়

কিছু ফলমূল। আবৃত্তিকারিনী তো এসব পেলেনই, তার ওপর পেলেন নগদ পনেরো হাজার টাকা।

বিভূতিভূষণের *আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা* গল্পটি উল্লেখ্য। কৌতুক-বেদনারস সমৃদ্ধ এই গল্পে বিশ্ববিখ্যাত সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন স্টেশনে ভিড় দেখে ভাবছেন, তাঁর খ্যাতি অজ পাড়াগাঁয়েও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু, জনতা ওই ট্রেনেরই তাঁর সহযাত্রী বিখ্যাত চিত্রতারকা ইন্দুবালাকে দেখার জন্যই অধীর। আইনস্টাইনকে জানতে-বুঝতে তাদের বয়েই গেছে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পরামর্শে বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের কাছ থেকে পথের পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি বিচিত্রায় ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য চেয়ে নেন। প্রকাশে দেরি হচ্ছে দেখে তাগাদা দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণ জবাব পান কোনও এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে—তাঁরা ওসব পাঁচালী-টাঁচালি ছাপেন না। বিভূতিভূষণ যখন বললেন, ওটা পাঁচালী নয়, উপন্যাস, উপেনবাবু নিজে নিয়ে এসেছেন, তখন আর এক ভদ্রলোক জবাব দেন, Then you might have been elbowed out.

পরে নীরদবাবুর ধমকে উপেনবাবু আর কালবিলম্ব না করে বিচিত্রায় পথের পাঁচালীর ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু করেন দেন। এবং বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথও বই ও লেখক সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সজনীকান্ত দাস বইটি ১৯২৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বইটির প্রথম প্রকাশক হন। তার পর বিভূতিভূষণকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপ, অনুবর্তন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, অভিযাত্রিক প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ২২৩টি ছোটগল্প পরপর একেকটি স্তম্ভের মতো বিভূতি-সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে দেয়। সেই অমর লেখনী স্তব্ধ হল সর্বশেষ উপন্যাস ইছামতী রচনা করে, ১৯৫০-এর ১লা নভেম্বরে।

সত্যজিৎ রায়ও পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র তৈরি করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তার আগে ঘরে বাইরে উপন্যাসের চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন। ঘরে বাইরে প্রথম বেরলে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রকারের এই খ্যাতি পেতেন কি না সন্দেহ। এ ক্ষেত্রে তাঁর ললাটলিপি অনেকটা সহায়ক সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলির সংলাপ যে তাঁকে অনেকটা সাহায্য করেছে, এ কথা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন বিভূতিভূষণ-পত্নী রমাদেবীর

কাছে। উৎসাহী দর্শক চলচ্চিত্র-উপন্যাসের সংলাপ মিলিয়ে নিতে পারেন। এমনকী 'অশনি সংকেত'-এও সে কথা সত্য। চলচ্চিত্র ও উপন্যাসটি পড়ে দেখবেন।

দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে পথের পাঁচালীর লেখক স্বীকৃতি বিভূতিভূষণকে দিতে যেন সবাই কুণ্ঠিত। দেশে-বিদেশে 'সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী'—এইভাবেই বিজ্ঞাপনে প্রচার হয়েছে। বিদেশি সাংবাদিক যখন চলচ্চিত্রকারকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি পথের পাঁচালী কবে লেখেন? চলচ্চিত্রকার বিভূতিভূষণের নামমাত্র না করে বলেছেন, "I drafted the scenario etc etc..."। এমনকী মেরি স্যাটন তাঁর গ্রন্থে বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায়ের যে মন্তব্য ছেপেছেন, তাতেও বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়নি। এই নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন একমাত্র কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। বিভূতিভূষণের জীবৎকালে তাঁর কোনও বই চলচ্চিত্র হয়নি, অথচ তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল। সেজন্য পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র প্রস্তুত হলে বিভূতিভূষণের অনুরাগী বন্ধুরা বইটি দেখতে গিয়ে একটি বাড়তি সিটের টিকিট কেটে সেটি খালি রেখেছিলেন। বিভূতিভূষণ পরলোক, আত্মায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধায়, যদি তিনি এসে বসেন, সে জন্যই অতিরিক্ত টিকিটটি কাটা হয়।

বন্ধুরা কিন্তু চলচ্চিত্র দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন, এই যে দুই-আড়াই ঘণ্টা ছবিটি দেখলাম, এর ফলশ্রুতি কী? কৃষ্ণদয়াল বসু, প্রমথনাথ বিশীও একই কথা বলেছিলেন। বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীতে শুধু দুঃখ-কষ্টের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বলতে চেয়েছিলেন, "এতদ্‌সত্ত্বেও পৃথিবী আনন্দের জায়গা, বারবার ফিরে আসার জায়গা।"—"আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নইলে বাঁচব না—পায়ে পড়ি তোমার।" পথের পাঁচালী বইয়ের শেষের কিছু আগে দেখুন।

এর অব্যবহিত পরে তদানীন্তন দীপালি সাময়িকপত্রে গজেন্দ্রকুমার মিত্র চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেও একটি মন্তব্য করেন—"পরিচালক তথ্যের প্রতি যতটা নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তত্ত্বের প্রতি সেই নিষ্ঠা দেখালে চলচ্চিত্রটি নিখুঁত রসোত্তীর্ণ হতে পারত।"

সত্যজিৎ রায় এতে অসন্তুষ্ট হয়ে একটা তিক্ত পত্র দেন। পরবর্তীকালে কাহিনিকার ও চলচ্চিত্রকারের অধিকার নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। বলা বাহুল্য, মীমাংসা হয়নি। অর্থকৌলীন্যে লেখকের অধিকার সঙ্কুচিত

হয়েছে বারবার। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের লাঞ্ছনা দেখার পর এই বিষয়ে আর বাগবিতণ্ডা বাহুল্য।

পথের পাঁচালীর ইংরাজি অনুবাদেও শেষ পরিচ্ছেদ অক্রুর সংবাদ চলচ্চিত্রের মতোই বর্জিত হয়েছে। এই বিষয়ে বিখ্যাত সমালোচক M. G. Mcnay বলেছেন : "It's painstaking translators have decided that the author was so simple that he did not know where best to end the books. So they have chosen a different point for him (the same spot that Satyajit Ray chose for his film) ... May be he (the author) simply did not want a neat ending ; may be he decided that life is not as neat and tidy as a novel..."

যা বিদেশি সমালোচক ধরতে পারেন, তা আমাদের নাসিকা-উচ্চ আঁতেল সমালোচকদের চোখে পড়ে না, এইটাই দুঃখের।
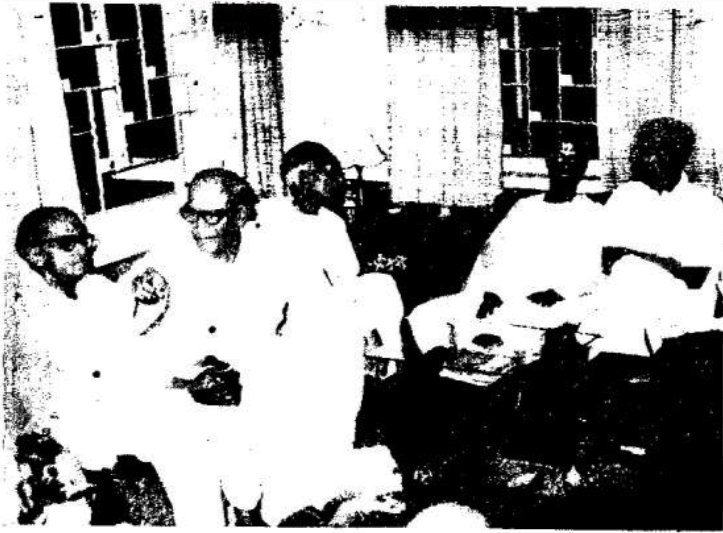
৩

প্রসঙ্গ আড্ডা ও আড্ডাধারী

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে এক উপন্যাস ফাঁদছিলেন। কাছে ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এমন যদি হয় একটি মেয়ে লোকালয়ের বাইরে মানুষ হয়েছে, ধর কাপালিকের কাছে; পরে তার বিয়ে হল, সে সংসারী হল। মেয়েটি বৌ হয়ে কিরকম হবে?'

সঞ্জীবচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'ছেলেবেলায় তো ভালো খেতে পায়নি, বড় হয়ে মেয়েটি লোভী হবে।'

বঙ্কিমবাবু উত্তর শুনে খুশি হননি। মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলা লোভী ছিল না। লোভী হলে গল্পের পরিণতি অন্যরকম হতে পারত। সঞ্জীবচন্দ্র স্বভাবতই রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন অগ্রজকে, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অগ্রজকে উত্তর দেবার মতো নয়। এই উত্তর আড্ডায়

খুব ভাল চলত। আদর্শ আড্ডাধারী বলতে আমার অনেক সময় সঞ্জীবচন্দ্রের কথা মনে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আড্ডা দিতেন কিনা জানি না। যাঁর বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র তাঁর পক্ষে আড্ডা না দেওয়া কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্র্যান্ডির বোতল সম্পর্কে কবিতা 'ভুবন বিখ্যাত বামা তারেতে বন্দিনী' প্রকৃতপক্ষে আড্ডায় পড়বার কবিতা। সেখানেই এর যথার্থ সমাদর। দুজনে কি আড্ডা দেওয়া যায়? পুরনো বাংলা উপন্যাসে আড্ডা এবং আড্ডাধারীদের বর্ণনা আছে। আড্ডাধারীদের সবসময় দুজনের বেশি হতে হবে। দুজনের আড্ডা ঠিক জমে না।

রবীন্দ্রনাথ কি আড্ডা ভালবাসতেন? নিশ্চয় বাসতেন, তবে তাঁর আড্ডা একটু অন্যরকম ছিল। আড্ডার মজা এই যে এতে সবরকম বিষয় নিয়ে কথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আড্ডার সঙ্গী এবং বিষয় নিয়ে বাছাই করতে ভালবাসতেন। কোনো কোনো আড্ডা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই বসত, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতেও ডাকা হত। ঠাকুরবাড়ির আড্ডার নিমন্ত্রণ-চিঠিতে প্রায়ই কবিতা থাকত এবং আহারাদির বিষয়ে স্বভাবতই পারিপাট্য ছিল। কখনও জলচৌকিতে বসে বিশুদ্ধ জলপান, কখনও ডিনার টেবিলে কাচের প্লেট রেখে সাহেবি কেতায় ভোজ, কখনও মারাঠি কিংবা গুজরাটি খাবার। বাইরের যে সমস্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হত সবসময় হৃদয় এবং উদর পূর্ণ হত তা নয়।

অবনীন্দ্রনাথ একটি বাইরের আড্ডার গল্প এইভাবে করেছিলেন। একদিন আড্ডাধারীরা কলকাতার কাছে কোনো একটি বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন।

তখনকার কলকাতা একটু খোলামেলা ও সুশ্রী ছিল। কিন্তু কতক্ষণ আর সন্ধ্যা উপভোগ করা যায়! রাত গভীর হতে চলল কিন্তু খাবার আসার নাম নেই। অবশেষে অনেক তদ্বিরের পরে খাবারের দেখা পাওয়া গেল; লুচি আর মাংস। লুচি নানাবিধ আকারের, ভালো ভাজা হয়নি। মাংসও শক্ত এবং ভদ্রসমাজের পাতে দেবার উপযুক্ত নয়। খাওয়ার পর্ব একরকম করে শেষ হল। অবশেষে বিদায়ের পালা। রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বললেন, 'গাড়ির হুড খুলে দাও।' হুড সরিয়ে ফেলা হল, চাঁদের আলো ও বাতাস গাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এ ধরনের খামখেয়ালী যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা আড্ডা দিতে ভালবাসতেন না যে তা নয়। *গোরা*র কথা বললে লোকে বলবে ওতে আড্ডা নেই, তর্ক

আছে। *ঘরে-বাইরে* সম্বন্ধেও বোধহয় একই মন্তব্য। বরং *নৌকাডুবিতে* আড্ডার পরিমাণ একটু বেশি হতে পারে। *প্রজাপতি নির্বন্ধের* কথা বলছি না, ও তো আড্ডার বই। আরও পরে *শেষের কবিতায়* অনেক আড্ডার অবকাশ আছে, তবে অমিত রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা স্বভাবতই অন্যরকম হবে। *নৌকাডুবিতে* বরং আড্ডার সুযোগ আছে এবং মেয়েরা বেশি কথা বলে বলে আড্ডাও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

প্রায় এই সময়ে আর একটি আড্ডা বসত খিদিরপুরে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি ছোটো ছোটো কবিতায় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন। কবিতা এমন কিছু নয় তবে কবির মনের ভাব খুব স্পষ্ট বোঝা যেত। তিনি অজামাংস ও লুচি 'থাবা-থাবা' খাওয়াবার জন্য বন্ধুদের তাঁর পদ্মপুকুরের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। অজামাংস আর লুচি খাওয়ার নিমন্ত্রণ বেশিদিন রাখা সম্ভব হয়নি। শেষবয়সে অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়েছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবের কাছে কখনও কখনও অর্থসাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন কবির অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের কথা মনে আসে। শরৎচন্দ্র কোনো কোনো আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন এবং গল্পগুজব জমাতে পারতেন কিন্তু আড্ডার প্রধান পুরুষ হিসাবে ওঁকে বিশেষ দেখা যেত না। শরৎচন্দ্রের আড্ডার জায়গা হতে পারত যমুনা পত্রিকা কিংবা ভারতবর্ষ পত্রিকার আসরে। যমুনা পত্রিকা সে অনেকদিনের কথা। আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। যমুনা পত্রিকার আপিসে আড্ডা হয়ত হতে পারত কিন্তু ভারতবর্ষে সম্ভব ছিল না কারণ ভারতবর্ষ আপিসের যে অবস্থা দেখেছি তাতে মনে হত সংবাদপত্রের আপিস না জমিদারির সেরেস্তা। যাঁরা দুটি একটি বই কিনতে আসতেন তাঁদের দেখে মনে হত পলাতক খাতক, বাকি খাজনা জমা দিতে এসেছেন। অল্পবয়সে মন নরম থাকে, অল্পতেই দাগ স্থায়ী হয়ে যায়। ভারতী আপিসে আমার যাওয়া-আসা ছিল না, বয়সও সেরকম নয়। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে ভারতী আপিস একটি জমাট আড্ডা এবং সে আড্ডার কোনো কোনো ফসল ভারতীর সেবায় লাগছে। লেখকদের কারুর কারুর দৌড় জোড়াসাঁকো পর্যন্ত পৌঁছল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তো ঠাকুরবাড়ির জামাই ছিলেন। সেই কারণেই বোধহয় ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অত লেখা বেরোত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো কথাই নেই। তাঁর *নালক, আলোর ফুলকি* এবং স্টীমারে বেড়াবার অনবদ্য কাহিনীগুলি

ভারতীতেই প্রথম বেরিয়েছিল। একালের পাঠকরা অনেকে ভূতুড়েকাণ্ড বলে একটি চটি বই দেখেন নি। এটি প্ল্যানচেটের কাহিনী। তখনকার দিনে প্ল্যানচেটের চলন ছিল খুব। রবীন্দ্রনাথও কিছুকাল প্ল্যানচেটের পাল্লায় পড়েছিলেন। ভূতুড়েকাণ্ড এখনও পড়লে ভালো লাগবে তবে বোধহয় পাওয়া যায় না। খবরের কাগজে সাহিত্যিক আড্ডা বসাতে সামান্য খরচা লাগে। কল্লোল, কালিকলমের সাহিত্যিকদের অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যত্র চাকরি করতে হত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথম সম্পাদক যিনি লেখার জন্য কাঞ্চনমূল্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সেও বেশি নয়; এখন খুব সামান্য মনে হবে কিন্তু সেযুগে দশ টাকারও অনেক দাম ছিল। তবে প্রবাসী পত্রিকায় সম্পাদকের ঘরে আড্ডা বসত একথা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে দশ মিনিট বসে গালগল্প করা বা শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার সঙ্গে বসে পনেরো মিনিট গল্পগুজব করা অসম্ভব ছিল না। কল্লোল কাগজের আড্ডা দীনেশরঞ্জন দাসের বাইরের ঘরে। তাঁর একটি গুণ ছিল এই যে তিনি সু-অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয় ভালো শেখাতে পারতেন। ম্যাডান কোম্পানির প্রথম যুগের কিছু ছবিতে তাঁকে দেখা যেত। তখনও বাংলা ছবি সবাক হয়নি। দীনেশরঞ্জন দাস প্রকৃত আড্ডাধারী ছিলেন। বিকেলে ভিতরের বাড়ি থেকে সাধারণত পরোটা এবং এক থালা নিমকি কি আলুর চচ্চড়ি চলে আসত আড্ডার সব বাসিন্দাদের জন্য। কোনো কোনো পত্রিকা আপিসে শুনেছি ঠিক সময় চারটি লুচি ও আলুরদম এবং রসগোল্লা এসে হাজির হত। সেসব আড্ডাধারীদের জন্য নয়। সম্পাদক মহাশয়ের পিত্তরক্ষার জন্য।

তবে চা সম্বন্ধে বেশি ধরাকাট ছিল না। চায়ের গতি প্রায় সর্বত্র। দোকানে বোধহয় দু'পয়সায় এক পেয়ালা চা। পরে আস্তে আস্তে দেখা গেল যে পরিচিত কেউ আপিসে এলেই একটি কণ্ঠ শোনা যায়, 'ওরে এক পেয়ালা চা দিয়ে যা।'

বড়দের মতো ছোটদের কাগজের আপিসেও আড্ডা ছিল। সন্দেশ তো পারিবারিক কাগজ ছিল। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত মৌচাকে প্রথম থেকেই আড্ডা। পৃষ্ঠপোষক সুধীরচন্দ্র সরকার বটে কিন্তু আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর একটি কবিতা দিয়ে মৌচাকের যাত্রা শুরু হয়। মৌচাকের লেখকদের মধ্যে অনেকে ভারতীর আগেকার দিনের লেখক ছিলেন। মৌচাকের আড্ডায় যাঁদের বেশির ভাগ দেখা যেত তাঁরা হচ্ছেন

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম থেকেই মৌচাকে লিখতেন। তাঁরা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কিন্তু বয়স এত কম ছিল যে তাঁদের মৌচাকে আড্ডাধারী বলা যায় না।

ভালো কাগজগুলির মধ্যে আর একটি কাগজের উল্লেখ করা দরকার। নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের 'মানসী' কাগজ কিছুদিন পরে 'মর্মবাণী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। 'মর্মবাণী'র সম্পাদক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পরে এই পত্রিকা 'মানসী'র সঙ্গে যুক্ত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে। নাটোরাধিপতির সঙ্গে সম্পাদক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত হয়। 'মানসী'র যে আড্ডা ছিল সে প্রধানত গানের আড্ডা। জগদিন্দ্রনাথের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি ছিল, নিজে ভালো পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন। 'মানসী ও মর্মবাণী'র লেখকরা যে আড্ডায় মিলিত হতেন সেটি ল্যান্সডাউন ও এল্গিন রোডের উপর নাটোরের বাড়ি নয়। তাঁদের আড্ডার জায়গা ছিল অধিকাংশ সময় এসপ্ল্যানেডে চৌরঙ্গীর উপর হফ্‌সিং কোম্পানির দোকানে। হফ্‌সিং কোম্পানি ফোটোগ্রাফির ব্যবসা করতেন। যেখানে ব্রিস্টল হোটেল কিংবা কারনবীশের খেলার সরঞ্জামের দোকান ছিল সেই জায়গায়। এসব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেকার কথা। যাঁরা এখানে আড্ডা দিতেন তাঁরা সবাই যে খুব রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন তা নয়। 'মানসী ও মর্মবাণী'র পুরনো ফাইল দেখলেই খানিকটা বোঝা যাবে। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সুহৃদ ও ভক্ত হওয়াতে তাঁদের এ মনোভাব প্রকাশ পেত না। তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। জগদিন্দ্রনাথ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে মাঝে মাঝে গানের আসর বসাতেন কিন্তু সবার বোধহয় প্রবেশাধিকার ছিল না।

'মানসী ও মর্মবাণী' বোধ হয় তখনও জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা। উত্তর কলকাতায় ডি. এম. লাইব্রেরির দোকানের কাছে একটি আড্ডা বসত। একটি বসতবাটি। গজেন্দ্রনাথ ঘোষের বসতবাটিতে। গজেনবাবু সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি কি উপায়ে অত লোক আকর্ষণ করতেন জানি না। প্রতি রবিবার এঁর বৈঠকখানায় তিলধারণের জায়গা থাকত না। অন্য অনেক আড্ডার মতো সাধারণত জলযোগ বা আহারের ব্যবস্থা থাকত না। কিন্তু

বাড়িতে মেয়ে-বৌদের সকাল থেকে অনেক পেয়ালা চা করতে হত এবং অনেক খিলি পান সাজতে হত। এর প্রধান আড্ডাধারীর মধ্যে নাম করা যেতে পারে কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন। তিনি তখনকার দিনে একজন জনপ্রিয় ছোটগল্প লেখক ছিলেন। দিনকাল সস্তা ছিল। বুদ্ধদেব বসু যেমন এক পয়সায় একটি কবিতা পত্রিকা বার করতেন, সেই রকম খুব সস্তা দামে পাতলা ছোট গল্পের বইও বেরোত, রমেশচন্দ্র সেন সেই সিরিজে লিখতেন। এখানে যাঁরা আসতেন তাঁরা সবাই সাহিত্যিক এবং 'ভারতী'র দলের ভগ্নাংশ।

এদিকে দক্ষিণ কলকাতায় কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতেও অনুরূপ একটি আড্ডা ছিল। আড্ডার নাম ছিল *রসচক্র*। কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধেশ রায় এর মধ্যমণি ছিলেন। একজন প্রধান সদস্য ছিলেন বিশ্বপতি চৌধুরী। তাঁর নাম বোধ হয় আজকাল কারুর বিশেষ মনে নেই। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর একটি উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছিল। তাছাড়া তিনি ছবিও আঁকতেন। 'ভারতবর্ষ' যাঁরা নিয়মিত পড়তেন তাঁরা তাঁর লেখার এবং ছবির সঙ্গে পরিচিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কথাবার্তায় খুব সরস। আরও কেউ কেউ আসতেন কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অন্য অনেক আড্ডার সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত। 'সন্দেশে'র উল্লেখ আগেই করেছি। সেখানে অবশ্য আড্ডার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরে সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, লীলা মজুমদার এঁরা একাই একশ।

সুকুমার রায় নিজেই একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইংরাজিতে 'মানডে ক্লাব', মণ্ডা ক্লাব বলেও সমধিক পরিচিত। ক্লাবের একটি নিজস্ব গানও ছিল। এর একটি পত্রিকা ছিল হাতে লেখা, তার নাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। এর অনেকগুলি লেখা পরে ছাপা হয়েছিল। 'মৌচাক'কে একসময় 'ভারতী' পত্রিকার শিশু সংস্করণ বললে খুব ভুল হবে না। এর লেখকেরা অনেকে 'প্রবাসী'র ছোটদের পাততাড়ি কিংবা 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠী থেকে এসেছিলেন। 'মৌচাকে'র যেখানে আপিস ছিল সেটা এম. সি. সরকারের দোকান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'মৌচাকে' নিয়মিত লিখতেন। আগে অবশ্য তিনি 'সন্দেশে' লিখতেন। একবার 'মৌচাকে'র গ্রাহকদের একটি ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'মৌচাকে'র সম্পাদক তাঁর জন্য এক বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করলেন—এক শিশি লজেঞ্জুষ।

আরও কাগজ বেরোত। ঠিক ওষধির মত না হলেও দু-তিন বছরের বেশি তার আয়ু ছিল না। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দু-একটি কাগজ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল। এখন তার একটিও নেই। সব কাগজের যে আড্ডা ছিল কিংবা আড্ডার কথা জানা যায় তা নয়।

কালিদাস রায়ের আড্ডার কথা বলতে গিয়ে আমাদের নিজেদের আড্ডার কথা মনে হল। আমাদের আড্ডা বসত হিন্দুস্থান পার্কে পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি। পুলিনবিহারী এ বাড়ি আসবার আগে টালিগঞ্জ রেলব্রীজের কাছে একটি বাড়ির তেতলায় থাকতেন। সেটি কেবল শেষ হয়েছে। চারিদিক খোলা। আমরা বলতাম পুলিনবাবু 'টলমল মেঘের মাঝারে' থাকতে ভালোবাসেন। সেখানে তাঁর জলবসন্ত হল। বসন্ত বিশেষ কিছু নয় কিন্তু পুলিনবাবু পাড়া বসন্তমুক্ত করবার জন্য অনেক টাকার ফিনাইল ছড়িয়েছিলেন। পুলিনবাবুর মনে হল অসুখের সময় বন্ধুচ্যুত হয়ে থাকা অনুচিত। এই কারণে এক বন্ধুর হাত ধরে তিনি হিন্দুস্থান পার্কে নীড় রচনা করলেন।

কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে দুটি বন্ধু থাকতেন বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী ও জ্যোতিষরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এঁদের প্রকৃতপক্ষে বাড়ির অংশীদার বললে ভুল বলা হবে। এঁরা রাত্রে থাকতে পেতেন কিন্তু দিনের বেলায় বাড়ি প্রায় আমাদের অধিকারে। রবিবার সকালে একটি জমাট আড্ডা দেওয়া হত দুপুর বারোটা পর্যন্ত। আড্ডায় বসে সিঙ্গাড়া আর জিলিপি খাওয়া হত। কয়েক মাস পরে মনে হল আড্ডার যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, এর একটা নাম থাকা দরকার। মর্যাদা দিতে বেশি দেরি হল না। একজন বললেন, 'যে পরিমাণ জিলিপি খাওয়া হয় তাতে আড্ডার নাম হোক্ জিলিপি।' এ প্রস্তাবে কারুর কোন আপত্তি দেখা গেল না। জিলিপি ক্লাবে নিয়মটিয়ম লিখে রাখা দরকার। একজন বললে, 'বেশি নিয়ম রাখবার দরকার নেই। নিয়ম করলেই নিয়ম ভাঙতে হয়। তার চাইতে একটা বোঝাপড়া থাক যে এটা আমাদের মতো হতচ্ছাড়াদের ক্লাব, যারা এখনও পর্যন্ত সেরকম সুবিধেমতন চাকরি যোগাড় করতে পারেননি।' এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকের কথা। তখনকার দিনে সুবিধে করতে পারা মানে চার অক্ষরের মাইনের চাকুরি। একজন চালাক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, 'কেউ যদি ক্লাবে ঢুকবার পরে ভাল চাকরি পেয়ে যায় তার কি হবে?' সমস্বরে এর উত্তর এল, ক্লাব থেকে তার নাম কাটা যাবে। তবে সবচেয়ে বড় নিয়ম

যা আমরা মোটামুটি মেনে চলতাম এখানে 'মহিলা ও রাজনীতির প্রবেশ নিষেধ।'

পুলিনবাবুর কাছে অনেকদিন কাজে নানান মহিলারা আসতেন, তাঁদের পাশের ঘরে বসিয়ে রাখতেন। দিনকয়েক পরে তাঁরা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন। আরও একটি বিপদ ছিল। যুদ্ধের বাজারে কাজের লোকের খুব অভাব। তখনও অবশ্য 'কাজের লোক' কথাটা চালু হয়নি। কোনো কোনো সত্যবাদী স্বামী মাছ কিনতে হবে বলে খালি হাতে 'বাজারে যাচ্ছি' এই বলে *জিলিপি*তে ঢুকে পড়তেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছের কথা ভুলে যেতেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী মাছ এবং স্বামীর খোঁজে সভাস্থলে এসে উপস্থিত হতেন। এই ব্যাপারটি অবাঞ্ছনীয়। কেউ কেউ আবার 'একজন কাজের লোক না হলে আর চলছে না, তুমি একা আর কত খাটবে' এই বলে গৃহিণীকে সমবেদনা জানিয়ে সোজা ক্লাবে ঢুকে পড়তেন। তাঁর মাছের থলে আনবারও দরকার নেই। বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বললেই চলবে গড়িয়াহাট থেকে মানিকতলা পর্যন্ত খুঁজে এলাম, কাজের লোক পাওয়া গেল না। এসব কথা তো আর ক্লাবের ভিতর হয়নি, কাজেই গৃহিণী কি জবাব দিয়েছিলেন আমার জানা নেই।

সভাপতি নির্বাচিত হবার পর সম্পাদকের নির্বাচনের পালা। পুলিনবিহারী সেনের নাম করা হল। তিনি তাঁর নিজস্ব প্রথামত মৌন হয়ে রইলেন। সবাই বললেন, 'পাস, পাস।' পুলিনবাবু অবিশ্যি জানতেন না যে সম্পাদক মানে 'সম্পাদক ও একাউন্টেন্ট' কিংবা 'ডিসবার্সিং অফিসার'। জিলিপি ও সিঙ্গাড়ার পাওনাদাররা তাঁর কাছেই টাকার জন্য আসবে এবং আমরা এত জিলিপি খেতে পারব। ডঃ শচীন সেনকে এখন আর বড় দেখা যায় না, কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। তখন তিনি কলকাতার সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজনীতির লোক কিন্তু প্রধানত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তিনি সজনীকান্ত দাস সম্পর্কে নানা কাহিনী বিবৃত করে আমাদের চিত্তবিনোদন করতেন। পুলিনবিহারী সেনকে পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না তাই তাঁর সম্পর্কে আর আলাদা করে কিছু বললাম না। যাঁরা নিয়মিত এই জিলিপি ক্লাবে আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথনাথ বিশী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাঁর লেখা 'কুটীরের গান' একসময় অনেকে পড়েছিলেন, নরেন দেব, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ভবশরণ সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, শান্তিদেব ঘোষ,

রবি চক্রবর্তী। জিলিপি ক্লাবের সভ্য খুব দেখেশুনে বাজিয়ে নেওয়া হত। ইচ্ছে থাকলেও সবাই সভ্য হতে পারতেন না। সমস্ত বছর বিনা পয়সায় জিলিপি খাওয়াব বললেও নয়। দু-একজন বাদ পড়েছিলেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পদোন্নতি হওয়াতে তাঁর নাম কাটা গেল। আমি চাকরি নিয়ে সিমলা চলে যাওয়াতে বাদ পড়ে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন জিলিপি ক্লাবের ভাঙন ধরেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার কিছুদিন পরে জিলিপি ক্লাবও বন্ধ হয়ে গেল।

অমৃতলাল বসুর কথা এই প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। তিনি ছিলেন প্রকৃত আড্ডাবাজ লোক। তাঁকে শেষ বয়সে সভা-সমিতিতে খুব ডাকা হত। তিনি যাই বলতেন তাতে আড্ডাধারীর কথাবার্তা পরিস্ফুট হত। আমার ছেলেবেলায় ভবানীপুরে এক বারোয়ারী সভায় প্রত্যেক বছর আসতেন। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি দিলীপের বাবার ঠাকুর্দা।' দিলীপের অর্থাৎ দিলীপকুমার রায়। তাঁর লেখায়, নাটকে নয়, উপন্যাসে কি বড় গল্পে আড্ডাধারীর গল্পের আভাস পাওয়া যেত। তিনি পুরনো ভারতীতে, যখন ভারতীর চেহারা খাটো ছিল, স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনা করতেন, তখন তাঁর লেখা একটি গল্প পড়েছিলাম, একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পড়ে মনে হয়েছিল কেউ গল্পটি লিখছেন না, কেউ যেন আড্ডায় বসে বলছেন। এরকম আড্ডার কলম বাংলাদেশে আরও কারুর কারুর ছিল, যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কারুর লেখাই আড্ডাধারীর গল্প বলে চালানো যায় না। এঁদের হালকা রচনা অনেক আছে কিন্তু সেগুলিকে কি আড্ডার গল্প বলব? একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, আড্ডার ঢংএ লেখা গল্পমাত্রই আড্ডা নয়। একালেও আড্ডা হয় কিন্তু আড্ডার গল্পলেখক বোধহয় সেরকম বেশি জন্মান না। প্রাচীন কি মধ্যযুগীয় ঘটনা একালের গল্পে আনলে আড্ডা হয় না বরং কিছু ভালো লেখকের হাতে ভালো গল্প হতে পারে। বলা যেতে পারে প্রমথ চৌধুরীর লেখা ঘোষালের গল্পগুলি আড্ডার ঢং-এ কিন্তু এগুলি ঠিক আড্ডা নয়। বরং রাজশেখর বসু কিছু ভালো আড্ডার গল্প লিখেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের লেখা কয়েকটি গল্প এবং পরবর্তীকালে দিল্লীর একটি বাঙালি চায়ের দোকানকে নিয়ে প্রকৃত আড্ডার গল্পের রস সৃষ্টি হয়েছে।

এখন কি আড্ডার গল্প লেখা বন্ধ হয়েছে? বোধহয় হয়েছে। আড্ডার

পাঠ উঠে গিয়ে বাঙালিদের ক্লাব হয়েছে, আড্ডার মেজাজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাও কি সেইরকম ক্লাব? যেখানে বাইরের ঘরে গুটিকতক বাঙালি যুবক এবং ছড়ানো বাংলা পত্রিকা। ভিতরের একটি ঘরে তাস, পাশা কিংবা দাবা খেলার সরঞ্জাম এবং তৃতীয় ঘরে 'সিংহলবিজয়' কিংবা 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র রিহার্সাল চলছে। এমন সময় উস্কোখুস্কো চুল মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন, "ওসব রেখে দাও। যদি 'থ্রীল' চাও তো কলকাতায় গিয়ে গ্রেগরী সাহেবের ম্যাজিক দেখে এসো। এখানে বাঁকিপুরে তো সেসব দেখবার উপায় নেই। বললে বিশ্বাস করবে না, স্টেজের উপর সবার সামনে একটি মেয়ের মুণ্ডু উড়িয়ে দিল। তারপর কি দেখলুম জান। ফার্স্ট রোতে বসা এক মহিলার ঠিক সেই মুণ্ডু আর কাটা মুণ্ডুটা একটা বালতিতে পড়ে আছে। কী বললাম, যাবে দেখতে?"

৪

কাকভূষণ্ডীর আলাপচারি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

রসচক্রের বৈঠকের কথা অনেকেই জানেন। *রসচক্রের* হোতা ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় আর শেষের দিকে মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন শরৎচন্দ্র। রসচক্রের বৈঠকে নিত্য হাজির থাকতেন তখনকার দিনের খ্যাতনামা লেখক অধ্যাপক সাহিত্যামোদীরা। তবে আসর জমিয়ে রাখতেন অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, উকীল নুটুবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো রসিক মানুষ কয়েকজন।

রসচক্রের সদস্যরা আগে একটি করে বনভোজন করতেন। চাঁদা করে অবশ্যই। তাতে একবার স্থির হয় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। সে সম্বর্ধনার আয়োজনও হয়েছিল বিপুল ও সাড়ম্বর। বহু লেখক ও কবি সে সম্বর্ধনা সভায় এসেছিলেন। প্রশংসা ও স্তুতিতে ভরে গিয়েছিল সভা। তবে কল্লোলগোষ্ঠীর কোনো লেখকের ভাষণে কেউ কেউ অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। একজন বলেছিলেন, ভাবীকালের শূর্পে একমাত্র যতীন বাগচীই টিকে থাকবেন এবং এই উক্তি থেকেই কেউ কেউ অর্থ করেন—শূর্পাবশিষ্ট বলতে এঁরা জঞ্জাল বোঝাচ্ছেন না তো?

বক্তা ছিলেন অনেকে। কবিশেখর কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জলধর সেন প্রভৃতি। যাই হোক, সম্বর্ধনা সভার মেজাজ চূড়ায় উঠল যখন কবি নজরুল গান ধরলেন :

> "তুমি কোন্ পথে এলে হে মায়াবী কবি বাজায়ে বাঁশের বাঁশরী।
> 'অপরাজিতা'র সুনীল মাধুরী দুচোখ ভরিয়া করিলে কি চুরি,
> 'নাগকেশরে'র ফণী-ঘেরা মৌ পান করাল কে কিশোরী।"

এরপর আর কারও কিছু বলার থাকে না। কবির গলাও ভাবগম্ভীর। যতীনদার দু'চোখে জল—আবেগের অশ্রু। তাই কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যখন বলতে শুরু করলেন, অনেকে ভাবলেন তাঁর বক্তব্য হয়তো মাঠে মারা যাবে, কেউ শুনবে না। কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে পড়তে

শুরু করলেন লেখা ("বন্ধুর অভিনন্দন দিনে")—

অনেক বন্ধু এসেছে বন্ধু তব অভিনন্দনে
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে তাদের মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সেই বেদনাই মাপে।
তব সঙ্গীত সার্থক হল যাদের বেদনা গাহি'
তোমার তরণী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রুবাহি',
এই আনন্দ-দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে।
নিষেধ করেছি, কেহ বা শুনেছে, কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া বন্ধু তোমার মার্জনা আমি চাই।
কাঁটাবন হতে বলে পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া
"বন্ধুরে বলো মোর শিরে আজও সমানে ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হল যে কণ্টকবন্ধন!
আজ পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,—
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।"

তোমার পথের ঝরা শেফালিরা এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হল যেই, মলিন মাধুরী আরবার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার হাতে হাতে হাত ধরি,
ব'লে গেল তারা—"বলো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।"
দিয়ে গেল তারা মর্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়—
কয়ে গেল তারা—"শরতের শত শপথ স্মরিও প্রিয়।"
হেরিনু বন্ধু, বাদল সন্ধ্যা বহি' বায় কুলকুল্‌,
ভেসে এল তায় কোন্‌ সাঁঝদীপ কোথাকার ঝিঙাফুল।
ভেসে যেতে যেতে ব'লে গেল তারা "ব'লো ব'লো বন্ধু রে
একগাঁয়ে ছিল বসতি মোদের আজ চলি কোন্‌ দূরে।
বলো তারে মোরা আলো করেছিনু যে-কুটীর যে-আঙিনা
আজ বাদলের আঁধারে হয়তো কঠিন হবে তা চিনা।

তবু ব'লো তারে ভাই,
সে ঘর আঙিনা আঁধার রহিল, মোরা যাই, ভেসে যাই।"
শুধালো নিশীথে তোমার দেশের চরের চক্রবাকী—
"সন্ধান তার পেলে কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা,
এ জীবনভোর হয় নিশিভোর ভাঙা তো লাগেনি জোড়া।
ব'লো ব'লো তারে মোদের বন্ধু, তোমার মিতারে ব'লো,
তাদের গাঙের অবুঝ পাখির দিনরাত এক হলো।"
এমনি কত-না এল রবাহূত, তাদেরি বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বল তো কেমনে নিজ আনন্দ কহি?
এসেছি বন্ধু মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বারবার।
এসেছি বন্ধু, দু'পায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবনশ্বাস।
নিষেধ করেছি, শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি',
তোমার বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটে কাটা ক'টি কলি।
আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পুরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে, হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন।

সভা স্তব্ধ হয়ে গেল।

তাঁর কবিতা পড়া শেষ হবার পরও সভায় কবিতার ভাব ও সুরের অনুরণন চলল কিছুকাল। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যের কুশীলবদের এমন স্বীকৃতি আর কেউ দেয় নি। নজরুলও যতীনদার কাব্যগ্রন্থের নাম নিয়ে গান রচনা করেছেন, যতীন্দ্রনাথও তাই—তবে আরও অনেক গভীর অনেক আবেগময়।

এই সম্বর্ধনা সভার আলোকচিত্র এই নিবন্ধশেষে যুক্ত হল—এতে দেখা যায়, উপস্থিত জনেদের মধ্যে আছেন—প্রথম (চেয়ারে উপবিষ্ট) সারি, বাঁদিক থেকে : অতুল বক্সী (গায়ক), নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, অঘোরনাথ অধিকারী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জলধর সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অজ্ঞাত, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিধিরাম হালদার।

দ্বিতীয় সারি (দাঁড়ানো) : প্রথম দুইজন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পুত্র, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি), নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, কালীমোহন বসু (সম্মিলনী সম্পাদক), নলিনীকান্ত সরকার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গোপাল সান্যাল, কেশবচন্দ্র সেন।
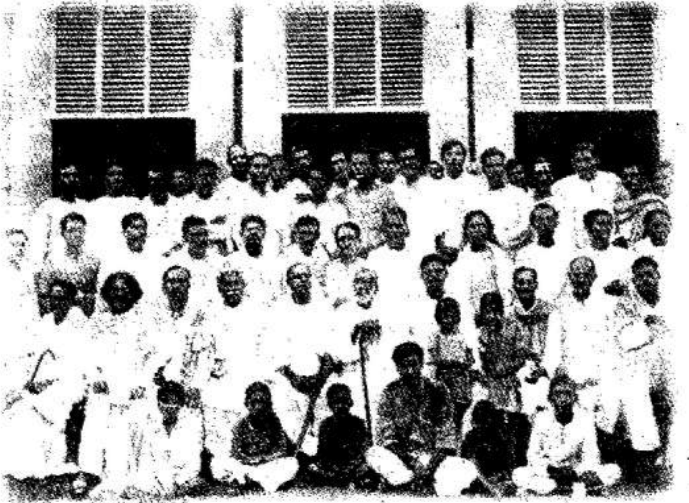
তৃতীয় সারি : (দণ্ডায়মান দ্বিতীয় সারি) বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত (সাংবাদিক), অজ্ঞাত, নুটুবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গল্পলহরী), এর পর তিনজনের নাম জানা নেই, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণদয়াল বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অজ্ঞাত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কিরণকুমার রায়, অজ্ঞাত দুইজন, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, অজ্ঞাত।

আমার ওপর ভার পড়েছিল খাস্তা কচুরি আনার এবং জলধর সেনকে নিয়ে আসার। জলধরবাবুকে আনতে গিয়ে একটি সুসংবাদ শুনলাম, *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় আমার একটি গল্প সামনের পুজা সংখ্যায় অর্থাৎ পুজার আগে কার্তিক সংখ্যায় বেরোবে। গল্পটি পত্রিকার দপ্তরে পড়েছিল ১৯ মাস।

জলধর সেন মশাই ছিলেন *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সম্পাদক। পুজোর আগে কার্তিক সংখ্যা বার করবার রেওয়াজ ভারতবর্ষের, কথাসাহিত্যও সেই আদর্শই গ্রহণ করেছে। এতে কাজের অনেক সুবিধা।

রসচক্রের এরকম অনুষ্ঠান আরও হত। একবার গানের আসর হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেক বিশিষ্ট শিল্পী গেয়েছিলেন সে আসরে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব, অসামান্য দরদ দিয়ে গাইতে পারতেন। "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে/ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।" আর "একদা তুমি প্রিয়ে আমার এ তরুমূলে সেজেছ ফুল সাজে/সে কথা কি গেছ ভুলে?" তারপর "গেয়েছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে বসি/আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে"—এই সব গান শুনতে শুনতে যতীন সেনগুপ্ত মশাই অঝোরে কাঁদছিলেন। এরপর কেউ কেউ হরিপদবাবুকে সুরদাসের ভজন গাইতে বললে যতীনবাবু নিষেধ করলেন।

যতীন বাগচী *মহাভারতী* থেকে দুর্যোধন আবৃত্তি করেন।

আহারাদির পর অপরাহ্নে এঁরা বাগানে বেড়াচ্ছেন। সকলেরই চোখে পড়ল বাতাবি লেবুগাছে অজস্র সুপক্ব বাতাবি ঝুলছে। কালিদাসদা বললেন মনোজবাবুকে, 'হ্যাঁরে, তুই তো বনজঙ্গল নিয়ে লিখিস। নিজেকে বলিস গাঁয়ের ছেলে, বাতাবি লেবু পাড়তে পারিস?'

তখন মনোজবাবুর *বনমর্মর* বেরিয়েছে।

মনোজবাবু সেকথার জবাব দিতেই যেন জামা খুলে ধুতি গুটিয়ে কোমর এঁটে তর্ তর্ করে গাছে উঠে বাতাবি লেবু পেড়ে এনে দিলেন। অসংখ্য কাঁটা অগ্রাহ্য করে।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের নাম আজকালকার পাঠকরা ভুলে গেছেন। তখনকার দিনে অর্থাৎ *রসচক্রের* যে আমলের কথা বলছি তখন তিনি একজন প্রধান লেখক। *মাটির স্বর্গ* নতুন উপন্যাস বেরিয়েছে। তাঁর হঠাৎ কি মনে হল, রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন, 'আমার *মাটির স্বর্গ* উপন্যাস সবাই প্রশংসা করছেন। আপনি যদি পড়েন—দু-চারটে মামুলী সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে না দেন তো বই পাঠাই।'

ঐ শর্ত করাতেই যে স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছিল তা কবির ভালো লাগে নি বোধ হয়। তিনি পড়লেন এবং অভিজাত *পরিচয়* পত্রিকায় দীর্ঘ একটি সমালোচনা পাঠালেন। ছোটো অক্ষরের ছাপায় বোধ হয় তিন পৃষ্ঠা হবে।

যা লিখলেন—তা যাকে বলে, crashing সমালোচনা। এই আঘাতেই বোধ হয় অসমঞ্জর লেখক-খ্যাতি ক্রমশ ম্লান হয়ে এল।

অবশ্য কারও কারও এই সমালোচনা পছন্দ হয় নি। এঁদের মধ্যে শরৎবাবু অন্যতম। এঁদের ধারণা ছিল এতটা কবি না লিখলেও পারতেন। তখন বোধ হয় শরৎবাবু-কবিগুরুর মধ্যে কোন ব্যাপারে মতান্তরও চলছিল। শরৎবাবু যেন এই সমালোচনার উত্তর দিতেই অসমঞ্জর ক্ষতিপূরণার্থে সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে *রসচক্রে* অসমঞ্জ-সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। উত্তম ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। আবার সেই ভোজসভাতেই খাওয়ার সময়ে বোঝা গেল শরৎবাবু অসুস্থ। পরে ধরা পড়ল অন্ত্রনালীর কঠিন পীড়া, তাইতেই মারা গেলেন।

রসচক্র জমিয়ে রাখতেন বিশুদা—বিশ্বপতি চৌধুরী, সে কথা আগে বলেছি। নিত্যনূতন পরিহাসের পন্থা তাঁর মাথায় গজাতো। অসমঞ্জবাবুর সংবর্ধনা সভায় বিশুদা বললেন, আমি কবি হরেন সিংহকে মানপত্র দেব। কেউ বুঝতে পারে নি। পরে দেখা গেল, ফটো তোলার সময়ে কবি হরেন সিংহর পিছনে বিশুদা একটি বড় মানকচুর পাতা ধরে ছিলেন।

নুটুদা'ও (উকিল নুটুবিহারী মুখোপাধ্যায়) কম যেতেন না। শরৎবাবু শেষের দিকে *রসচক্রে* নিয়মিত আসতেন। একদিন খুব ছোটো মাপের একটি ছড়ি হাতে এসে বললেন, "এই যে ছড়িটা দেখছ, এটা কুমুদশঙ্করের বাবা আমাকে দিয়েছিলেন।" মন্তব্যটা আসরে তেমন কোনো রেখাপাত করল না। 'কী আর এমন জিনিস—' এই ভাব দেখে বললেন, "বললে বিশ্বাস করবে না, এই ছড়িতে (ছোটো মাপের ছড়ি, বিশেষ লম্বাও নয়, সাপ মারতে হলে লম্বা লাঠি চাই) ১১২টা সাপ মেরেছি।"

নুটুদা 'ইনোসেন্টলি' প্রশ্ন করলেন, "সবগুলোই কি হেলে সাপ ছিল শরৎদা?"

অতঃপর শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বিশুদার আর একটি ঘটনা বলি।

কালিদাস রায় সম্বন্ধে সজনীবাবু (সজনীকান্ত দাস) *শনিবারের চিঠিতে* কিছু বক্রোক্তি করেছিলেন। তাইতে স্বভাবতই সজনীবাবুর ওপর বিশুবাবুর ক্ষোভ ছিল। পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি বেরোবার কদিন পরেই সজনীবাবু এসেছেন সুবলবাবুসহ *রসচক্রের* বৈঠকে।

সজনীবাবু এসেছিলেন নিশ্চয় ভাল উদ্দেশ্যে। কালিদাসবাবু এককালে *শনিবারের চিঠি*র অন্যতম যোগানদার ছিলেন। তিনি যদি রেগে গিয়ে থাকেন তো একটু শান্ত করে যাবেন। *নায়ক*-খ্যাত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই রীতি ছিল। আশুবাবুকে (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) *নায়ক* পত্রিকায় কষে গালাগাল দিয়ে সন্ধ্যেবেলাই আসতেন আশুবাবুর বাড়ি। সন্দেশ দিতে বলতেন ছেলেদের। তারপর সকলে চলে গেলে কাছে এসে বলতেন, 'গালাগাল না দিলে কাগজ চলে না যে! আর আপনি ছাড়া গালাগাল দেবার মতো এত বড় মাপের মানুষ বলতে আর কে আছে বলুন আপনি?'

কিন্তু বিশুদা সজনীবাবুকে দেখেই তাঁর দিকে পিছন ফিরে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। নির্বিরোধী বরাবর শান্তস্বভাব কালিদাসবাবু বিপন্ন হয়ে বিশুদাকে ডেকে বললেন, "বিশু, ওরে সজনী এসেছে রে।"

বিশুবাবু যেন চিনতেই পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বললেন, "সজনী?"

কালিদাসবাবু বিচলিত হয়ে বললেন, "আঃ সজনী—সজনীকান্ত দাস।"

বিশুদার আরও বিস্ময়—"সজনীকান্ত দাস? আমি ঠিক—।"

কালীদা অধিকতর বিচলিত, বুঝতে পারছেন না পূর্বপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও বিশুদা চিনতে পারছেন না কেন, সজনীবাবু কি মনে করছেন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বললেন—"কি মুশকিল, *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস!"

বিশুদা সরল বিস্ময়ে বললেন, "ও নামে পত্রিকা আছে নাকি? জানি না তো!"

বিশুদার কপট সারল্য 'রসচক্র'র অন্য মানুষরা খুব উপভোগ করছেন। গৃহস্বামী কালিদাসবাবু বিব্রত। তখন *শনিবারের চিঠি*র খ্যাতির কাল। এত লোকের মাঝে এই পত্রিকার নাম কেউ শোনে নি বললে সজনীবাবুর অপমান ও অস্বস্তি দুই-ই। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়লেন।

সজনীবাবুর প্রস্থানের পরেই কালীদা পড়লেন বিশুদাকে নিয়ে—"তুই কেন ওরকম করলি সজনীকে?"

বিশুদা অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "যে আপনাকে অপমান করে, তাকেই বা আপনি কেন অত খাতির করবেন?"

৫

পরলোকগত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা

কলিকাতায় সিনেট হলে মহতী জনসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি
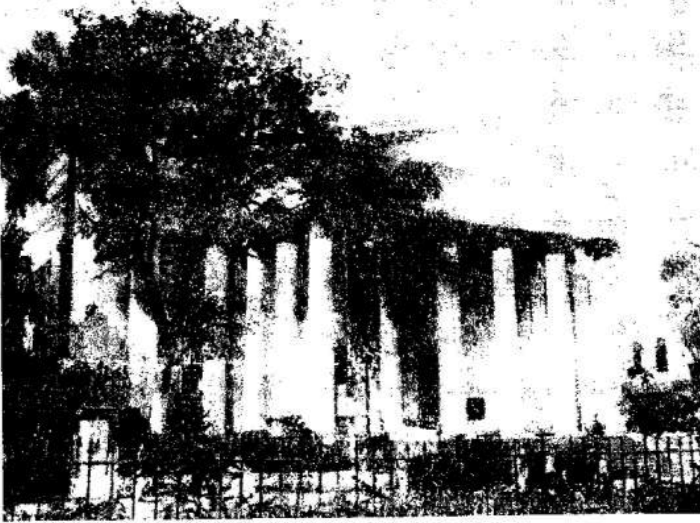
খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত *ইছামতী* নামক উপন্যাসখানিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার সমিতির কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব রবিবার অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক-প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

পরলোকগত কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলে ১ মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া শোকসূচক প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত অতুল গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস বলেন—একজন বড় সাহিত্যিক বলিয়াছেন, যে ধরনের লেখার জন্য এ বৎসর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তাহাই যদি নোবেল পুরস্কার লাভের যোগ্যতার মাপকাঠি হয় তবে বিভূতিভূষণ ৭টি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। শ্রীযুত দাস বলেন যে, বৈদেশিকগণের কাছে দাবি জানাইবার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত হন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুরস্কার প্রথম বৎসরেই বিভূতিভূষণের প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই। স্বর্গত বিভূতিভূষণকে উক্ত পুরস্কার দেওয়ার জন্য শ্রীযুত দাস সরকারকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের লেখা লোকের মনকে আকৃষ্ট করে। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য এই যে,

তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবনের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি নিজের জীবনকেই প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিককালে যে ভেদ বিরোধ ও তিক্ততা দেশের সর্বত্র দেখা যাইতেছে, বিভূতিভূষণের জীবনে তাহার কোন ছাপ পড়ে নাই। কারণ প্রকৃতিকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সরল সম্পর্ককে তিনি ভালোবাসিতেন। সেই ভালোবাসাই তাঁহার সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার সাহিত্য ছিল ভালোবাসার সাহিত্য। আজকাল বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সমস্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের রূপও বদলাইতেছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ ছিলেন সেই সাহিত্যের স্রষ্টা, যে সাহিত্য মানুষের শাশ্বত ভাব নিয়া কারবার করে। সুতরাং রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যের প্রতি লোকের আকর্ষণ হ্রাস হইতে পারে না। অলৌকিককে তিনি এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, মনে হয় না উহা অলৌকিক।

সভায় উপস্থিত হইতে না-পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিভার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী চিঠি প্রেরণ করেন।

কবি কালিদাস রায় ও শ্রীযুক্তা বীণা রায় বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে ২টি চিত্তাকর্ষক কবিতা পাঠ করেন।

সাহিত্যিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—বিভূতিভূষণ তাঁহার কীর্তির চেয়ে বড় ছিলেন। বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে তিনি আনন্দলোকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার কাছে গেলে সকলেই দুঃখের জ্বালা ভুলিয়া যাইত ও তাঁহার অন্তরের আনন্দের অংশ পাইত।

শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেন—কাজের অন্তরালে বিভূতিভূষণ নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষের পরিচায়ক। প্রচারের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না অথচ তাঁহার সাহিত্যরচনার উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত।—তিনি নিরহঙ্কার ও নিরভিমান ছিলেন। এ বিষয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য আশা করেন, মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিশ্বজনমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইবে। ইহা দুঃখের বিষয় যে, গৌরবের মধ্যাহ্ন গগনে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি জগৎ হইতে অপসারিত হন।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী বলেন—মানুষের শাশ্বত সৌন্দর্যকে বিভূতিভূষণ প্রকাশ করেন। প্রকৃতিকে আমাদের কাছে এবং আমাদিগকে প্রকৃতির কাছে

তিনি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেন। লেখক বিভূতিভূষণ ও মানুষ বিভূতিভূষণের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য ছিল। সেখান হইতে তাঁহার সাহিত্য রস আকর্ষণ করে।

শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর সাহিত্যের আবহাওয়া যখন বিষাক্ত হইয়া উঠে, তখন সূর্যোদয়ের মতো বিভূতিভূষণ প্রকাশিত হন। পাঠকেরা উপলব্ধি করেন—কোন দূরের জিনিস নিয়া তিনি সাহিত্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করেন নাই, করিয়াছেন একেবারে হাতের কাছের জিনিষ নিয়া। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়া ৪।৫ জনের বেশি সাহিত্যিক মৌলিক সৃষ্টি করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ একজন। তিনি বাঙলা সাহিত্যে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। তারপর অনেক প্রতিভাবান লেখক সেই ধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। একদিকে দেশের মাটি ও শুচিতা, অপরদিকে জগদতীত ভাগবত

দৃষ্টি—এই উভয় ধারায় তাঁহার লেখা প্রবাহিত হইয়াছে। দেবযানে তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্তই নিজের জীবনে সাধনা ও উপলব্ধি করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রীকে বলেন, আমি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাইতেছি।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন বলেন,—৪০ বৎসর ধরিয়া বিভূতিভূষণ

বাঙ্গালি পাঠককে দুই হাতে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পের লেখক ও কবি। তাঁহার লেখনীতে প্রকৃতির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও তিনি সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। তাঁহার তুলির রং কৃষক ও তরুণেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। বাঙলার বৈশিষ্ট্য এই যে, দুর্দশার মধ্যেও সাহিত্যের রসধারা পান করিয়া বাঙালি আনন্দ লাভ করিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীকুমার ব্যানার্জি বলেন,—ভগবৎদত্ত প্রতিভা নিয়া বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন ও তাহার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁহার চিরন্তন পরিচয়—তিনি বড় স্রষ্টা ছিলেন। সেই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট বড় সব জিনিসের মধ্যে তিনি অনন্ত সম্ভাবনীয়তা উপলব্ধি করিতেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি অরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং রূপ-সমুদ্রের গভীর স্তরে অনন্ত
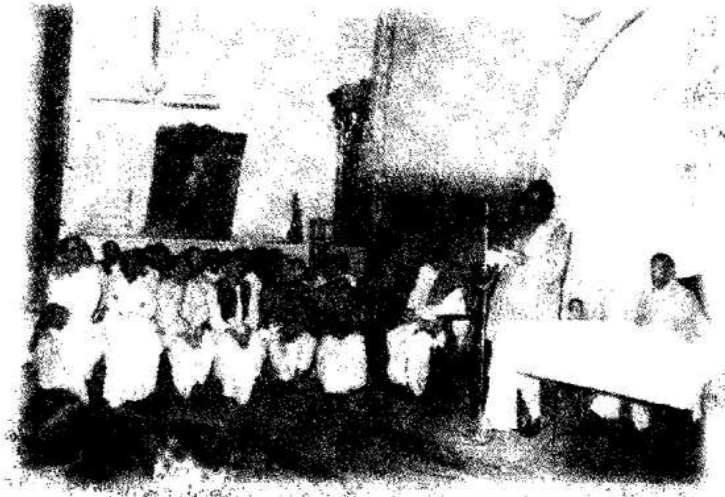
ব্যঞ্জনার পরিবেশ অনুভব করেন। তাঁহার লেখার কোনো জায়গায় বিদ্রোহের সুর দেখা যায় না, আছে অফুরন্ত আনন্দের উৎস। প্রাচীনকালের সঙ্গে তাঁহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। যুগপ্রভাবকে তিনি অন্তরের প্রশান্তি দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন,—ইহলোক ও পরলোকের সূক্ষ্ম ব্যবধান অতিক্রম করা বিভূতিভূষণের পক্ষে সহজ হইয়াছিল; কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মানুষের শাশ্বত বৃত্তিগুলিকে তিনি রূপ দিয়াছিলেন।

কাজি আবদুল ওদুদ বলেন,—সাহিত্যে বিভূতিভূষণের অপূর্ব সৃষ্টি দেখিয়া কেহ মুগ্ধ না হইয়া পারে না। ইহাই তাঁহার বড় প্রতিষ্ঠা। সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুত গজেন্দ্র মিত্র বলেন,—বিভূতিভূষণ অতি সাধারণ মানুষকে অসাধারণ মানুষরূপে ফুটাইয়া তোলেন—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা সহজ ভালোবাসা। তাঁহার মৃত্যুতে একটি অপূর্ব মানুষকে আমরা হারাইয়াছি।

অধ্যাপক নারায়ণ গাঙ্গুলী বলেন যে, যুগের ভিতর থাকিয়াও তিনি যুগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। অনুভূতির দ্বারা তিনি নিত্যকালের মানুষকে স্পর্শ করেন।

শ্রীযুত সুমথ ঘোষ বলেন,—বিভূতিভূষণের চরিত্র-মাধুর্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি যশের কাঙাল ছিলেন না—ব্যক্তিগত জীবনেও না, সাহিত্যিক জীবনেও না।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন,—বিভূতিভূষণ ছিলেন একাধারে মানুষ, প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতের কবি। তাঁহার মধ্যে আমরা চিরকিশোর কবির পরিচয় পাই। বক্তা বিভূতিভূষণের রচনা হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করেন।

আরম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীত ও মহামহোপাধ্যায় কর্তৃক স্বস্তিবাচন পাঠ হয়।

বিভূতিভূষণের একখানি সুদৃশ্য প্রতিকৃতি শ্বেত পুষ্পে শোভিত করিয়া মঞ্চোপরি স্থাপন করা হয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০

গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

[লেখক লেখিকা অধ্যাপক ব্যতীত ব্যক্তিগণের পাশে পরিচয় ও পেশার উল্লেখ করা হল।]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুলচন্দ্র গুপ্ত (ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক)
অনাথ দে (ইস্টার্ন ল হাউসের ব্রাঞ্চকর্তা)
অনুরূপা দেবী
অন্নদাশঙ্কর রায়
অপূর্বকুমার চন্দ (সেকেন্ডারি বোর্ডের সভাপতি)
অপূর্বমণি দত্ত
অমিতাভ ভট্টাচার্য (আনন্দমেলার সদস্য)
অমিয় চক্রবর্তী
অমূল্য মজুমদার (ডি. এম. লাইব্রেরির মালিক গোপালদাস মজুমদারের ভ্রাতা)
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উমা (বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী)
আবিরলাল মুখোপাধ্যায় (ই.এন.টি চিকিৎসক)
আশাপূর্ণা দেবী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী)
আশুবাবু (গুপ্ত ফ্রেন্ডস্ দোকানের মালিক)
কবিশেখর কালিদাস রায়
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
কাজী আবদুল ওদুদ
কাজী নজরুল ইসলাম
কালিদাস গুপ্ত
কৃষ্ণদয়াল বসু
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
গণপতি পাঁজা (চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার)
গিরীন্দ্র মিত্র (বুক কোম্পানির মালিক)
গিরীন্দ্র সিংহ (মুদ্রক, পত্রিকা সম্পাদক প্রকাশক)
গোপালদাস মজুমদার (ডি. এম. লাইব্রেরির মালিক)
গোলাম মোস্তাফা
গৌরকিশোর ঘোষ
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
চরণদাস ঘোষ
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (বিখ্যাত কীর্তনগায়িকা)
জগদীশ ভট্টাচার্য
জলধর সেন
জসীমউদ্দীন
জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (সঙ্গীতজ্ঞ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য)
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দিলীপকুমার গুপ্ত (প্রচার বিশেষজ্ঞ ও সিগনেট প্রেসের মালিক)
দিলীপকুমার রায় (বিখ্যাত গায়ক ও লেখক)
নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থকারের সহপাঠী)
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নলিনীকান্ত সরকার
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (বিখ্যাত সেতার-শিল্পী)
নিরুপমা দেবী
নীরদচন্দ্র চৌধুরী
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (চিকিৎসক ও বিভূতিভূষণের অনুজ)
নুটুবিহারী মুখোপাধ্যায় (ব্যবহারজীবী ও লেখক)
পাঁটুদা (পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, একদা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারি)
পুলিনবিহারী সেন
প্রতিমা মিত্র (গ্রন্থকারের কাকীমা)
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
প্রতুলচন্দ্র সরকার (বিখ্যাত জাদুকর)
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রভাসচন্দ্র ঘোষ (শিক্ষক)
প্রমথনাথ বিশী
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (শিল্পী ও লেখক)
প্রিয়রঞ্জন সেন
বঙ্কিমচন্দ্র সেন (দেশ পত্রিকার একদা সম্পাদক)
বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক)
বনফুল
বন্দে আলি মিয়া
বাণী রায়

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বিশ্বনাথ সান্যাল (জামশেদপুরের সান্যাল ব্রাদার্সের মালিক)
বিভূতিভূষণ কাঁঠাল
বিভূতিভূষণ দত্ত (বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
বিমল ঘোষ (মৌমাছি)
বিমল মিত্র
বিশু মুখোপাধ্যায়
বিশ্বপতি চৌধুরী
বীরেন রায় (প্রত্নতাত্ত্বিক)
ভূপেন্দ্রনাথ বসু (সাংবাদিক/অনুবাদক)
ভোলাবাবু (রমণীমোহন মিত্র, কুমারেশ খ্যাত ও. আর. সি. এল কোং-এর ডিরেক্টর)
মনোজ বসু
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (কলিকা টাইপ ফাউন্ড্রির মালিক)
মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী (শিক্ষক)
মন্তুদা (প্রফুল্লকুমার বসু, মিত্র ও ঘোষের প্রবীণতম ডিরেক্টর)
মাখনলাল সেন (সাংবাদিক)
মাজেম আলি (দপ্তরী)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিক মিঞা (দপ্তরী)
মোহিতলাল মজুমদার
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
যদুনাথ সরকার
যমুনা দেবী (বিভূতিভূষণের ভ্রাতৃবধূ)
যাযাবর (বিনয় মুখোপাধ্যায়)
রঘুনাথ গোস্বামী (শিল্পী)
রজনীকান্ত সেন
রণেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র (ডাক্তার, গজেনবাবু সুমথবাবুর শুভানুধ্যায়ী)
রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণের পত্নী)
রেবতীভূষণ ঘোষ (চিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট)
রাজশেখর বসু (পরশুরাম)
রাধেশ রায় (কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভ্রাতা)
রামনারায়ণ বসু (শিক্ষক)
রামপদ মুখোপাধ্যায়
রামমনোহর লোহিয়া (রাজনৈতিক নেত
রামেশ্বর দে (প্রুফ রীডার)
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বেঙ্গল পাবলিশ অংশীদার পরে প্রকাশ ভবন, বাক্সাহি মালিক)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শিবরাম চক্রবর্তী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীনাথ ভাদুড়ী
সত্যজিৎ রায়
সত্যব্রত করঞ্জাই (লখনৌ-এর শ্রীকৃষ্ণ হাউসের ম্যানেজার)
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র)
সমরেশ বসু
সরোজকুমার রায়চৌধুরী
সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
সাগরময় ঘোষ (দেশ পত্রিকার সহ সম্পাদক)
সামসুর রহমান (দপ্তরী)
সুধীরচন্দ্র সরকার (এম. সি. সরকার সন্স্-এর কর্মধার)
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুপ্রিয় সরকার (বাচ্চুদা—সুধীর সরকারের পুত্র)
সুমথনাথ ঘোষ
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
সুশীলকুমার দে
সুশীল দাশগুপ্ত (আনন্দমেলার সদস্য)
সৈয়দ মুজতবা আলী
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চট্টোপ এন্ড সন্সের মালিক)
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
হাসানদা—মহম্মদ হাসানজাম (শিল্পী কা হাসানের ভাই ও আনন্দমেলার সদ
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী
হেমেন্দ্রকুমার রায়
হোসেনুর রহমান

প্রকাশক থেকে গ্রন্থকার

যদিও আমাদের পৈতৃক বাড়ি ঢাকুরিয়ায়, আমাদের মনে হত কলেজ স্ট্রীটই আমাদের আদত ঠিকানা। কারণ মিত্র ও ঘোষ-এর অবস্থান সেখানে এবং এই প্রতিষ্ঠানই ছিল আমাদের বাড়ির তথা পরিবারের স্নায়ুকেন্দ্র। বইয়ের গন্ধে বাড়ি ছিল ভরপুর। বইমেলার উত্তেজনা আমাদের শিশুকাল থেকে আবিষ্ট করে রাখত। জন্মের পর থেকেই শুনেছি মিত্র ও ঘোষের গোড়াপত্তনের ইতিহাস। শুনেছি আমার সাহিত্যিক দাদু গজেন্দ্রকুমার মিত্র-র ত্যাগ, পরিশ্রম আর স্বপ্নের গড়ে ওঠার কাহিনী। বাবার মুখে শুনতাম আমার সদ্য গড়ে ওঠা জগতের কিংবদন্তীদের গল্প। গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করতাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল-দের ইতিহাস। মনে হত—ইস্, আর-কটা বছর আগে যদি জন্মাতাম।

বাবাকে বহুবছর ধরে বলেছি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু আমার প্রকাশক বাবার লেখক হয়ে ওঠা আর হয়নি। হয়তো বা নানান পারিপার্শ্বিক চাপও তাঁকে বাধা দিয়েছে। আজ এতদিন পরে বাবা যে কলম ধরতে রাজী হয়েছেন তাতে আমরা অর্থাৎ আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য এককথায় অভিভূত।

সুদূর প্রবাসে থাকার জন্য এই বইটির জন্ম সময়ে আমি থাকতে পারব না এই আফশোষটা গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। নতুন বইটির সুমিষ্ট ঘ্রাণ নিতে নিতেই সেই কষ্টকে ভুলতে হবে আর-কি। আমার বিশ্বাস বাবার স্বভাবসিদ্ধ সরল, প্রাণোচ্ছল বাক্‌ভঙ্গিমা তাঁর ঘনিষ্ঠদের ছাড়াও বাংলার পাঠক-কুলকেও আকৃষ্ট করবে। যদি এই বইটি বাংলা পাঠকদের কিছু অংশকেও মুগ্ধ করতে পারে তাহলে সেটি হবে আমার প্রৌঢ় বাবার একনিষ্ঠ এবং দীর্ঘকালীন সাহিত্যসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মুম্বাই —ইন্দ্রাণী রায় মিত্র

গ্রন্থকার সবিতেন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে। ১৯৪৯ সালে তিনি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সে যোগ দেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তদীয় পত্নী প্রতিমা মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষের স্নেহচ্ছায়ায় তিনি ক্রমশ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে ওঠেন। তদবধি এখনও তিনি প্রকাশন পরিচালনায় কর্মরত। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছেন। সরকারী কাজের সুযোগ পেয়েও সম্ভবত সাহিত্যিক আড্ডার টানেই এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে থেকে গেছেন। বহু সাহিত্যিকের সঙ্গলাভে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের শতবার্ষিক স্মরণসভাগুলিতে তাঁর স্মৃতিচারণ পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছে। প্রকাশক সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সম্পর্ক। তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যই পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ড ও বঙ্গীয় প্রকাশক সভা—দুই প্রতিষ্ঠানই তাঁকে সভাপতি করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে কলকাতা বইমেলায় অগ্নিকাণ্ডের পরে তাঁর স্থিতধী পরিচালনায় তিন দিনের মধ্যে বইমেলা পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে এই গ্রন্থে তিনি নিজের কথা বলা অপেক্ষা তাঁর সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের বর্ণনাতেই বেশি জায়গা নিয়েছেন। নিজের কথা প্রায়শই উহ্য রেখেছেন। আমরা নিজের লোক বলেই এসব কথা জানি ও জানাবার সুযোগ পাই।

—সর্বাণী রায় (দত্ত)